কৃতীজনের সান্নিধ্যে

সাহিত্য প্রকাশ

সেই সময়
আর সেই সময়ের কৃতী মানুষদের
চেনাবার উদ্দেশ্যে
কন্যা পিয়ালী ও পুত্র প্রতীক-কে

সূচিপত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এক : প্রথম দেখা

জীবনে জীবন যোগ করে পথে-পথে কাটছে আমার এই-জীবন। পথই আমার পথ। কথাটি ঠিক আমার নয়। ধার করা। সুভাষদা অর্থাৎ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা একটু ঘুরিয়ে বললাম।

এই পথ চলতে চলতে যা দেখলাম যা শুনলাম তার টুকরো টুকরো স্মৃতি আমার মনে জেগে থাকলেও সব-দেখা সব-শোনা হয়তো স্পষ্ট মনে নেই। যেটুকু মনে আছে টুকরো-টুকরো ভাবে তাই বলতে বসেছি।

কয়েকদিন আগে সুকান্ত এসেছিল। সুকান্ত হল অমর কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে রচনাবলী প্রকাশ করছে সেই প্রসঙ্গে সুকান্ত আলোচনা করতে এসেছিল। যে-বিষয় সুকান্ত আমার কাছে জানতে চাইল তা হল পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় আমার সম্পাদিত ছোটদের পত্রিকা 'আগামী'তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'মাটির কাছে কিশোর কবি' নামে যে উপন্যাসটি শুরু করেছিলেন তার কতটুকু তাঁর লেখা। কারণ মানিকবাবু উপন্যাসটি শেষ করে যেতে পারেননি। পরবর্তীকালে শিশু সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে দিয়ে উপন্যাসটি আমি সম্পূর্ণ করিয়েছিলাম। উপন্যাসটি মানিকবাবু শুরু করেন, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়। আমাদের পত্রিকার প্রথম বছরে। ভূমিকায় মানিকবাবু লেখেন—'গোড়ায় তোমাদের বলে রাখা ভাল যে, এটা আমাদের নতুন যুগের কবি সুকান্তের জীবনীও নয়, তাঁর জীবন কাহিনি ভিত্তি করে লেখা উপন্যাসও নয়। এটা স্রেফ উপন্যাস—চরিত্রই বলো আর কাহিনিই বলো সব আমার মগজের কারখানায় তৈরি। সুকান্ত অবশ্য এদেশে পুযে রাখা যক্ষ্মার অভিশাপে অল্প বয়সে প্রাণ দিয়েও কবি হিসাবে আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে আছে। আমার উপন্যাসের কবিকে কাহিনির শেষে কবি আর রক্ত মাংসের মানুষ দু'রকম হিসাবেই জীবন্ত দেখতে পাবে।

কিন্তু ঋণ স্বীকার না করে উপায় নেই। সুকান্ত সম্ভব না হলে, মাটির কাছের আরো অনেক কিশোর কবি সম্ভব না হলে, তোমাদের জন্য আমার এই উপন্যাস লেখাও সম্ভব হত না। যতই রং চড়াই আর কল্পনার রসে রসাই, মাটির মানুষকে আর মাটির মানুষের জীবনকে অন্তত ভিত্তি হিসাবে অবলম্বন না করে আমি গল্প ফাঁদতেই পারি না—লিখব কী!

আমার নিজের জীবনের দু-একটা সত্য ঘটনা নিয়েও হয়তো, ভিত গাঁথব। গাঁথব এই বানানো কাহিনি—মিশিয়ে দেব কাহিনির সঙ্গে।'

মানিকবাবু যে তাঁর দ্বিতীয় ছেলের নাম 'সুকান্ত' দিয়েছিলেন এই ভূমিকা থেকে তা

স্পষ্ট হয়ে যাবে। সুকান্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে এই ভূমিকাটির কথা আমার মনে পড়ে গেল।

মানিকবাবুর সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। পরে সেসব কথা বলার চেষ্টা করব। এখানে আমি শুধু তাঁকে আমার প্রথম দেখার ঘটনাটি বলব। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি যখন বেআইনি তখনই মানিকবাবুকে আমি প্রথম দেখি। তখন আমার বয়স ষোলো পেরিয়ে সতেরোতে চলছে।

আমি গ্রামের ছেলে। খুলনা জেলার কুমিরা গ্রামে কেটেছে আমার ছেলেবেলা। কপোতাক্ষ নদীর তীরে। দেশ বিভাগের ঘোষণায় আমাদের জেলা চলে এল হিন্দুস্থানে। দ্বিতীয় ঘোষণায় ছিটকে গেল পাকিস্তানে। আমরা ছিন্নমূল হয়ে গেলাম।

গ্রামের ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করি দেশবিভাগের বছরে। পড়তে এলাম কলকাতায়। ভর্তি হলাম সিটি কলেজে, বিজ্ঞান বিভাগে। আমাদের কলেজে ছাত্রদের মাঝে তখন রাজনীতির রমরমা অবস্থা। সভা মিছিল জটলা লেগেই থাকত। রাজনীতি আমি কিছুই বুঝি না। কারণ রাজনীতির কোনো আবহাওয়া আমাদের বাড়িতে কখনো দেখিনি। কেবল মা-কে দেখতাম চরকায় সুতো কাটতে। মাঝে মাঝে খদ্দরের ফতুয়া-ধুতি পরিহিত এক ভদ্রলোক এসে সেই সুতোগুলি নিয়ে যেতেন। এর সঙ্গে যে কোনো রাজনীতির সম্পর্ক থাকতে পারে সে কথা তখন কিছুই বুঝিনি। বুঝেছিলাম অবশ্য অনেক পরে।

ছেলেবেলা থেকেই আমি খুব নিরীহ শান্ত স্বভাবের। তবু নিজের অজান্তে কীভাবে যে রাজনীতির সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে গেলাম তা ভাবলে আজও বিস্ময় জাগে।

১৯৪৮ সালে মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। সেখান থেকে ঘোষিত হল, 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'। সেই শ্লোগান মুখে করে আমার মতো শান্ত স্বভাবের ছেলে কলকাতা শহরে দাপিয়ে বেড়াতাম, তা আজও আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। আমি আমার বাবার কাছ থেকে আর কিছু পেয়েছি কি না জানি না, কিন্তু পেয়েছিলাম নিরীহ শান্ত চেহারা। আর সেটাকেই কাজে লাগাল আমার ছাত্রনেতা অরুণ দাশগুপ্ত। আমি অনেকের মতো তাকে 'ছোটদা' বলে ডাকতাম। ছোটদা আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় কিছুকাল আগে প্রয়াত সি. পি. আই. নেতা সুকুমার গুপ্ত'র সঙ্গে। সুকুমারদা আমাকে তুলে নেন 'অ্যাকশন স্কোয়াডে'। গ্রামের হাবাগোবা বোকাসোকা ছেলেটি পরিণত হয় একটি অ্যাকশন স্কোয়াডের ক্ষুদে নেতা। আমার কাজ নির্দিষ্ট হল বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া হাতে বোমা ছোঁড়া নয়। অ্যাকশনের ছেলে সংগ্রহ করে তাদের হাতে বোমা তুলে দিয়ে অ্যাকশনকে পরিচালনা করা। আর সেই কাজ করতে গিয়েই আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম দেখি।

যে সময়ের কথা বলছি তখন কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারি, অর্থাৎ মিটিং মিছিল করা চলবে না। সেই আইন অমান্য করে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি প্রায়ই মিছিল সংগঠিত

করত এবং স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ছিল অবধারিত। সভাগুলি সাধারণত অনুষ্ঠিত হত কোনো হল ঘরে, তারপরে মিছিল বের করবার চেষ্টা হবেই। আমাদের কাজ ছিল পুলিশ মিছিলের গতিপথ রুদ্ধ করতে চাইলে তাদের আক্রমণ করা। সাধারণত আমরা বোমার ব্যবহারই করতাম। এইরকম একটি মিছিলের সংবাদ সকালের দিকে আমার গোপন আস্তানায় জানিয়ে দেওয়া হল, এবং এও জানানো হল দুপুরের মাঝামাঝি সময়ে আমার কাছে মাল-মশলা পৌছে যাবে। পৌছেও গেল। শুধু মাল-মশলা নয়, সঙ্গে দু'জন অ্যাকশন কর্মী। আমার বাছা দু'জন কর্মী আগেই উপস্থিত হয়েছে। পাঁচজনে বসে অ্যাকশনের পরিকল্পনা শুরু হল। বোমার ব্যাগের সঙ্গে যে চিরকুটটি পাঠানো হয়েছে তাতে জানলাম আজকের ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের সভায় সভাপতিত্ব করবেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং সভার পর যে মিছিল বের হওয়ার চেষ্টা হবে তার নেতৃত্ব তিনিই দেবেন। চিরকুট পাওয়ার পর আমার মনটা ভাল ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি আমার গভীর টান। বুঝি বা না বুঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কিছু লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত। একটি বইয়ে তাঁর ছবিও দেখেছি। এমন একজন উঁচুদরের সাহিত্যিককে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার কোনো অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। তবে আমরা সবাই বিশ্বাস করতাম, বিপ্লব আসন্ন—তাই সবাইকেই পথে নামতে হবে। সেই কারণ ভেবে নিজেব মনের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলাম।

আমরা ঠিক করলাম কীভাবে পজিশন নেওয়া হবে। এবং এও ঠিক করলাম পুলিশ লাঠি দিয়ে বাধা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বোমা চার্জ করা শুরু করব। আমি নিজে হাতে অবশ্য চার্জ করব না। নিরীহ গোবেচারা চেহারা নিয়ে আমি তদারকির কাজটা দেখাশোনা করব। সেই কারণেই আমি একটু দূরে থাকব। এবং সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি ঘর ছাড়ব। পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে আমাদের কোনো ত্রুটি হয়নি। কলেজ স্কোয়ারের একপাশে মির্জাপুর স্ট্রিটের ওপর আমি দাঁড়িয়েছিলাম। চারপাশে তখন আজকের মতো স্টলের জঞ্জাল জমেনি।

চারদিক ফাঁকা ফাঁকা। মিছিল শুরু হওয়ার পর কি ঘটনা ঘটে আমি তাই দেখতে চাইছিলাম। পুলিশ পজিশন নিয়েছিল এখনকার ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সামনে। শ্লোগান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ছুটে এল এবং চারদিক থেকে আমাদের স্কোয়াডের বোমচার্জ শুরু হয়ে গেল। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়তে লাগল টিয়ার গ্যাস। চারদিকে ধোঁয়া আর বিকট গন্ধ। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। চোখে অসহ্য জ্বালা, লোকজন এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। চারিদিকে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কর্মীরা যে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। দুশ্চিন্তা হচ্ছিল মিছিলে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের নিয়ে, যাঁদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। আমি শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দিকে দৌড়ে গিয়ে বন্ধ করতে উদ্যত ফেভারিট

কেবিনের ভেতর ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়লাম। ফেভারিট কেবিনের মালিক আমাকে চিনতেন। বন্ধুরা দল বেঁধে অনেকদিনই চা খাই এখানে। তিনি আমাকে বাধা না দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। একটি চেয়ারে আমি বসে পড়লাম। টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ার আঘাতে চোখে কোনো কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। এক গ্লাস জল চেয়ে রুমাল ভিজিয়ে দুই চোখে চাপ দিতে লাগলাম। আর তারপর দৃষ্টি সামান্য স্পষ্ট হলে আমি, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। আমার সামনে আর একটি টেবিলে বসে ধুতির কোঁচার খুট জলে ভিজিয়ে চোখে চেপে ধরেছেন যে ভদ্রলোক তিনি হলেন আর কেউ নন, স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। চশমা খোলা থাকায় প্রথমে একটু অসুবিধা হলেও চিনতে আমি একটু ভুল করিনি। মানিকবাবু চশমা পরার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল ছবিতে দেখা সেই মানুষটির মুখখানি। মানিকবাবুর পরনে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি। আধ ময়লা। পায়ে চটি। দৌড়তে গিয়ে এক পাটি চটি হারিয়ে ফেলেছেন, তাই নিয়ে একটু বিব্রত। দোকানির ব্যবহারে বুঝলাম মানিকবাবুকে তিনি ভালভাবেই চেনেন।

ভিতর থেকে দোকানের দরজা বন্ধ। ভিতরে মানিকবাবু, আমি, দোকানি আর চা-সার্ভ করার দু-চারজন বাচ্চা ছেলে। বাইরে শব্দহীন নিস্তব্ধতা। আমি জল চেয়ে পরপর দু'গেলাস জল খেলাম। মানিকবাবুও এক গেলাস জল খেলেন। মানিকবাবুকে তো আমি চিনি, তিনি তো আর আমাকে চেনেন না। তাঁর কাছে আমার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। আবার আমি যে তাঁকে চিনতে পেরেছি সে কথা প্রকাশ করাও উচিত নয়। একটি বছর দশেকের ছেলে আমাদের দুজনের জন্য চা আর মরিচ টোস্ট দিয়ে গেল। আমরা কেউই কোনো অর্ডার দিইনি। দোকানি ভদ্রলোকই ব্যবস্থা করেছেন। একই টেবিলে আমরা বসেছি দু'জনে। মুখোমুখি। মানিকবাবু পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। দেখলাম, সিজার্স সিগারেট। খুব আমেজে সিগারেটে একটা টান মেরে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। তখন টোস্ট ছুঁলেন না। টোস্ট ছুঁলেন আরও অনেক পরে। সিগারেট শেষ হয়ে গেলে। ইতিমধ্যে আমার অবশ্য চা-টোস্ট সব শেষ। মানিকবাবু পাশের পকেটে হাত ঢোকাতেই দোকানি ভদ্রলোক বললেন, পয়সা লাগবে না। আমিই আপনাদের খাইয়েছি।

কোনো কথা না বলে আমরা দুজনেই কৃতজ্ঞতার হাসি হাসলাম।

দোকানি ভদ্রলোক বললেন, আপনারা বসুন, আমি বাইরে বেরিয়ে দেখছি পুলিশ চলে গেছে কিনা।

আমরা চুপচাপ বসে থাকলাম। আমি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মানিকবাবুকে দেখছিলাম। চোখে চশমা, চশমার নীচে আশ্চর্য উজ্জ্বল দুটি চোখ। এমন অন্তর্ভেদী আশ্চর্য চোখ আমি তখন কেন আজও দেখিনি। মানিকবাবু পকেট থেকে প্যাকেট বের করে আবার একটা সিগারেট ধরালেন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ভিতরের কোনো উত্তেজনাকে তিনি চাপতে চাইছেন। নিজেকে স্বাভাবিক করে নিতে চাইছেন বলে আমার মনে

হয়েছিল। তবে মানিকবাবু কি ভাবছিলেন তা তিনিই জানেন। একটু পরেই দোকানি ভদ্রলোক ফিরে এলেন। বললেন, না, সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তবে বাতাসে এখনও টিয়ার গ্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। সামান্য চোখও জ্বালা করে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কি আরেকটু অপেক্ষা করব?

ভদ্রলোক বললেন, না, আপনারা এক একজন আলাদা করে বেরিয়ে যান। দোকান আমি আরেকটু পরে খুলব।

মানিকবাবুকে একা ছেড়ে দিতে আমার মন চাইছিল না। বললাম, কিছু হবে না, চলুন আমি আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

আর তখনই সমস্যা দেখা দিল। মানিকবাবুর চটির একপাটি নেই। দোকানি ভদ্রলোক দাঁড়াতে বললেন। তারপর ভিতর থেকে একজোড়া রবারের চটি এনে দিয়ে মানিকবাবুকে বললেন, পায়ে দিয়ে দেখুন, হয়ে যাবে।

মানিকবাবুর পায়ের পাতা বেশ বড়। তবু রবারের চটি কোনোরকমে ঠেলেঠুলে তিনি পায়ে লাগিয়ে নিলেন। আর তখনই লক্ষ করলাম মানিকবাবুর ধুতির কোঁচার বেশ খানিকটা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে। বোধহয় দৌড়বার সময়।

আমি বললাম, ধুতিটা একটু উল্টো করে পরে নিন। তিনি তাই করলেন।

তারপর বেরিয়ে মানিকবাবুকে আমি ধর্মতলার বাসে তুলে দিলাম।

মানিকবাবু কোথায় থাকতেন আমি জানি না। তবে তিনি ওই দিকেই যেতে চাইলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মহান লেখকের সঙ্গে এই আমার প্রথম সান্নিধ্য। কখনোই নিজেকে প্রকাশ করিনি। তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু আমি না শোনার ভান করে কোনো উত্তর দিইনি। তিনিও আমাকে আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেননি।

এই ঘটনার কথা আমি মানিকবাবুকে পরে বলেছিলাম। যখন আমি তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ। কোনো কথা না বলে প্রথম দিনের মতো সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে তিনি শুধু হেসেছিলেন। আশ্চর্য চোখের মাঝে ফুটে ওঠা সেই হাসি চোখ বন্ধ করলে আজও আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। সুকান্ত সেদিন এলে তাকে এই ঘটনাটি বলেছিলাম। আর আজ বললাম সকলের কাছে।

দুই : আরও কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা আগেই বলেছি। পঞ্চাশ-একান্ন সাল হবে। কমিউনিস্ট পার্টি আইনি ঘোষিত হয়েছে। প্রগতি লেখক সংঘের কার্যালয় ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে নিয়মিতভাবে আবার সাহিত্য-বৈঠক শুরু হয়েছে। আমিও সেই বৈঠকে যাই। সেখানে আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখি।

বেশিরভাগ সাহিত্য বৈঠকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দিতেন। তাঁর খোলামেলা সেইসব আলোচনা আজও আমার কানে বাজে।

প্রগতি সাহিত্য সংঘের অস্তিত্ব অবশ্য বেশিদিন টেঁকেনি। কিছুকালের মধ্যেই ছেচল্লিশ নম্বরের ওই ঐতিহাসিক বাড়িটা ছেড়ে দিতে হয়। প্রগতি সাহিত্য সংঘ উঠে গেলে কিছু আঞ্চলিক লেখক সংঘ তখন গড়ে ওঠে। পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়ার কথা। আমি তখন পার্ক সার্কাসের বাসিন্দা। সেই অঞ্চলে কাজি আব্দুল ওদুদকে সামনে রেখে গড়ে ওঠে পার্ক সার্কাস লেখক ও শিল্পী সমাজ। সেখানেও শুরু হয় নিয়মিত সাহিত্য বৈঠক। আমি সেই সংগঠনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হই। সেখানে মানিকবাবু বেশ কয়েকবার এসেছেন। মানিকবাবু তখন থাকতেন বরাহনগরে। অতদূর থেকে আসতে হলেও মানিকবাবু কখনও না করতেন না। আমাদেরই খারাপ লাগত। বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া আমরা মানিকবাবুকে বিরক্ত করতাম না।

পার্ক সার্কাস লেখক ও শিল্পী সমাজ গড়ে ওঠার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা ছোটদের পত্রিকা 'আগামী' প্রকাশ করি। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষভাবে বামপন্থী জগতে। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'আগামী'কে অভিনন্দন জানিয়ে সমালোচনা প্রকাশিত হল। সত্যি কথা বলতে কি আমরা সকলেই তখন কমিউনিস্ট কর্মী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য—সে কথাও বোধহয় সকলে জানেন। 'আগামী' প্রথম দিন থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্য পেতে থাকে। 'আগামী' প্রকাশিত হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ছোটদের বিভাগ 'কিশোরসভা' খোলা হয়। তার দায়িত্বভারও দেওয়া হয় আমাকে। সঙ্গে ছিলেন 'রঙরুট' উপন্যাসখ্যাত বরেন বসু ও শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মল্লিক। সকলেই আমাদের লেখক সংগঠন ও 'আগামী' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। পার্টি বেআইনি হওয়ার আগে ডেকার্স লেন থেকে যখন 'স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশিত হত সেখানে এই কিশোরসভা বিভাগটি ছিল। দায়িত্বে ছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। অতি অল্প বয়সে সুকান্তর বেদনামাখা মৃত্যুর পর ছোটদের এই বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। এককথা থেকে অন্য কথায় চলে এলাম। ছোটদের সম্পর্কে পার্টিরও যে একটু ভাবনা ছিল সেটুকু বোঝানোর জন্যেই কথাগুলি বললাম।

মনে পড়ে, লেখক-শিল্পী সমাজের এক বৈঠকের পরে আমরা সকলে মিলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'আগামী' পত্রিকার জন্য গল্প লিখতে চেপে ধরি। এককথায় মানিকবাবু রাজি হয়ে যান। তখন বোধহয় পত্রিকার তিন-চারটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। মানিকবাবু কয়েকদিন পরে আমাকে তাঁর বরাহনগরের বাড়িতে যেতে বললেন। এই সুযোগ কি আর ছাড়ি! দিন সাতেক পরে সকালবেলায় আমি মানিকবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হই। এই আমার মানিকবাবুর বাড়িতে প্রথম আসা।

একটি একতলা বাড়ি। পরে জেনেছি, নিজস্ব নয়, ভাড়া করা বাড়ি। বাড়ির সামনে বড় মাপের একটা মাঠ। আমি যখন গেলাম মানিকবাবু তখন লিখছিলেন। লেখা বন্ধ করে তিনি আমাকে বসতে বললেন। সাদাসিধে পুরনো ধরনের একটি লেখার টেবিল, টেবিলে স্তূপীকৃত পত্র-পত্রিকা। হাতল দেওয়া চেয়ারটাও খুবই পুরনো ধরনের। মানিকবাবু আমাকে বসতে বলে ভেতরে ঢুকেই ফিরে এলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে চা-বিস্কুট দিয়ে গেল একটি ফুটফুটে মেয়ে। মানিকবাবু জানালেন এটি তাঁর বড় মেয়ে। আমি জানতাম লেখাই মানিকবাবুর পেশা। তখন এই পেশায় রোজগার অত্যন্ত কম। শুধু লিখে সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব ছিল। আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম খালি হাতে মানিকবাবুর কাছ থেকে লেখা নেব না। যে করেই হোক সম্মান-দক্ষিণার জন্য তাঁকে রাজি করাতেই হবে।

আমি বুকে সাহস এনে বললাম, আমি কিন্তু খালি হাতে লেখা নেব না।

মানিকবাবুর উজ্জ্বল দুটি চোখ ও ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

কত দেব আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। সামান্য টাকা পকেটে করে এনেছি। টাকা পাবও বা কোথায়!

আমার ভাবনার অবসান মানিকবাবু নিজেই ঘটালেন। বললেন, আমাকে প্রতিটি লেখার জন্য ১০ টাকা করে দিলেই হবে। তারপর যতবার লেখা এনেছি প্রতিবারই তাঁর লেখার টেবিলে একটি দশ টাকার নোট চাপা দিয়ে রেখেছি। আজ ভাবলে অবাক লাগে, টাকার দাম তখন যতই বেশি থাক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকের পারিশ্রমিক মাত্র দশ টাকা!

মানিকবাবু আমাদের পত্রিকায় পর পর কয়েকটি গল্প লিখলেন। তাঁর বরাহনগরের বাড়িতে আমার তখন নিয়মিত যাতায়াত, পরিবারের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। যখনই যেতাম মানিকবাবু লেখা বন্ধ করে অনেক গল্প-গুজব করতেন। রাজনীতি, সাহিত্য আরও কত বিষয় নিয়ে আলোচনা হত! বউদি মাঝে মাঝে এসে বসতেন, ছেলেমেয়েরা ঘোরাঘুরি করত. আমি তখন ও বাড়ির অতি পরিচিত একজন।

কয়েকটি গল্প লিখবার পর আমি একদিন মানিকবাবুকে চেপে ধরলাম, এবার একটা উপন্যাস লিখতে হবে।

মানিকবাবু ক'দিন সময় নিয়ে রাজি হয়ে গেলেন। শুরু হল তাঁর কিশোর উপন্যাস 'মাটির কাছে কিশোর কবি'। উপন্যাসের শুরুতে মানিকবাবুর ছোট্ট একটি ভূমিকা থাকল। সেই ভূমিকাতে মানিকবাবু পরিষ্কার করে দিলেন উপন্যাসটি কবি সুকান্তর জীবনের ওপর ভিত্তি করে লেখা নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মানিকবাবু উপন্যাসটি শেষ করতে পারেননি। তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুদিন পরে আমরা একটি বারোয়ারি উপন্যাস শুরু করেছিলাম। সেটাও শুরু করার কথা ছিল মানিকবাবুর। কিন্তু শুরু করতে তিনি পারেন নি। অসুস্থতা

তাঁর ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। লেখার ব্যাপার না থাকলেও আমি তখন তাঁকে নিয়মিত দেখতে যাই, কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে আসি। মাঝখানে কিছুদিন আমি যেতে পারিনি। একদিন গিয়ে দেখি মানিকবাবুর লেখা এবং বসবার ঘরটিতে লেখার টেবিলের কাছ দিয়ে একটা পার্টিশন দেওয়া হয়েছে। পার্টিশনের ওপার থেকে আর্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। জানতে পারলাম, মানিকবাবুর বাবা এসে ওখানে আছেন। আমি উঁকি দিয়ে মানিকবাবুর বাবাকে সেই প্রথম ও শেষবারের মতো দেখেছিলাম। মানিকবাবুর মতনই সুদীর্ঘ। মনে হয়েছিল, বয়স বোধহয় নব্বই হতে পারে।

লক্ষ করছিলাম যত অসুস্থতা বাড়ছে মানিকবাবু কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠছেন। মানিকবাবুর ব্যক্তিত্বকে সবাই সম্ভ্রম করত, একটু ভয়ও বোধহয় করত। কেন জানি না মানিকবাবুর সঙ্গে কথা বলতে আমার কখনও কোনও সংকোচ হত না। এখন ভাবি আমাকে এই প্রশ্রয় বোধহয় মানিকবাবু নিজেই দিয়েছিলেন। তখন কতই বা আমার বয়স! বাইশ-তেইশ হবে বোধহয়।

আমি ছাড়াও তখন মানিকবাবুর বাড়িতে যাঁদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাঁরা হলেন—কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলকুমার সিংহ প্রমুখ। অনিলকুমার সিংহ তখন একটি সাড়া জাগানো মাসিক পত্রিকা 'নতুন সাহিত্য' প্রকাশ করছেন। মানিকবাবু এই পত্রিকাতে নিয়মিত লিখতেন।

এমন এক সময় সকালে মানিকবাবুর বাড়ি গিয়েছি। মানিকবাবু ছিলেন না। একটু পরেই ফিরলেন। আমি তখন চা খেতে খেতে বউদির সঙ্গে গল্প করছি। মানিকবাবু ফিরে চুপচাপ তাঁর নিজের লেখার চেয়ারে বসে পড়লেন। বসেই তাঁর প্রিয় ব্র্যান্ড 'সিজার্স' সিগারেট ধরালেন। আমাকে দেখেও কোনও কথা বললেন না। মানিকবাবুকে একটু অন্যরকম, একটু অস্বাভাবিক লাগছে। কেউই কথা বলছে না। ঘরের মাঝে বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা।

বৌদি এবার মুখ খুললেন। বললেন, আপনারা একটু বুঝিয়ে বলুন। আপনাদের কথা শুনলেও আমার কথা উনি কিছুই শোনেন না। ওঁর শরীরের অবস্থা দিন দিন খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। আপনারা কতটুকু বুঝছেন আমি জানি না, তবে আমি বুঝতে পারছি বিপদ ঘনিয়ে আসছে। উনি হঠাৎ চলে গেলে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি কি করব?

বৌদির দিকে তাকিয়ে দেখি চোখের কোণে ছোট ছোট জলবিন্দু চিকচিক করছে। বউদি আঁচলে চোখ মুছলেন।

এমন একটি বিষণ্ন পরিবেশে আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না। আমার ভেতর থেকে একটা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আমি আপ্রাণ চেষ্টায় সেই কান্নাকে নিয়ন্ত্রিত করছিলাম।

মানিকবাবু কিন্তু নির্বিকার। নির্লিপ্তভাবে তিনি সামনের বইয়ের আলমারির দিকে তাকিয়ে সিগারেটে ধোঁয়া ছাড়ছেন। তারপর সিগারেটটি শেষ হলে মুখ খুললেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আপনার বউদিকে পথে ভাসিয়ে যাচ্ছি না। সামনের আলমারিটার দিকে দেখুন।' এইটুকু বলে মানিকবাবু চুপ করলেন। কথাটি শেষ করলেন না।

আমি সামনের আলমারির দিকে তাকালাম। নিয়মিতই তো এ আলমারিটা দেখছি। তবু আজ হঠাৎ কেন যেন নতুন লাগল আলমারিটাকে। পুরনো আলমারি, বই-পত্রিকা ও টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা। ওপরের তাকে সাজানো কিছু বই। কাচ দিয়ে ঢাকা আলমারি। ওপরের তাকে নজর যেতেই দেখতে পেলাম পর পর সাজানো আছে 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'দিবারাত্রির কাব্য', আর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত পদ্মা নদীর মাঝির ইংরেজি সংস্করণ 'বোটম্যান অভ পদ্মা'। আলমারির কাচে ধুলো জমেছে। সব বইয়ের নাম তাই স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে না। বুঝতে পারলাম আলমারি ঠাসা সব বই-ই মানিকবাবুর।

মানিকবাবু আবার একটি সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আলমারিতে আমার সব বই বোধহয় নেই। কিছুটা হয়তো আছে। আমি জানি বেশির ভাগ বই-ই ফেলে দিতে হবে। পয়সার জন্যে অনেক লেখাই আমাকে লিখতে হয়েছে। সে সবের কোনও মূল্য নেই। কিন্তু ওপরের তাকটার দিকে তাকিয়ে দেখুন—সেখানে এমন কিছু বই আছে যা দিয়ে আপনার বউদি তাঁর ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পারবেন।' এটুকু বলে মানিকবাবু চুপ করলেন।

আমি নিশ্চুপ। বুঝতে পারছি না কি বলব। এমন কথার পরে কি আর বলবার থাকতে পারে! নিজের সৃষ্টির মূল্যায়নের প্রতি কি গভীর বিশ্বাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই মুহূর্তে মনে হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক জনই।

বেশিক্ষণ আর থাকি নি। আর দু-চারটি টুকিটাকি কথা বলে আমি বেরিয়ে এলাম।

এরপর বেশ কিছুদিন যাওয়া হয়নি। অন্য একটি বিশেষ কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সেদিন অবশ্য একটি সত্য অনুভব করেছিলাম, মানিকবাবু বোধহয় আর বেশিদিন নেই।

কিন্তু সেদিনের সেই উপলব্ধি এত তাড়াতাড়ি প্রকৃত সত্যে পরিণত হবে তা ভাবতে পারিনি। ভাবতে পারিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেদিনের সেই সাক্ষাৎ হবে আমার শেষ সাক্ষাৎ। প্রথম সাক্ষাৎ-এর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ-এর ব্যবধান প্রায় সাত বছরের। এই সাতটি বছর আজও আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, তার স্পর্শ অনুভব করি।

মনে আছে, সেদিন শান্তি সংসদের ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি সভা ছিল। আমি

সেই সভায় যেতে পারিনি। সেই সভায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা ছিলেন। সেখানেই মানিকবাবুর চরম অসুস্থতার সংবাদ আসে। সুভাষদারা বরাহনগর ছুটে যান। সেই রাতে আমি কোনও সংবাদ পাইনি। তখন টেলিফোনের এত সুযোগ ছিল না। সকালের দিকে সংবাদ পেয়ে আমি ছুটে যাই নীলরতন সরকার হাসপাতালে। তখন সব শেষ। অকস্মাৎ আমি কেমন ভেঙে পড়ি। কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারছিলাম না। কেন আমি কালকে সভায় যেতে পারলাম না। কেন আমি শেষ সময়ে থাকতে পারলাম না! এত কাছের মানুষ হয়েও এ আমার কি পরিণতি। বারবার মনের মাঝে ভেসে উঠছিল মানিকবাবুর সেদিনের সেই শেষ কথাগুলো। নিজের সৃষ্টির প্রতি যেমন গভীর বিশ্বাস, নিজের জীবন-মৃত্যুর প্রতি তেমনি গভীর বিশ্বাস। আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে তিনি বোধহয় সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলাম। ধীরে ধীরে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। হাসপাতালে লেখক ও পাঠকেরা আসতে শুরু করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দও কেউ কেউ এসে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সুভাষদা, দীপেন আর আমি স্থির করি মরদেহ আমরা পার্টির জেলা কমিটির কার্যালয় ৮০ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে নিয়ে যাব। হাসপাতাল থেকে জেলা পার্টি অফিস দূরে নয়। হাসপাতালের নিয়ম-কানুন চুকিয়ে মরদেহ পার্টি অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। পার্টি অফিসের মাঝখানে বিশাল হলঘরে আমরা মরদেহ রাখি। ধীরে ধীরে ভিড় বাড়তে থাকে। লেখক, পাঠক, ছাত্র-ছাত্রী, বৃদ্ধ, তরুণ কত রকমের মানুষ। ফুলে-ফুলে ভরে গেল হলঘর। আমি আর দীপেনই সব কিছু দেখাশোনা করছিলাম। দীপেনের কিছুটা শারীরিক অক্ষমতা ছিল। সে অক্ষমতা দীপেন কোনওদিন স্বীকার করেনি। সেদিনও মানেনি। আমি জোর করে দীপেনকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিলাম। স্থির হয় আমরা নিমতলা শ্মশানে দাহ করব। এত বেশি লোক সমাগম যে মরদেহ লরিতে তুলতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। লরিতে উঠি আমরা তিন জন। শিয়রে আমি আর দীপেন আর পায়ের নীচে তাঁর কিশোর-পুত্র। এদিক-ওদিক ঘুরে আমরা প্রেসিডেন্সির সামনে লরি দাঁড় করাই। সেখানে প্রচণ্ড ভিড়। বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি ও বইপাড়া ভেঙে পড়েছিল। ভিড়ের মাঝে অনেক লেখককে দেখতে পাই। লক্ষ করলাম প্রবোধ সান্যাল কিছুতেই সামনের দিকে এগোতে পারছেন না। তিনি বোধহয় মানিকবাবুকে শেষ দেখা দেখতে চাইছিলেন। বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হল না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, লরিতে আর ফুল রাখার জায়গা নেই। ফুলের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। আমরা লরি ছেড়ে দিলাম। আর থামিনি। সোজা নিমতলা। লরি থেকে নামিয়ে গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা শুইয়ে রাখলাম। খাটের চারপাশে সাজিয়ে রাখলাম ফুল আর ফুল। যেন নতুন ফুলসজ্জা। আমি আর দীপেন মাত্র দুজন নই অনেকেই হাত লাগিয়েছেন। উপর থেকে সুভাষদাই সব

দেখাশুনো করছিলেন। সুভাষদার মত না নিয়ে আমি আর দীপেন কোনও কিছুই করিনি। ইতিমধ্যে সুভাষদা আমাদের ডেকে বললেন, দাহ করতে কিছুটা । দেরি হবে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খবর পাঠিয়েছেন তিনি দিল্লি থেকে রওনা হয়েছেন, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বোধহয় পৌঁছে যাবেন। তারাশঙ্করবাবু অনুরোধ করেছেন তিনি আসার আগে যেন দাহ করা না হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রাজ্যসভার সদস্য।

তারাশঙ্করবাবুর আসতে একটু দেরি হল। মরদেহের পাশে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্করবাবু অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। তারাশঙ্করের কথাবার্তায় বুঝতে পারছিলাম ভেতরে ভেতরে তিনি খুবই ভেঙে পড়েছেন, কেমন একটা অপরাধবোধ কথায়-বার্তায় বেরিয়ে আসছে। যে অসীম দারিদ্র্যে মানিকবাবুর শেষ জীবনটা কেটেছে সেটা বোধহয় তারাশঙ্করবাবু মানতে পারছিলেন না। তারাশঙ্করবাবুর নিজের অবস্থা তখন সচ্ছল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তাঁরও জীবিকা ছিল লেখা। মানিকবাবুর এই দারিদ্র্যের সত্যিই কি কোনও কারণ ছিল? প্রকাশকদের কাছ থেকে তিনি সত্যিই কি যথাযথ ব্যবহার পেয়েছেন? এ প্রশ্নের সমাধান আমি আজও করতে পারিনি। আজ যখন তাঁর রচনাবলী সংগ্রহের জন্য পাঠকের ভিড় জমে তখন এই প্রশ্ন আরও বেশি করে মনে হয়।

তারাশঙ্করবাবু প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

ওদিকে চিতা সাজানো শুরু হয়ে গেছে। আমি দীপেন চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে আছি। পায়ের তলা থেকে কেমন যেন ধীরে ধীরে মাটি সরে যাচ্ছে। মনের মাঝে অসীম বিষণ্ণতা।

কাঠের সজ্জায় শায়িত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আমি আর দীপেন আরও পিছনের দিকে সরে এলাম। আকাশের দিকে মুখ করে ঠেলে উঠছে আগুনের লেলিহান শিখা। মহাশূন্যে মিলিয়ে গেলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। হারিয়ে গেল অসাধারণ উজ্জ্বল সেই দুটি চোখ। সুনীল জানার ছবিতে সেই দুটি চোখ আজও আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি মিলিয়ে যেতে পারেন? দেখতে দেখতে তাঁর মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। বছর দুয়েক বাকি। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আজও জীবিত। আরও অনেক পঞ্চাশ বছর কেটে গেলেও তিনি একইরকম ভাবে জীবিত থাকবেন।

মানিকবাবুর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রবীণ থেকে নবীন সব লেখকরাই সেদিন উপস্থিত ছিলেন। হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেই সভায় সজনীকান্ত দাস ও

আরও অনেকে ঘোষণা করেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মরণোত্তর সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তখন তাঁরাই ছিলেন সাহিত্য আকাদেমির হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

কিন্তু ঘোষণা ঘোষণাই থেকে গেল। জীবিতকালে যেমন ঘটেছে সেই একইরকম ঘটনা। সেদিনের সেই কথাগুলি ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কোনও পুরস্কারই জীবিত অথবা মৃত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপালে জোটেনি। তাতে কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও ক্ষতি হয়েছে? ক্ষতি হলে হয়েছে যাঁরা পুরস্কার প্রদান করেন সেই সব প্রতিষ্ঠানের। এই কালির চিহ্ন কি তাঁরা কখনও মুছে ফেলতে পারবেন? মনে হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক আমাদের প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। শিষ্যের কাছে তার জীবনে গুরুর চেয়ে বড় কেউ নয়। শিষ্যেরাও গুরুর পরম স্নেহের পাত্র। গুরুর কাছে গড়ে উঠত শিষ্যের চরিত্র গঠন। আমরা যারা পুরনো দিনের মানুষ তারা এই সম্পর্কের কিছুটা ছোঁয়া পেয়েছি। আজ আর সেইসব দিন নেই। শিক্ষককে কেউ গুরু বলে মানে না। আর শিক্ষকেরাও ছাত্র-ছাত্রীদের শিষ্য-শিষ্যার চোখে দেখেন না। স্বাভাবিকভাবে চরিত্র-গঠনের কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

আমি কিন্তু জীবনে প্রকৃত অর্থে একজন গুরু পেয়েছিলাম। আমি কেন আমার সময়ের সকল ছাত্রই তাঁকে গুরু বলে মেনেছিল। দেশ বিভাগের বছরে আমি গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় পড়তে আসি। ভর্তি হই সিটি কলেজে। সেখানেই বাংলার অধ্যাপক ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নারায়ণবাবুর তখন সাহিত্যিক হিসেবে খুব নাম ডাক। সিটি কলেজে তখন ছাত্রের সংখ্যা অসংখ্য। মনে আছে আমরা গ্যালারিতে বসে ক্লাস করতাম। অতজন ছাত্রকে একজন শিক্ষক কীভাবে যে নিয়ন্ত্রণ করতেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। নারায়ণবাবু ছিলেন খুব রসিক মানুষ। হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়েই তিনি আমাদের ক্লাস নিতেন। অতবড় কলেজের দুজন অধ্যাপক ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। একজন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যজন বিভূতি চৌধুরী। দুজনেই বাংলার। যদিও আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম তবুও বাংলার ক্লাস কখনও ছেড়ে যাইনি। অন্য কলেজ থেকে ছাত্ররাও নারায়ণবাবু বিভূতিবাবুর ক্লাসে এসে যোগ দিত। সেই রেওয়াজ তখন ছিল। আমরাও যে অন্য কলেজে যাইনি তেমন নয়। বহিরাগত ছাত্র জেনেও অধ্যাপকরা কখনও আপত্তি করতেন না। তখন দিনগুলোই ছিল অন্যরকম। অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে থেকে আমরা কয়েকজন কীভাবে যে নারায়ণবাবুর কাছাকাছি চলে এলাম তা আজ আর মনে করতে পারি না। আমরা তখন ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। বিশ্বাস করতাম, এ স্বাধীনতা—স্বাধীনতা নয়। দেশে বিপ্লব আসন্ন। সে বিশ্বাস ভঙ্গ হতে কিছুটা সময় লেগেছে। তার মধ্যেই অবশ্য ঝরে গিয়েছিল অসংখ্য প্রাণ। নারায়ণবাবুও ছিলেন আমাদের মতন ভাবধারায় বিশ্বাসী। স্বাভাবিকভাবে তাঁর অনেক প্রশ্রয়ই আমরা পেয়েছি। তবে পড়াশুনোর ক্ষতি হোক শিক্ষক হিসেবে নারায়ণবাবু কখনও চাইতেন না। কিন্তু কিছুটা পড়াশুনোর ক্ষতি তো আমাদের হয়েছিলই। সে কথা অস্বীকার করি কি করে! তরুণ বয়স। বিপ্লব হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আমরা স্বপ্নে মশগুল। কোথায় উড়ে গেল সেই সব স্বপ্ন। যখন মাটিতে পা রাখলাম তখন দেখলাম অনেক দেরি হয়ে গেছে। জীবনের বেশ ক্ষতি হয়ে গেছে। তার জন্যে অবশ্য আমার কোনো আপশোশ নেই। সেদিনের সেই জীবন থেকে তো

শিখেছি অনেক। মানুষকে ভালবাসতে শিখেছি, ভালবাসতে শিখেছি দেশকে। সে ভালবাসা বুকে বেঁধেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাই। এই ব্যাপারে শিক্ষক নারায়ণবাবুর অবদান কখনই অস্বীকার করতে পারি না।

সাহিত্যের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার শিক্ষাও পেয়েছি নারায়ণবাবুর কাছ থেকে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নারায়ণবাবুই আমাকে বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক বই নারায়ণবাবুর কাছ থেকে নিয়ে পড়েছি। বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে দিয়েছেন। পাঠক্রম তো ছিল যৎসামান্য। বাইরের পড়ার দিকে নারায়ণবাবু খুবই জোর দিতেন।

কলেজ ছাড়বার পর নারায়ণবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটুও কমেনি। বরঞ্চ দিনে দিনে বেড়ে গেছে। আমি তাঁর পটলডাঙার বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেছি। নারায়ণবাবুর স্ত্রী আশা দেবীও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি আমার অজান্তেই নারায়ণবাবুর পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিলাম। তখন ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের পর্দাটা খসে পড়েছিল।

নারায়ণবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বিশেষভাবে গড়ে ওঠে ১৯৫২ সালে ছোটদের পত্রিকা 'আগামী' প্রকাশিত হবার পর। নারায়ণবাবু 'আগামী'র নিয়মিত লেখক হয়ে গেলেন। তখন আমাদের এমন কোনো শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি যাতে নারায়ণবাবুর লেখা নেই। নারায়ণবাবুর হাতের লেখাও দেখবার মতো। খুব ছোট অক্ষর কিন্তু স্পষ্ট। একটা লাইনও বাঁকা নয়। নারায়ণবাবুর হাতের লেখা অনেকদিন আমার কাছে ছিল। বারবার বাড়ি পাল্টানোয় আজ আর কিছুই খুঁজে পাই না।

মনে আছে, আমার চোখের সামনে সৃষ্টি হল নারায়ণবাবুর অমর চরিত্র 'টেনিদা'। তখনকার দিনের বিখ্যাত ছোটদের পত্রিকা 'শিশুসাথী'তে প্রকাশিত হতে থাকল টেনিদার কাহিনি। শুধু ছোটদের জগত নয়, টেনিদা বড়দেরও তোলপাড় করে দিল। নারায়ণবাবুর ওপর আমি সেদিন অভিমান প্রকাশ করেছিলাম। টেনিদার কাহিনি 'আগামী'তে প্রকাশিত না হওয়ায়। নারায়ণবাবু আমাকে বুঝিয়েছিলেন, অনেকদিন আগে কথা হয়ে আছে, তাই তিনি ফেলতে পারেননি। নারায়ণবাবু মুখে কিছু না বললেও শিশুসাথীর বিক্রয় সংখ্যা ছিল অনেক বেশি, সেটিও হয়তো অন্যতম কারণ। আমার অভিমানকে প্রশমিত করবার জন্য নারায়ণবাবুকে অনেক বেশি লেখা দিতে হয়েছিল 'আগামী'তে। নারায়ণবাবু শুধু 'আগামী'তে লেখেননি সবসময় 'আগামী'র উপদেষ্টা হিসেবেও ছিলেন। শারদীয় সংখ্যার পরিকল্পনা করে আমি নারায়ণবাবুকে দেখিয়ে আনতাম। তিনি অনেক সময়েই যোগ-বিয়োগ করে দিতেন।

নারায়ণবাবু ছিলেন বরিশালের মানুষ। ভারি মজা করে বাঙাল কথা বলতে পারতেন। 'চারমূর্তি' উপন্যাসে সেই সব বাঙাল কথার তিনি অসাধারণ ব্যবহার

করেছেন। নারায়ণবাবু অনেক সময় আমাকে মুখে মুখে গল্প বলতেন। আর এমন মজা করে বাঙাল কথাগুলো বলতেন যে হাসতে হাসতে পেট ফেটে যেত।

নারায়ণবাবুর পটলডাঙার বাড়িটা ছিল খুব ভাঙাচোরা। এই সময় বৈঠকখানায় তিনি একটি বাড়ি কেনেন। কিন্তু কিছুতেই দখল নিতে পারছিলেন না। আমাকে অনেকদিন বলেছেন, আমি স্থানীয় পার্টিকে বলেও কিছু করে উঠতে পারিনি। তখন তো আর পার্টি এত ক্ষমতাবান ছিল না। যাহোক কয়েকজনের সহায়তায় নারায়ণবাবু বাড়িটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। পটলডাঙা ছেড়ে উঠে যান বৈঠকখানায় নিজস্ব বাড়িতে। বেশ সুন্দর আর বড় বাড়ি। নারায়ণবাবু সারিয়ে একেবারে নতুন করে নিয়েছেন। নতুন বাড়িতে আমার যাতায়াত আরও বেড়ে গেল। বেশিরভাগ সময়ই ভিতরে আশাদির কাছে চলে যেতাম। আশাদি নিজেও ছিলেন লেখিকা। 'আগামী' পত্রিকায় আশা দেবীর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আশাদি শিশু সাহিত্যের ওপর গবেষণা করে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। সে ব্যাপারে আশাদিকে অনেক সাহায্য করেছি। মজার কথা চাকরির জন্য নারায়ণবাবুকেও শেষ বয়সে ছোটগল্পের ওপর গবেষণাপত্র লিখে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করতে হয়। নারায়ণবাবু তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। যিনি সারা জীবন একের পর এক সাড়া জাগানো ছোটগল্প লিখলেন, ছোটগল্প পড়িয়ে ছাত্রদের শিক্ষিত করলেন তাঁকেই পেশ করতে হল ছোটগল্পের ওপর গবেষণাপত্র। এর চেয়ে মজার আর কি হতে পারে! অসাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি!

আশা দেবী যে নারায়ণবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সে কথা আমরা জানলেও কখনও নারায়ণবাবুর কাছে সেই প্রসঙ্গ তুলতে পারিনি। আমরা শুনেছিলাম নারায়ণবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী খুবই অবহেলিতা, আগের পক্ষের একটি মেয়ে আছে, কিন্তু নারায়ণবাবুর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অবাক হয়ে ভাবতাম নারায়ণবাবুর মতো এত ভদ্র ভালমানুষ কীভাবে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু মুখ খুলবার সাহস করতাম না। সুযোগ অবশ্য নারায়ণবাবু একদিন নিজেই করে দিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল বৈঠকখানা নয়, পটলডাঙার বাড়িতে। একদিন গিয়ে দেখি নারায়ণবাবু নীচের ঘরে বসে এবং খুব গম্ভীর। হাসি-খুশি স্বভাবের নারায়ণবাবুকে এমন গম্ভীর হতে কখনও দেখিনি। নারায়ণবাবু খুব গোল্ড ফ্লেক সিগারেট খেতেন। টেবিলে প্যাকেট থাকলেও কখনও ছাত্রদের সামনে সিগারেট ধরাতেন না। আমি সামনে গিয়ে বসলেও তিনি সেদিন সিগারেট নেভালেন না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, আপনার কি হয়েছে?'

নারায়ণবাবু উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলেন। আমি আবার খোঁচালাম। আমি বুঝতে পারছি কিছু ঘটনা ঘটেছে। বললাম, 'আপনি আমাকে বলুন। আমি হয়তো কিছুটা আপনার উপকারে আসতে পারব।'

এইবার নারায়ণবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, 'পাগল! ছেলেমানুষ! তুমি কি করবে? জীবনটা বড় জটিল। এই জটিলতার অর্থ আমিই বুঝি না তো তুমি বুঝবে কি করে?'

আমি নাছোড়বান্দা। জিজ্ঞেস করলাম কি সেই জটিলতা। এমন কথা জিজ্ঞেস করবার প্রশ্রয় নারায়ণবাবুই আমাকে দিয়েছিলেন। না হলে কোনো ছাত্রের পক্ষে শিক্ষককে এমন প্রশ্ন করা সম্ভব নয়।

এবার নারায়ণবাবু মুখ খুললেন, 'তোমরা তো বাইরে আমাকে নিয়ে অনেক কানাঘুষো করো, সেটা স্বাভাবিক। তোমরা যা শুনেছ সেকথা সত্যি, তোমাদের আরও একজন বৌদি আছেন, আরও একজন বোন আছে। কিন্তু তাঁদের প্রতি আমি পুরো দায়িত্ব পালন করতে পারছি না অশান্তির ভয়ে। আজ তাঁর মেয়েকে নিয়ে তোমার সেই বৌদি এসেছিলেন। তারপর যা পরিণতি হবার তাই হয়েছে। আর কিছু প্রশ্ন আমাকে কোরো না।'

কোনো প্রশ্নই আর আমি নারায়ণবাবুকে করিনি। নারায়ণবাবু অবশ্য কথাকটি বলে বোধহয় হালকা হয়ে গেলেন। ফিরে এলেন আবার তাঁর সেই খোশমেজাজি গল্পে। এমন বিষণ্নতা এমন আকস্মিকভাবে আমাকে গ্রাস করেছিল যে আমি বেশিক্ষণ বসতে পারিনি। আমি গেলে আশা দেবী নীচে নেমে আসতেন। কিন্তু সেদিন আসেন নি। আমার প্রাপ্য চা-বিস্কুটও সেদিন পাইনি।

নারায়ণবাবু যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তখন মাঝে মাঝে আমাদের কার্যালয়ে আসতেন। পটুয়াটোলা লেনের মধ্যে দিয়েই তিনি বৈঠকখানার বাড়িতে ফিরতেন। যেদিন আসতেন সেদিন অনেকটা সময় কাটিয়ে যেতেন আমাদের মাঝে। নারায়ণবাবু এলেই আবহাওয়াটা কেমন ফুরফুরে হয়ে উঠত। নারায়ণবাবুর সেই মজাব গল্প বলার ঢঙ সবাইকে মুগ্ধ করত।

নারায়ণবাবু একদিন আমাকে বাংলা সাহিত্যের দুইজন লেখক সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন বুঝিয়েছিলেন। একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কেন তাঁরা অনেক উঁচুদরের লেখক, কেন তাঁরা অন্যদের চেয়ে পৃথক নারায়ণবাবুর নিখুঁত বিশ্লেষণে সে কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর আমরা যে স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম সেখানে নারায়ণবাবুর একটি অসাধারণ লেখা ছিল। অতি অল্প কথায় মানিকবাবুর মহত্ত্ব তিনি ছোটদের কাছে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

নারায়ণবাবু ছিলেন প্রেমিক মানুষ। তিনি ছিলেন রোমান্টিক চেহারার অধিকারী। শেষ বয়সে নারায়ণবাবুর একজন তরুণী বান্ধবী হয়েছিল। সে কথা আমি জানতাম। ভদ্রমহিলাকে চিনতামও। তাঁর নামটা আজ আর করতে চাই না। বছর কয়েক আগেও তিনি আমার কাছে খুব আসতেন। অনেকদিন দেখা নেই। জানি না বেঁচে আছেন কিনা। সেই বান্ধবীকে নিয়ে আমাদের কিছুটা হয়রানি ভোগ করতে হয়েছে। সে কথা পরে বলছি। নারায়ণবাবুর সঙ্গে বেশ কিছুদিন যোগাযোগ ছিল না। হয়তো তিনি আমাকে

এড়িয়ে চলতেন। হয়তো তাঁর মনে ভয় ছিল আমি আশা দেবীকে তার কথা বলে দেব। কিন্তু আমি বলিনি। কোনোদিন এই প্রসঙ্গ ওঠেনি।

নারায়ণবাবু তখন বৈঠকখানার বাড়ি বিক্রি করে গোলপার্কে উঠে গিয়েছেন। সেদিনের সেই শিশুপুত্র অরিজিৎ বেশ বড় হয়ে গেছে। অরিজিৎ ছিল বাবার মতো পড়াশোনায় খুব ভাল। কর্মজীবনেও সে সফল।

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম নারায়ণবাবু অসুস্থ হয়ে পি.জি. হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আমি আর আমার বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটে গেলাম পি. জি. হাসপাতালে। দীপেন ছিল নারায়ণবাবুর ছাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমরা পৌঁছবার আগেই সব শেষ। জানতে পারলাম নারায়ণবাবু আর নেই। মনে আছে আমি আর দীপেন চুপচাপ পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কেউ কোনো কথা বলছিলাম না। আমার মনের মাঝে তোলপাড় করছিল সেই পুরানো দিনগুলি। চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গুরুর কৌতুকভরা মুখ। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর দীপেন আর আমি শিষ্যের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলাম। নারায়ণবাবুর অন্তিম যাত্রার ব্যবস্থা শুরু করলাম। নারায়ণবাবুর জীবন শেষ হয়েছিল আগের দিন রাতে। মরদেহ রাখা ছিল ঠান্ডাঘরে। শেষ যাত্রা শুরু হয় পরদিন সকালে। নারায়ণবাবুর দু-চার জন আত্মীয় এসেছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন তাঁর ভাই শেখর গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি পাটনার বাসিন্দা। শেখরবাবুকে আমি চিনতাম। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, শান্তি ও মৈত্রী আন্দোলনের কর্মী। শেখরবাবু আমার আর দীপেনের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। তিনি আমাদেরও রাজনীতির পরিচয় জানতেন। এই সময় হঠাৎ লক্ষ করি, এক কোণায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন নারায়ণবাবুর শেষ জীবনের বান্ধবী। কেউ তাঁকে চিনছে না, কোনো কথাও বলছে না। আমার খুব খারাপ লাগছিল। দীপেন তাঁর কাছ যেতে আমাকে নিষেধ করল।

সেদিনের সেই বিনিদ্র রাতের কথা মনে পড়লে আজও আমার মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। নারায়ণবাবুর সান্নিধ্যের সেই দিনগুলি বারবার আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। ভোর হতেই ছুটে গিয়েছিলাম পি. জি. হাসপাতালে।

পরদিন সকালে ধীরে ধীরে জড়ো হতে লাগল নারায়ণবাবুর ছাত্র-ছাত্রীর দল। রেডিয়োতে মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। দেখলাম তার মধ্যে রয়েছে আমাদের বন্ধু সুবীর রায়চৌধুরী। সুবীর আমাদের দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে এল। শেখরবাবুর সঙ্গে কথা বলে স্থির হল আমরা কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাব নারায়ণবাবুর মরদেহ। সেইমতো ব্যবস্থা হল, একটা বড় লরি ভাড়া করা হল। লরিতে মরদেহ তোলা হল। খুব বেশি লোক তখন জড়ো হয়নি। অনেকেই কেওড়াতলায় চলে গেছে। রেডিয়োতে কেওড়াতলার কথা ঘোষিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও লরিতে সবাইকে ধরল না। আমি আর দীপেন তো সব ব্যবস্থা করছি, স্বাভাবিকভাবেই আমরা লরিতে ছিলাম, সুবীরকেও তুলে নিলাম। এমন সময় অভূতপূর্ব একটি ঘটনা ঘটে গেল। নারায়ণবাবুর সেই বান্ধবী

লরিতে উঠতে চাইছেন কিন্তু কারোরই তাকে তুলে নেবার আগ্রহ নেই। আমরা ভেবেছিলাম তিনি নারায়ণবাবুর মরদেহের সঙ্গে শ্মশানে গেলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সমস্যা এড়িয়ে যাওয়াটাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। তাই তিনি কাকুতি মিনতি করলেও আমি আর দীপেন সাড়া দিইনি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি খুবই খারাপ লাগছিল। এমন সময় লরি ছেড়ে দিল। দেখলাম হরিশ মুখার্জী রোড ধরে তিনি লরির পিছনে পিছনে দৌড়চ্ছেন। কি মর্মান্তিক দৃশ্য। কি নির্মম আমরা। সামাজিকতার দায় কি ভয়াবহ।

মরদেহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে সিটি কলেজে পৌছল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকরা ভেঙে পড়েছিলেন। রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। ট্রাম-বাস বন্ধ। সিটি কলেজে পৌছলে দেখলাম সেখানে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পরম স্নেহে তার প্রিয় অনুজ লেখককে আদর করলেন। গায়ে হাত বুলোলেন। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য।

শ্মশানে আমরা যখন পৌছলাম তখন অসংখ্য ছাত্রছাত্রী উপস্থিত, উপস্থিত সাহিত্যিকেরা। আমি আশাদির খোঁজ করছিলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না। শুনলাম মনোজ বসু আশা দেবীকে তাঁর লেক রোডের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন। শুধু ছেলে থাকবে মুখাগ্নি করবার জন্য। কেন এই ব্যবস্থা সে কথা বুঝলাম একটু পরে। নারায়ণবাবুর প্রথমা স্ত্রী ও কন্যা শ্মশানে উপস্থিত। এই প্রথম নারায়ণবাবুর বলা সেই অন্যবৌদি ও নারায়ণবাবুর কন্যাকে দেখলাম। দুজনেই বেশ সুন্দরী। শ্মশানের একপাশে চুপচাপ তাঁরা বসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁদের বাপের বাড়ির কিছু আত্মীয়। বুঝতে পারলাম গভীর এক সমস্যার সৃষ্টি হতে চলেছে। সেখানে আমার আর দীপেনের কিছু করার নেই।

সমস্যা কিছু হয়েছিল ঠিকই, তবে চরম তিক্ততায় পৌছায়নি। বুঝলাম আশা দেবী থাকলে তিক্ততা হতে পারে এ-কথা ভেবে বিজ্ঞ মনোজ বসু তাঁকে আগেই সরিয়ে নিয়েছেন। সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। ঘামাতে ইচ্ছেও করেনি। বারবার মনে হচ্ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এসব তুচ্ছতার উর্ধ্বে। তাঁকে এত বছর ধরে দেখলাম, কোনো তুচ্ছতা তাঁকে কখনও স্পর্শ করেছে এমন দেখিনি। পরবর্তীকালে যে ঘটনাই ঘটুক তাঁকে তো আর কোনোভাবেই স্পর্শ করতে পারবে না।

একদিক থেকে নিজেকে তৃপ্ত মনে হচ্ছিল। অনুগত শিষ্য হিসাবে গুরুর প্রতি শেষ কর্তব্য পালন করেছি। গুরুর অন্তিম যাত্রার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। ছাত্র হিসেবে এ আমার পরম প্রাপ্তি।

নারায়ণবাবু চলে গেলেন। রেখে গেলেন তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি। আর আমার মতো মানুষদের জন্যে মনুষ্যত্বের গভীর চেতনা আর জীবনবোধের পরিচয়। শিষ্যের কাছে গুরুর কখনও মৃত্যু হয় না। মৃত্যুহীন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ রায়

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার কথা। বাংলা প্রকাশনাকে এক লাফে অনেকটা এগিয়ে দিল সিগনেট প্রেস। বইয়ের যে একটা আলাদা রূপ আছে, যে রূপ-মাধুর্য পাঠককে চকিতে কাছে টেনে নেয় সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করল এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। সিগনেট প্রেসের কর্ণধার ছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত। সকলের কাছে তিনি ডি. কে. নামে পরিচিত ছিলেন। বিজ্ঞাপন জগতেরও তিনি ছিলেন একজন দিকপাল। জুতোর বিজ্ঞাপন যে একটি শিল্প হতে পারে ডি. কে. বাটাতে থাকবার সময় তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। যাঁর হাত ধরে ডি. কে. বাংলা প্রকাশনায় এই বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তিনি হলেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর অঙ্কিত বইয়ের প্রচ্ছদ, ইলাস্ট্রেশন পৃথক শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে আজও চিহ্নিত।

আমরা তখন এক ঝাঁক তরুণ সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন কিছু করবার চেষ্টা করছি। একের পর এক লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে চলেছি। সত্যজিৎ রায়ের প্রভাব আমাদের ওপর দারুণভাবে ছড়িয়ে পড়ল। চিনি বা না চিনি আমরা সকলেই তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লাম। তখন আমাদের বেশির ভাগেরই বয়স কুড়ির কোঠায়।

সত্যজিৎ রায়কে আমি প্রথম দেখি ডালহৌসি পাড়ার একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি. জি. কিমার-এ। বিলেতি প্রতিষ্ঠান। কলকাতার ব্যবসা বন্ধ করে তারা বিলেত পাড়ি দিচ্ছে। সেখানকার কয়েকজন তরুণ কর্মী মিলে সমবায় ভিত্তিতে সেই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করতে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের আমি চিনতাম তাঁরা হলেন—সুব্রত সেন, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত সান্যাল, সুভাষ সেন, মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন। সত্যজিৎ রায়ও এই উদ্যোক্তাদের একজন ছিলেন। নতুন কোম্পানির নাম হল ক্ল্যারিয়ন। ডি. কে. এই প্রতিষ্ঠানে থাকলেও ক্ল্যারিয়নে যোগ দেননি। যতদূর মনে পড়ছে সুব্রত সেনের ঘরেই আমি সত্যজিৎ রায়কে প্রথম দেখি। সুব্রত সেন আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। অসাধারণ গম্ভীর একজন মানুষ। স্পষ্ট মনে আছে, সত্যজিৎবাবুর পরনে ছিল পাজামা-পাঞ্জাবি আর হাতে ছিল একটি পাইপ। এই পোশাকে সত্যজিৎবাবুকে আরও অনেকবার দেখেছি। বোধহয় এই ছিল তাঁর স্বাভাবিক পোশাক। হাতে সব সময়ই পাইপ ধরা থাকত। পরিবেশ সচেতনতা বা অন্য কোনও কারণ কিনা জানি না, সকলের সামনে তাঁকে পাইপ টানতে আমি দেখিনি।

সত্যজিৎবাবুকে দেখে এবং সামান্য কথা বলে সেদিন আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। তাঁর এমন একটি ব্যক্তিত্ব ছিল যে, খুব কাছাকাছি যাওয়ার কথা তখন ভাবিনি।

তারপর এল পথের পাঁচালির যুগ। সত্যজিৎ রায় তখন 'পথের পাঁচালি' নিয়ে মেতে উঠেছেন। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে টুকরো টুকরো খবর পাই। অর্থাভাবে এগোতে পারছেন

না। আমার পরিচিত অনেকেই পথের পাঁচালির সঙ্গে সম্পর্কিত। পথের পাঁচালির সর্বজয়া করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমার খুব কাছের মানুষ। আমি যখন ছোটদের পত্রিকা 'আগামী' প্রকাশ করলাম তার প্রথম বছরেই করুণাদি সেই পত্রিকায় গল্প লিখলেন। করুণাদির কাছে আমি মাঝে-মধ্যে যেতাম। তাঁর মুখ থেকেও পথের পাঁচালি সম্পর্কে টুকিটাকি খবর পেতাম। অবশ্য বেশি খবর পেতাম আমার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু সুবীর হাজরার কাছ থেকে। সুবীর ছিল পথের পাঁচালির অন্যতম সহকারী পরিচালক। তারপর নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে পথের পাঁচালি যখন রিলিজ হল, তখন কলকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল। মনে আছে কয়েকজন বন্ধু মিলে বীণা সিনেমা হলে প্রথম 'পথের পাঁচালি' দেখেছিলাম। সেদিন সেই বিস্ময়ভরা উপলব্ধির কথা আজও ভুলতে পারি না। তারপর কতবার যে 'পথের পাঁচালি' দেখেছি! এখনও সময় পেলে দেখি।

আমরা সেই সময় কয়েকজন তরুণ মিলে পুরনো সিনেট হলে সত্যজিৎ রায়কে সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম। প্রধান উদ্যোক্তা ছিল আমার প্রিয়তম বন্ধু পূর্ণেন্দু পত্রী। বিশাল সিনেট হলে সেদিন তিল ধারণের স্থান ছিল না। এখনকার মতো তখন তো আর সহজে ক্যামেরা চলত না। সেই সভার ছবি বোধহয় কোথাও ধরা নেই। তারপর একে একে সব তো ইতিহাস। আমার নতুন করে কি আর বলবার থাকতে পারে!

দেখতে দেখতে সত্যজিৎ রায় শুধু পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। আমার বন্ধু ও পরিচিত জনদের তাঁর কাছে যাতায়াত থাকলেও আমার বিশেষ যাতায়াত ছিল না। কিন্তু একেবারে যে যাইনি তা নয়। তাঁর লেক প্লেসের বাড়িতে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। আমি তখন প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের কর্মী। আমি এবং আমার সাহিত্যিক বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সব দায়িত্বভার বহন করতাম। স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য অনেকবার সত্যজিৎবাবুর কাছে গিয়েছি। সেখানেই যা টুকটাক কথা।

তারপর ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়, সত্যজিৎবাবু ভিয়েতনামের সপক্ষে আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। সেই সময় কিছুদিন তাঁর সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় যখন 'সন্দেশ' পুনরায় প্রকাশিত হল তখন অবশ্য আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। আমার সম্পাদনায় ছোটদের পত্রিকা 'আগামী' বেশ ভালভাবেই চলছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'আগামী' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুভাষদা 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক হলেও 'আগামী'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের চিড় ধরেনি। আমারও যেমন 'সন্দেশ' কার্যালয়ে যাতায়াতে কখনও কোনও দ্বিধা হয়নি। লেনিন সরণিতে তখন ছিল সন্দেশের কার্যালয়।

সন্দেশের অনেক কর্মী যেমন অশোক ঘোষ, তপেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরাও ছিলেন আমার বিশেষ পরিচিত। সন্দেশ কার্যালয়ে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হত খুব কম। নিজের পত্রিকার কাজ থাকায় আড্ডা দেবার জন্য বেশি সময় আমি হাতে পেতাম না।

'অপুর সংসার'-এ অপু প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ছে। শরৎ ব্যানার্জী রোডের যে বাড়িতে আমি পঁচিশ বছর কাটিয়ে এসেছি তার একতলায় থাকতেন চিন্মোহন সেহানবীশ। চিন্মোহন সেহানবীশ ও তাঁর স্ত্রী উমা সেহানবীশের আমি খুব প্রিয়পাত্র ছিলাম। চিনুদা-উমাদিদের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। কখনও সখনও সত্যজিৎবাবু ওই বাড়িতে আসতেন। তখন তিনি অপুর সংসারের অপুর সন্ধান করছেন। অপু চরিত্রের জন্য চিনুদা জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক তরুণ সাংবাদিককে সত্যজিৎ রায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। চিনুদার মুখ থেকে জানতে পারলাম, জীবনকে সত্যজিৎবাবু প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবনের হল না। ইতিহাসের পরিবর্তন হল। অপু চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

'সন্দেশ' প্রকাশের সময়েই সত্যজিৎ রায় কলম ধরলেন। সৃষ্টি হল 'ফেলুদা' আর 'প্রফেসর শঙ্কু'। এত পরে কলম ধরেও এত দ্রুত কীভাবে যে বাংলা সাহিত্যকে সাড়া জাগানো যায় তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। আজও ছোটদের কাছে ফেলুদা সমান প্রিয়। প্রতিভার এমনই গুণ, পরশপাথরের মতো স্পর্শ করলেই সোনা হয়ে যায়।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। উনিশ নম্বর ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোডে আমি তখন স্থায়ী বাসিন্দা। শরৎ ব্যানার্জি রোড তখন গম গম করত। আগেই বলেছি ওই বাড়ির সামনের দিকে একতলায় থাকতেন চিন্মোহন সেহানবীশ। তিন তলার সামনে সুচিত্রা মিত্র। পিছনে আমি। আর চারতলায় ক্ষিতীশ রায়। একটু সামনে এগোলে পাঁচ নম্বর বাড়িতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পাশে শিল্পী পরিতোষ সেন, উল্টোদিকে দক্ষিণীর শুভ গুহঠাকুরতা। যে সময়টার কথা বলছি তখন সত্তর দশকের মাঝামাঝি হবে। স্থির হল মনীষা গ্রন্থালয় থেকে একটি বার্ষিক 'আগামী' প্রকাশিত হবে। মাসিক 'আগামী' অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। প্রধান সম্পাদক হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর সম্পাদক হলাম আমি। আর সেই উপলক্ষ্যে সত্যজিৎ রায়ের কাছে লেখা চাওয়া। লেখক হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের খুব নামডাক। তখন তিনি বিশপ লেফ্রয় রোডে থাকতেন।

টেলিফোনে দু-চার দিন তাগাদা দেওয়ার পর তিনি তাঁর বাসায় যেতে বললেন। গেলাম। তখন তিনি বাইরের ঘরে বসে লিখছিলেন। তাঁর লেখবার নিজস্ব একটি পদ্ধতি ছিল। দেখলাম, কোলের উপর একটি বোর্ড রেখে যেমনভাবে সবাই ছবি আঁকে তেমনভাবে তিনি লিখছেন। আমি একটু বিব্রত বোধ করলাম। লেখার মাঝে এভাবে

বিরক্ত করা খুব অন্যায়। তবে আমি তো তাঁর দেওয়া সময়েই এসেছি। বোর্ড সরিয়ে তিনি আমাকে বসতে বললেন। আমি বিনয় সহকারে লেখাটি চাইলাম।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কি করি বলুন তো! 'দেশ' পত্রিকার লেখাটাই এখনও শেষ করতে পারিনি। এদিকে আপনাকেও কথা দিয়েছি।

আমি বললাম, গল্প লিখতে খুব অসুবিধে হলে আপনি এক কাজ করুন।

তিনি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কি করব?

আমি বললাম, আপনি তো লিয়রের ছড়াগুলিকে সুন্দরভাবে বাংলা করেছেন, সেইরকম কয়েকটি ছড়া আমাকে দিন।

উনি হেসে উঠে বললেন, খুব চালাক তো আপনি! আর কয়েকটা দিন সময় দিন, আমি দেব।

আমি উঠতে চাইলে তিনি বসতে বললেন, আপনি যখন এসেছেন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আমি বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকলাম। আমার মতো নগণ্য একজন মানুষের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের কি কথা থাকতে পারে!

একটু চুপ করে থেকে সত্যজিৎবাবু বললেন, আপনি তো অনেকদিন ছোটদের পত্রিকা চালিয়েছেন, আমাকে একটু বুদ্ধি দিন না—আমি সন্দেশকে কি করলে দাঁড় করাতে পারি। নানা চেষ্টা করেও কিছুতেই দাঁড় করাতে পারছি না। আমি যা রোজগার করছি তার অনেকটাই চলে যাচ্ছে পত্রিকার পেছনে।

আমি বললাম, আমি একটু ভেবে দেখি। আমার মতামত আপনাকে নিশ্চয়ই জানাবো। আমার মনে হয় আপনাদের ব্যবস্থাপনায় খুব ত্রুটি। হিসেব করে খরচ হয় বলে মনে হয় না।

সত্যজিৎবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত। সম্পাদনা বা ছবির দিকে সাধ্যমতো দৃষ্টি দিলেও আমি ব্যবস্থাপনার দিকে তাকাতেই পারি না। সময় বা অভিজ্ঞতা কোনোটাই আমার নেই। প্রথমদিকে কত টাকা যে নষ্ট হয়েছে সে আপনাকে কি বলব!

আমি যখনকার কথা বলছি, তখন সন্দেশের কার্যালয় পূর্ণদাস রোডে।

আমি ওঁর কথা মন দিয়ে শুনছিলাম। কি বলব আমি বুঝতে পারছিলাম না। এমন বিরাট মাপের একজন মানুষের এইসব কথায় আমি কী জবাব দেব! আমি চুপ করে আছি দেখে সত্যজিৎবাবু দুম করে বলে বসলেন, আপনি 'সন্দেশ' পত্রিকায় যোগ দিন। আমার বিশ্বাস তা হলে পত্রিকাটা দাঁড়িয়ে যাবে।

এবার আমি আকাশ থেকে একেবারে মাটিতে আছড়ে পড়লাম। বাকরুদ্ধ। আমি বোবা হয়ে গেলাম। আমি কোনও জবাব দিচ্ছি না দেখে সত্যজিৎবাবু বললেন, ঠিক আছে একটু ভেবে কয়েকদিন পরে আমাকে বলুন।

আমি ছোট্ট করে জবাব দিলাম, আচ্ছা।

এর পরে সত্যজিৎবাবু আকস্মিকভাবে অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। আপনারা তো সবাই মনে করেন আমার কোনও দায়বদ্ধতা নেই।

আমি বললাম, সে কী! কে কি বলেছে আমি জানি না। কোনও কথা বলা দূরে থাক এমন ভাবনা তো আমার মনেও কোনওদিন আসেনি।

সত্যজিৎবাবু দরাজ গলায় হেসে উঠে বললেন, আপনি বলেছেন তা তো আমি বলছি না। আপনার বন্ধুরা তো বলে, সে কথা তো আর আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না!

আমি চুপ করে থাকলাম।

সত্যজিৎবাবু আবার বললেন, আমার নিশ্চয়ই একটা দায়বদ্ধতা আছে। সে দায়বদ্ধতা পরের প্রজন্মের প্রতি, আজ যারা ছোট তাদের প্রতি। সে কারণেই বেশি বয়েসে আমি কলম ধরেছি। 'সন্দেশ' পত্রিকা নিয়ে এত লড়াই করে চলেছি। আপনাকেও আমার পাশে থাকবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

তাঁর প্রতি আমার বরাবরই গভীর শ্রদ্ধা। এমন একটি কথায় নিমেষের মধ্যে সে শ্রদ্ধা শতগণ বেড়ে গেল। কতক্ষণ সেদিন সত্যজিৎবাবুর বাড়িতে ছিলাম মনে নেই। তবে দীর্ঘক্ষণ নিশ্চয়ই। আমি পুনরায় লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলাম। উনি আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

তার কয়েকদিন পরের কথা। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি আমার বাসস্থানের খুব কাছে সে কথা তো আগেই বলেছি। সুভাষদা-গীতাদি আমার খুব প্রিয়। সপ্তাহে কমপক্ষে চার-পাঁচদিন সুভাষদার বাড়ি আড্ডা মারতে যাওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এমনি একদিন সুভাষদার বাড়িতে সুভাষদার স্ত্রী গীতাদি আমাকে হাসতে হাসতে বললেন, তোমাকে একটা খবর দিতে হবে। গীতাদি অর্থাৎ গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুভাষদার মতো গীতাদিও সত্যজিৎবাবুর খুব ঘনিষ্ঠ। সত্যজিৎবাবুর ডাকনাম যে 'মানিক' সে কথা সবাই জানেন।

গীতাদি বললেন, পার্থ এসেছিল, মানিক তাকে একটা মজার খবর জিজ্ঞেস করেছে। অবশ্য তুমি তো কখনও বলনি, খবরটা ঠিক কিনা আমি জানি না। মানিক পার্থকে জিজ্ঞেস করেছে, আচ্ছা তুমি আমাকে একটা খবর দিতে পারো? প্রসূন বসুকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো, আচ্ছা সে কি সুভাষ বসুর পরিবারের ছেলে?

প্রশ্ন শুনে পার্থ অবাক হয়ে গেছে। পার্থ অর্থাৎ লেখক-সাংবাদিক পার্থ বসু। পার্থ কথাটা গীতাদিকে জিজ্ঞেস করেছে। কদিন পরে কথাটা সঠিক কিনা সে জানাবে বলে এসেছে।

গীতাদির কথা শুনে আমি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম। সত্যজিৎবাবুর মতো তীক্ষ্ণ

চোখ আমার মাঝে কি খুঁজে পেলেন ভেবে সেদিন আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। হাসতে হাসতে গীতাদিকে জবাব দিয়েছিলাম, সুভাষ বসু কেন কোনও বিশেষ পরিবারের আমি সন্তান নই। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আমি।

ভাগ্যিস সুভাষদা তখন উপস্থিত ছিলেন না। আমাকে নিয়ে কি দুষ্টুমিভরা মজা করতেন কে জানে! গীতাদি সেখানেই থামেন নি। চিনুদা-উমাদিকেও এই সংবাদ জানাতে ভোলেননি। ঘটনাটায় আমি এমন লজ্জা পেয়ে গেলাম যে সত্যজিৎবাবুর বাড়ি যাওয়া দূরে থাক চিনুদা-সুভাষদাদের বাড়িতেও ক'দিন যাইনি।

মনে মনে আমি অনেক ভেবেছিলাম। 'সন্দেশ'-এ যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আমার মন সায় দেয়নি। সত্যজিৎ রায়ের মতো মানুষের কাছে 'না' বলে আসার স্পর্ধাও আমার হয়নি।

উমাদির মাধ্যমে আমার অসুবিধার কথা সত্যজিৎবাবুকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। জানিয়েছিলাম, এমন নানাকাজে আমি জড়িয়ে আছি যে আমি একদম সময় করতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কি, সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে কাজ করতে আমি ভয় পেয়েছিলাম।

এই ঘটনার পর সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে বিশেষভাবে আমার আর দেখা হয়নি। শুধু যেদিন তিনি এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন দূর থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলাম। আজও জানি না সেদিন কাছাকাছি যেতে কেন পারিনি।

শম্ভু মিত্র

শম্ভু মিত্র চলে গেলেন।

চলে যাওয়ার আগে তিনি তাঁর মরদেহের সাময়িক সংরক্ষণ ও দাহ প্রসঙ্গে যে 'ইচ্ছাপত্র' ঘোষণা করে গেলেন তা আমাকে চমকে দিয়েছে। 'ইচ্ছাপত্র' পড়বার পর অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারিনি। নিথর পাথরের মতো চুপচাপ বসেছিলাম, হয়তো চোখের পলকও পড়েনি। ইদানীং রবীন্দ্রসদন বা অন্যত্র সাময়িকভাবে মরদেহ সংরক্ষিত রেখে যে রুচিহীন দৃশ্যের অবতারণা করা হচ্ছে, তা আমাকে পীড়া দেয়। এই ব্যবস্থাপনায় কয়েকজন পাদপ্রদীপের আলোয় আলোকিত হতে পারেন, কিন্তু এখানে খুব সুরুচির পরিচয় আছে বলে মনে হয় না। শম্ভু মিত্র চিরকালই আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই যে ইচ্ছাপত্র তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাকে শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শাঁওলী মিত্রকে ধন্যবাদ। তিনি তাঁর পিতার শেষ ইচ্ছাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। প্রচার মাধ্যমকে অবজ্ঞায় অবহেলায় দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

খুব কাছের মানুষ না হলেও শম্ভু মিত্রকে আমি দীর্ঘকাল ধরে চিনি। চল্লিশ বছরেরও বেশি। অনেককেই শম্ভুবাবুকে 'অহঙ্কারী মানুষ' হিসেবে চিহ্নিত করতে দেখেছি। আমারও শম্ভুবাবুকে বেশ অহঙ্কারী বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু এই অহঙ্কারের জন্যেই তাঁর প্রতি মানুষ হিসেবে আমার গভীর শ্রদ্ধা। আমার মনে হয়েছে, তাঁর এই অহঙ্কার তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতাকে পরিত্যাগ করার অহঙ্কার, ব্যক্তিস্বার্থে আত্মবলিদান না দেওয়ার অহঙ্কার এবং সর্বোপরি সততার অহঙ্কার।

শম্ভুবাবুকে আমি চিনি পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে। উনি তখন পার্ক সার্কাসে নাসিরুদ্দিন রোডে থাকতেন। আমিও তখন পার্কসার্কাসে থাকতাম। আমরা সেই সময় 'পার্কসার্কাস লেখক ও শিল্পী সমাজ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলি। সভাপতি ছিলেন কাজি আব্দুল ওদুদ, সম্পাদক 'রঙরুট' উপন্যাসখ্যাত বরেন বসু এবং সহকারী সম্পাদক ছিলাম আমি ও মাহমুদ আহমেদ। মাহমুদ মূল উর্দু থেকে কৃষণ চন্দরের উপন্যাস অনুবাদ করে খুব নাম কিনেছিল। আজ আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। শম্ভুবাবু আমাদের এই লেখক সমাজে নিয়মিত না হলেও প্রায়ই আসতেন। কয়েকবার আবৃত্তিও করেছেন। খুঁটিনাটি নানা প্রয়োজনে আমরা মাঝেমধ্যে ওঁর বাড়ি যেতাম। ওঁর বাড়ির প্রায় ঠিক উল্টোদিকে সাত নম্বর ওয়েস্ট রো-তে বরেন বসু থাকতেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তার শিল্পী বন্ধু নরেন্দ্রনাথ মল্লিক, স্ত্রী অমিতা মল্লিক এবং শিশুকন্যা তনু। শম্ভুবাবুর মেয়ে শাঁওলীর সঙ্গে তনু'র খুব বন্ধুত্ব ছিল। বাচ্চা শাঁওলীকে অনেকবার তনু'র সঙ্গে বরেনদার বাড়িতে দেখেছি। বরেনদার বাড়িতে আমাদের একটি জমাটি আড্ডা ছিল।

বরেনদা ছিলেন অকৃতদার। সেখানেও শম্ভুবাবু অনেকদিন এসেছেন। সেই আড্ডায় গোলাম কুদ্দুস তাঁর বিখ্যাত 'ইলা মিত্র' কবিতাটি পড়ে শোনান এবং পরবর্তীকালে শম্ভুবাবু'র কণ্ঠে সেই কবিতার আবৃত্তি তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। বরেনদা-নরেনদার মিলিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ পাবলিশার্স' দীর্ঘ সেই কবিতাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যে কয়েক হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। শম্ভুবাবু যদি দিনের পর দিন এই কবিতার আবৃত্তি না করতেন তাহলে বিপুল বিক্রি কখনোই সম্ভব হত না।

পার্ক সার্কাস ময়দানে নানারকম অনুষ্ঠান তখন লেগেই থাকত। 'শান্তি সম্মেলন', 'সংহতি সম্মেলন', এবং সর্বশেষে 'রবীন্দ্র মেলা'। যতদূর মনে পড়ছে শান্তি সম্মেলনে খোলামঞ্চে শম্ভুবাবু 'ছেঁড়াতার' মঞ্চস্থ করেছিলেন। তাঁর এবং তৃপ্তি মিত্রের সেই অনবদ্য অভিনয় আজও চোখের সামনে ভাসে। শম্ভুবাবু অভিনীত এবং পরিচালিত সব নাটকই আমি দেখেছি। কিন্তু খোলা আকাশের নীচে মুক্তমঞ্চে ছেঁড়াতারের কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি।

তারপর শম্ভুবাবুর কাছে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। প্রতিবারই সঙ্গে ছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন উনি পার্ক স্ট্রিটে একটা উঁচু বাড়ির চারতলায় থাকতেন। একা। নাসিরুদ্দিন রোড থেকে ওই বাড়িটির দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। ট্রাম ডিপোর ঠিক পিছনেই বলা যেতে পারে। দীপেন ছিল আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। দীপেনকে শম্ভুবাবু খুব শ্রদ্ধা করতেন, স্নেহও করতেন। আমরা দুজনেই তখন সাহিত্য আন্দোলনের কর্মী। নানা বিষয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য আমরা প্রধানত যেতাম। শম্ভুবাবু ব্যস্ত থাকলে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসতাম, ব্যস্ত না থাকলে দীর্ঘ সময় নানা বিষয়ে গল্প গুজব করতাম। প্রত্যক্ষ রাজনীতির উপর শম্ভুবাবুর তখন বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও কোনও অনীহা ছিল না। নানা বিষয়ে আমাদের কাছে খোলামেলা মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না। যদিও আমরা জানতাম সাধারণত শম্ভুবাবু খোলামেলা মতামত প্রকাশ করেন না। সেদিক থেকে আমরা নিজেদের খুব সৌভাগ্যবান বলে মনে করতাম।

ইতিমধ্যে সময় অনেক গড়িয়ে গেছে। শম্ভু মিত্র নিজে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। তৃপ্তি মিত্র উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। সেদিনের সেই শিশুকন্যা শাঁওলী মিত্র প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। অতীব সাধারণ মানুষ হিসেবে আমিও জনারণ্যে হারিয়ে গেছি। এই সময় শম্ভুবাবুর সঙ্গে আবার দেখা। তখন তিনি থাকেন গোলপার্কে। তাঁর সুদীর্ঘকালের বন্ধু চিন্মোহন সেহানবীশ ও আমি একই বাড়িতে বাস করি—১৯, ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোডে। চিনুদা সামনের একতলায়, আমি পিছনের তিনতলায়। বেরনোর সময় চিনুদার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। আর হাতে সময় থাকলে অল্প সময়ের জন্যে হলেও একটু আড্ডা দিতেই হবে। চিনুদা তখন কিছুটা অসুস্থ। বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদ শম্ভুবাবু প্রায়ই চিনুদার কাছে আসতেন। হাতে

কখনো চানাচুর বা বাদামের ঠোঙা। দুই বন্ধু ভাগ করে খেতেন। আমিও যে কখনো সখনো ভাগ বসাইনি তা নয়। এ অন্য এক শম্ভু মিত্র। শিশুর মতো সরল। এই শম্ভু মিত্রকে দেখা আমার জীবনে এক দুর্লভ সৌভাগ্য, সে কথা আমি বুঝি। চিনুদা প্রত্যক্ষ রাজনীতির লোক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে শম্ভুবাবুর সম্পর্কের চিড় কখনোই ধরেনি। চিনুদাকে এই প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। চিনুদা মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'শম্ভু মানুষ হিসেবে খুব ভাল।'

সত্যিই তাই। মৃত্যুমুহূর্তে প্রকৃত মানুষের মতোই আচরণ করে গেলেন শম্ভু মিত্র। নানাজন নানাভাবে ভাবছে। আর আমি ভাবছি একজন বড় মাপের মানুষের কিঞ্চিৎ সাহচর্য তো পেয়েছিলাম!

গোপাল হালদার

স্মৃতি সতত সুখের। স্মৃতি আমাদের স্বপ্ন দেখায়। জীবনের স্বপ্ন, বাঁচার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বুকে বেঁধেই আমরা বাঁচি। আমাদের কঠিন কঠোর দিনগুলিকে স্মৃতি মাঝে মাঝে উজ্জ্বল করে তোলে। এই নির্মম স্বার্থপর সময়কে দূরে সরিয়ে আমাদের কাছে নিয়ে আসে স্বপ্নভরা সেই সময়। স্মৃতিচর্চা তাই আমাদের জীবনের পাথেয়। আর সেই স্মৃতিচর্চা করতে বসে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন অসাধারণ একজন মানুষ। তিনি হলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম প্রবাদপুরুষ, লেখকের লেখক গোপাল হালদার।

গোপাল হালদারকে আমি প্রথম দেখেছিলাম পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়। প্রগতি সাহিত্য ও গণনাট্য আন্দোলনের পীঠস্থান ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে। বেশ কিছুকাল বন্ধ থাকার পর সেখানে সাহিত্য-বৈঠক আবার শুরু হয়েছে। সেইসব সাহিত্য বৈঠকে আসছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, গোপাল হালদার এবং আরও অনেকে। ছাত্র আন্দোলন ছেড়ে আমি তখন যোগ দিয়েছি প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে। যদিও বয়স আমার খুবই অল্প। বয়স কম হওয়ার সুবাদে আমি সকলেরই খুব স্নেহভাজন ছিলাম।

মনে পড়ে একদিন সমরেশ বসু জেলে বসে লেখা একটি নাটক নিয়ে আমার কাছে এলেন। কিছুদিন আগে তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। সমরেশ বসু আর আমি একই সময়ে একই জায়গা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। আমি দ্রুত সেই নাটক পড়বার আয়োজন করলাম। সেই সাহিত্য-বৈঠকে অনেকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গোপাল হালদার। সমরেশ বসুর গভীর শ্রদ্ধা ছিল গোপাল হালদারের প্রতি। তাঁর সমালোচনাকে অন্য সব সাহিত্যিকের মতো তিনিও খুব মূল্য দিতেন। অন্যদিকে সমরেশদার প্রতি ছিল গোপালদার গভীর আস্থা। গোপালদা সমরেশদাকে অতি উঁচুদরের লেখক হিসাবে মনে করতেন। তার প্রমাণ পাই সমরেশদার 'বিবর' উপন্যাস 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের পর। উপন্যাসটির শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে সাহিত্য জগতে তখন তোলপাড় চলছে। বেশির ভাগই তাঁর বিপক্ষে কিন্তু সমরেশদার পক্ষে দাঁড়ালেন গোপাল হালদার। গোপালদার তীক্ষ্ণ সমালোচনার কাছে বিরোধী পক্ষ সেদিন দাঁড়াতে পারেননি। সমরেশদা কতদিন যে এই প্রসঙ্গ আমার কাছে বলেছেন তার ঠিক নেই। কারণ এই লেখাটির প্রতি সমরেশদা ছিলেন খুবই দুর্বল। গোপালদা সেদিন তাঁর আলোচনায় বলেছিলেন, 'বিবর' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শুধু লেখায় নয় গোপালদার মুখ থেকে 'বিবর' নিয়ে আলোচনা আমি কয়েকবার শুনেছি!

কেন জানি না গোপালদাকে আমরা সকলে আমাদের অভিভাবক হিসাবে মনে

করতাম। শুধু অভিভাবক নয়। বোধহয় আমরা আমাদের 'বিবেক' হিসাবেই ভাবতাম। আর সেই অভিভাবকের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা যারা সেদিন সমরেশদার পক্ষে লড়াই করতাম তার মধ্যে মনে পড়ে যাকে আমি অনেকদিন আগে হারিয়েছি সেই প্রিয়তম বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কতবার আমি আর দীপেন কত সমস্যায় কত বিষয়ে গোপালদার কাছে গিয়েছি! গোপালদা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাও তো অনেকদিন হল। দীপেন আরও আগে চলে গিয়েছে। সমরেশদাও নেই। সুভাষদাও চলে গেলেন। তবু আমি তো আছি। তরুণ সান্যাল, দেবেশ রায় তো আছে। আমি, দীপেন, তরুণ প্রায় সমবয়সী। দেবেশ সামান্য ছোট। আজ গোপালদা নেই, আমরা যারা আছি তাদের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ নেই। কালেভদ্রে দেখা হয়। এই নিষ্ঠুর সময়ে তাই গোপালদার কথা বারবার মনে পড়ে।

কমিউনিস্ট পার্টি আইনি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই দৈনিক 'স্বাধীনতা' প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হয়। মনে আছে পার্ক স্ট্রিটে একটি প্রেসে সভা ডেকেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সভায় অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে জ্যোতি বসু ছাড়া গোপাল হালদার ছিলেন। সেই কারণে জ্যোতিবাবু অল্প কিছুদিন সম্পাদক থাকবার পর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে পত্রিকা চলে এলে গোপাল হালদার সম্পাদক হলেন। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হল ছোটদের বিভাগ 'কিশোরসভা' পরিচালনার। গোপালদার সঙ্গে প্রতিদিনই দেখা এবং আলোচনার সুযোগ এসে গেল।

নানা কারণে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য বন্ধ হয়নি প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে সাহিত্য সঙ্ঘ। তার মধ্যে একটি সাহিত্য সংগঠন তখন খুবই নাম করে—'পার্ক সার্কাস লেখক ও শিল্পী সমাজ'। সেখানকার সাহিত্যসভায় গোপালদা অনেকদিন এসেছেন, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সেই সময়ের একটি ঘটনার কথা আজ মনে পড়ছে। সেই সময়ে স্বাধীনতায় গোপালদার একটি সম্পাদকীয়র জন্য 'পয়গম' পত্রিকায় আবদুল কাদির গোপালদাকে 'হিন্দু কমিউনিস্ট' নাম দিয়ে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেন। কাদির সাহেব ছিলেন কবি এবং কাজি নজরুল ইসলামের একদা ঘনিষ্ঠ। কাদির সাহেব পার্ক সার্কাস অঞ্চলে থাকতেন আর আমাদের সাহিত্য সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আমরা কয়েকজন তরুণ মিলে তখন কাদির সাহেবকে খুবই চেপে ধরি এবং বিষয়টি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহমেদকে জানাই। কাদির সাহেব সম্পর্কে ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমেদ অর্থাৎ কাকাবাবুর জামাতা। কাকাবাবু খুবই বিব্রত বোধ করেন এবং অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আমাদের পীড়াপীড়িতে কাদির সাহেব গোপালদার কাছ দুঃখ প্রকাশ করেন। গোপালদাও কাকাবাবুর মতো খুবই বিব্রত বোধ করেন। আমাকে বলেন, আপনারা ছেলেমানুষেরা কী যে করেন! গোপালদার বিনয় ছিল দেখবার মতো। মনে মনে খুশি হলেও মুখে তা প্রকাশ করতে দেখিনি কোনওদিন। কাদির সাহেব পরবর্তীকালে

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য পত্রিকা 'মাহেনও'-এর সম্পাদক হয়ে যখন ঢাকা পাড়ি দিলেন, সেই খবর গোপালদাকে জানাতে গোপালদা তাঁর স্বাভাবিক বিনয়ে মৃদু হেসেছিলেন। কারণ কাদির সাহেব নিজেকে সাচ্চা কমিউনিস্ট বলতে খুব ভালবাসতেন। মনে পড়ে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকীতে পার্ক সার্কাসে রবীন্দ্রমেলার কথা। জীবনে মেলা অনেক দেখলাম। কিন্তু এমন মেলা আমি কখনও দেখিনি। বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এই মেলা। যে দুইজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেদিন সার্থক হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রমেলা—তার একজন চিন্মোহন সেহানবীশ আর অন্যজন গোপাল হালদার। গোপাল হালদার আর মৈত্রেয়ী দেবী ছিলেন মেলার সম্পাদক। মেলার প্রতীক এঁকে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। আমরা ছিলাম মেলার সাধারণ কর্মী। ভগ্ন শরীরে দিনের পর দিন কী কঠোর পরিশ্রম না করেছিলেন গোপালদা! অথচ হাসিমুখ ছাড়া কোনোদিন কোনোরকম বিরক্তির চিহ্ন দেখিনি। দীর্ঘায়ু হলেও গোপালদার স্বাস্থ্য কোনোদিনই ভাল ছিল না। তবু দায়িত্ব এড়াতেও দেখিনি কোনোদিন।

গোপাল হালদার দীর্ঘকাল 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। যাঁদের উদ্যোগে 'পরিচয়' পত্রিকা কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তর হাত থেকে কমিউনিস্ট পার্টির হাতে আসে গোপালদা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। গোপালদার মৃত্যুর পর 'পরিচয়' অসাধারণ 'গোপাল হালদার সংখ্যা' প্রকাশ করেছে। বিস্মৃত গোপাল হালদারকে জানতে গেলে সেই সংখ্যাটি খুবই কাজে লাগবে। গোপালদা সম্পাদক থাকার সময় নিয়মিত 'পরিচয়' কার্যালয়ে যেতাম। সেখানকার আড্ডার কথা মনে পড়লে মন আজও উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। গোপালদা নিজেও ছিলেন খুব আড্ডার ভক্ত। 'আড্ডা' নামে গোপালদার একটি বিখ্যাত বই আছে। সেই বই আজ দুষ্প্রাপ্য।

কেন্দ্রে রাজ্যসভা থাকলেও অনেক রাজ্যে বিধান পরিষদ নেই। কিন্তু আমাদের এই রাজ্যে দীর্ঘকাল বিধান-পরিষদ ছিল—এখন তা উঠে গিয়েছে। গোপালদা দীর্ঘকাল বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। গোপালদা যে সময়ে বিধান পরিষদের সদস্য সেই সময়ে পরিষদের সভাপতি ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুনীতিবাবুর মতো গোপাল হালদারও ছিলেন খ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ। পরিষদে দুই ভাষাতত্ত্ববিদের আলোচনা কখনও গম্ভীর কখনও মজার পরিবেশের সৃষ্টি করত। দুইজনের সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত মধুর। পরিষদে গোপালদার শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাব মনে রাখবার মতো। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা নিয়ে গোপালদার আলোচনা আজও পড়তে বসে বিস্মিত হয়ে যাই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনাকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করবার কথা গোপালদা বারবার বলেছেন।

গোপাল হালদারের সঙ্গে নীরদ সি. চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। উভয়েই সজনীকান্ত দাসের 'শনিবারের চিঠি' এবং সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় একসঙ্গে কাজ করেছেন। কিন্তু সমালোচনার জন্য গোপালদা যখন কলম ধরেছেন কোনো বন্ধুত্বই

সেখানে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সমালোচক হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ সৎ। তাঁর মতে যা সত্য তাকে তিনি প্রকাশ করবেনই। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে গোপালদা সমর সেন সম্পাদিত Now পত্রিকায় নীরদ চৌধুরীর 'অটোবায়োগ্রাফি অভ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান' বইটিকে তুলোধোনা করেছিলেন। সমালোচনা না বলে তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে একদিন গোপালদার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি আমার খুশির ভাব প্রকাশ করি। তীক্ষ্ণ সেই সমালোচনায় কোনো রকম অরুচিকর শব্দের ব্যবহার ছিল না। গোপালদা সেদিন আমার কাছে নীরদবাবু সম্পর্কে নানারকম কথা বলেছিলেন, যার অনেককিছুই আমি জানতাম না। জানা সম্ভব ছিল না। 'নাউ' পত্রিকার মূল্যবান সমালোচনাটি বোধহয় হারিয়ে গেছে। গোপালদার কোনও বইতে সে-লেখা আমি কখনও দেখিনি।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের দিনগুলির কথা মনে পড়ছে। ভিয়েতনামের সপক্ষে আমরা সেদিন কলকাতায় অনেক মিটিং মিছিল করেছি। কলকাতার বেশিরভাগ শিল্পী-সাহিত্যিক সেই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ভিয়েতনামের সপক্ষে লেখা হয়েছিল অসংখ্য কবিতা। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি কবিতা-সংকলন প্রকাশ করেন আর আমি করি আর একটি। বীরেনদাও ছিলেন আমার খুবই কাছের মানুষ। বীরেনদার সংকলন যেহেতু আগে বেরিয়েছিল তার থেকে আমি কয়েকটি কবিতা নিয়েছিলাম। আমার সংকলনের ভূমিকা লিখেছিলেন গোপাল হালদার। হঠাৎ সেদিন সেই সংকলনটি হাতের কাছে পাওয়ায় চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল রক্তরাঙা সেই দিনগুলি। চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল গোপালদার মুখ।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। গোপালদাকে কেন যে বিবেক মনে করতাম তারই উদাহরণ এই ঘটনা। দুষ্প্রাপ্য একটি বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আমি খুব দোটানায় পড়ে গিয়েছিলাম। বইটি বাৎস্যায়নের কামসূত্র। বাংলা হরফে মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। জয়মঙ্গলের টীকা সহ। অসাধারণ এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩১৩ সালে। সম্পাদক ছিলেন মহেশচন্দ্র পাল। কিন্তু কোথাও অনুবাদকের কোনও নাম নেই। অনুবাদকের নাম খুঁজতে খুঁজতে দেখি একেবারে বইয়ের শেষে বলা আছে কার অনুবাদ শেষ হল। সেই প্রথাই তখন ছিল। অনুবাদকেরা ছিলেন বেতনভোগী। তাঁদের নাম কখনও সামনে আসত না। আমার মনে হল অনুবাদকের নাম সমান মর্যাদায় সামনে টাইটেলে আসা উচিত। আবার ভাবতে লাগলাম দুষ্প্রাপ্য বই পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন করা উচিত কিনা। মতামত নিতে গেলাম গোপালদার কাছে। আমার মতামত শুনে গোপালদা বললেন 'আপনিই ঠিক। সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক মর্যাদা দেওয়াই কমিউনিস্টের কাজ।' আর কোনও ভাবনা থাকল না। প্রথমে অনুবাদকের নাম দিয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হল, অনুবাদকের নাম গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুবাদকের নব্বই বছরের পুত্র যে চিঠি দিয়েছিলেন সেই চিঠি

গোপালদাকে দেখাতে দারুণ খুশি হয়েছিলেন। গোপালদা সম্পর্কে কত কথাই না মনের পর্দায় ভেসে আসছে। সব কথা বলতে গেলে অনেক পৃষ্ঠা লেগে যাবে। আর দু'চারটি কথা বলে তাই থামতে বাধ্য হচ্ছি।

গোপালদার বেশির ভাগ বই এখন বাজারে পাওয়া যায় না। রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে মাত্র একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আজকের পাঠকেরা গোপালদার নামও হয়তো জানেন না। অথচ গোপাল হালদারের উপন্যাস একদিন বাংলা সাহিত্যে ঝড় তুলেছিল। গোপালদার প্রবন্ধ পড়ে কত মানুষ শিক্ষিত হতে পেরেছেন! গোপালদার গ্রন্থগুলি প্রকাশের উদ্যোগ আমারই গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে সম্ভব হয়নি।

গোপালদা সংসার জীবন শুরু করেন খুব বেশি বয়সে। গোপালদা যখন বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স ছেচল্লিশ। স্ত্রী পাটনার অধ্যাপিকা অরুণা হালদার। অরুণাদি ছিলেন অসাধারণ বিদুষী মহিলা। নিজেও অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। কাজে অবসর নেবার পর পাটনা ছেড়ে পদ্মপুকুরে সি. আই. টি. কোয়ার্টারে সংসার গড়েন অসাধারণ এই দম্পতি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই ফ্ল্যাটেই ছিলেন গোপালদা-অরুণাদি।

গণ-সংগঠনের সঙ্গে গোপালদা জড়িত ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে। দীর্ঘকাল কৃষক আন্দোলন করেছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। ফলে শরীর কোনো দিনই ভাল থাকে নি। বিজন ভট্টাচার্য'র 'নবান্ন' নাটকে গোপালদা অভিনয়ও করেছেন।

বিচিত্র জীবন গোপাল হালদারের। প্রথম যুগে স্বদেশি সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়ার পর গোপালদা থেকে যান সি. পি. আই-এ। জীবন থেকে অবসর নেওয়ার আগে রাজনীতি থেকে অবসর নেন নি।

মৃত্যুর পর গোপালদার মরদেহ রাখা হয়েছিল সি. পি. আই. কার্যালয় ভূপেশ ভবনে। শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে সেখানে অনেকদিন পর দেখা হয়েছিল সি. পি. এম-এর রাজ্য সম্পাদক ও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শৈলেন দাশগুপ্তর সঙ্গে। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শৈলেনদা এসেছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডেকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন। ছেড়ে আসা দিনগুলোর অস্তিত্ব অনুভব করলাম। মনে হয়েছিল, না, পার্টি ভাঙেনি। আমরা যেমন ছিলাম তেমনই আছি। গোপালদা, শৈলেনদা, আমি এবং আমরা। তারপর শৈলেনদাও চলে গেলেন। প্রবীণ নেতৃত্বের মধ্যে জীবিত আছেন মাত্র একজন—জ্যোতি বসু। তা তিনি তো আজ আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। নিরাপত্তা বাহিনী বেষ্টিত। অনেকদিন মাথা কুটলে দেখা মিললেও মিলতে পারে। আবার নাও পারে। জানি না, চেষ্টা করি নি। মন চায় না। কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করতে গেলেও তাঁদের সহকারীর আগাম অনুমতি নিতে হয়। কোথায় এলাম আমরা! নিজেকে বড় অসহায় লাগে আজকাল।

শিবরাম চক্রবর্তী

জীবনে কত মানুষের সঙ্গে মিশেছি ; কত লোকের সান্নিধ্যে এসেছি ; কিন্তু এক-একজন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আজও আমাকে সতেজ করে রেখেছে। তাঁদেরই একজন হলেন শিবরাম চক্রবর্তী। তাঁকে দেখবার বা কাছাকাছি আসবার অনেক আগে থেকেই অর্থাৎ ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন আমার একান্ত আপন। হর্ষবর্ধন, গোবর্ধন, পঞ্চানন, বিনু, ডালুমাসি আরও কতজন তো আমার পরিচিত। তাঁদের সব কাণ্ডকারখানা পড়তে পড়তেই তো আমি বড় হয়েছি। এঁরা সকলেই শিবরাম চক্রবর্তীর সৃষ্ট চরিত্র। দেশে বিদেশে ঘরে বা বাইরে যেখানে বাঙালিরা আড্ডায় সমবেত হয়, সেখানে কোনো না কোনো সময়ে ঘুরে-ফিরে শিবরাম আসবেনই। আর তাঁর উপস্থিতি মানেই জীবনটাকে হালকা করে দেওয়া। মজায় মশগুল হওয়া। তপ্ত বাতাসকে শীতল করে দেওয়া। এমন আড্ডা, এমন পরিবেশ আজ হয়তো সেরকম নেই। আড্ডার সুযোগই বা কোথায়! সাহিত্যের সেই আড্ডা আজ কী আর আছে! অথচ এমনই এক আড্ডার আসরে প্রথম আমি শিবরাম চক্রবর্তীকে দেখি এবং পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই অতি কাছের মানুষে পরিণত হই। তিনিও হয়ে যান যেন আমার চিরকালের চিরদিনের চেনা।

শিবরাম চক্রবর্তী কোঁচা খোলা ধুতি, সিল্কের পুরো হাতা শার্ট বা পাঞ্জাবি পরতেই ভালবাসতেন। অন্য কোনও পোশাকে তাঁকে আমি কখনো দেখিনি। বেশিরভাগ সময়ে হাতে থাকত চানাচুর বা ডালমুটের ঠোঙা—খেতেন কম, বিলোতেন বেশি।

১৯৫২ সালে আমি ছোটদের পত্রিকা 'আগামী' প্রকাশ করি। সেই পত্রিকাকে ঘিরে গড়ে ওঠে তরুণ ও প্রবীণ লেখকদের একটি জমাটি আড্ডা। এই আড্ডা আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে যখন আমরা বইপাড়ার কাছাকাছি পটুয়াটোলা লেনে নতুন কার্যালয় গড়তে পারি। পটুয়াটোলা লেনের সেই আড্ডায় তখনকার দিনের নামী লেখকেরা অনেকেই আসতেন। তখনকার তরুণ, যাঁরা এখন অনেকেই নামী তাঁরা তো থাকতেনই; সেই আড্ডায় নিয়মিত ভাবে আসতেন শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ধীরেন্দ্রলাল ধর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শিল্পী শৈল চক্রবর্তী, রেবতীভূষণ ও আরও অনেকে। এঁদের সকলের তুলনায় আমি তখন বয়সে অনেক ছোট। তবু এমনভাবে তাঁরা আড্ডা দিতেন এবং অবলীলাক্রমে এমন সব শব্দ ব্যবহার করতেন যাতে আমার লজ্জা পেয়ে উঠে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। এঁদের মুখ থেকে বাংলা সাহিত্য জগতের কত কথা না জেনেছি!

শিবরাম চক্রবর্তী ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ। নিজের কথা তাঁর মুখ থেকে জানা ছিল অসম্ভব। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ তাঁর আত্মজীবনী 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা' এবং 'ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন তিনি সকলের

কথাই বলেছেন, কেবল নিজের কথা ছাড়া। নিজের কথা বাধ্য হয়ে ততটুকুই বলেছেন যতটুকু না বললে অন্যের কথা বলা যায় না। তাঁর সামনে তাঁর লেখার প্রশংসা করতে গেলেই তিনি অন্য লেখককে টেনে এনে তাঁকেই বড় লেখক হিসেবে প্রতিপন্ন করবেনই। নিজের সম্পর্কে এমন নির্লিপ্ত মানুষ বোধহয় পৃথিবীতে মেলে না। জীবনটা যেন তাঁর কাছে ছিল একটি খেলা। কোনও দুঃখ নেই, কোনও বিষণ্নতা নেই, কোনও ব্যথা নেই, কোনও বেদনা নেই—সব কিছুই যেন মজা ; জীবনটা যেন মজা। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ভাবি এই উপলব্ধি কিছুটাও যদি গ্রহণ করতে পারতাম তাহলে জীবন হয়ে উঠত অনেক নির্মোহ, অনেক মধুময়।

একদিনের একটা ঘটনার কথা বলি। 'আগামী' কার্যালয়ে আমি আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ সুভাষদা বসে গল্প করছি। সুভাষদা 'আগামী' পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই সম্পর্কিত। নিয়মিতভাবে লেখেন। হঠাৎ ঝড়ের মতো সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এলেন। তখন তাঁর অনেক বয়স। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা। গায়ে হাফশার্ট। এলেন আমাকে একটি গল্প দিতে। সুভাষদার খুবই পরিচিত। সুভাষদার কিছু পারিবারিক খবরাখবর নিয়ে তিনি চলে গেলেন। এসে গেলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। কোঁচা ঝুলিয়ে ধুতি পরা, গায়ে ঢোলা সাদা পাঞ্জাবি, চোখে চশমা। খগেনদা ছিলেন প্রায় ছ'ফুট মতো লম্বা। আমার অতি কাছের মানুষদের একজন। খগেনদার মনের মধ্যে একটি ধারণা গাঁথা ছিল। ধারণাটি হল, শিশুসাহিত্যিকদের কোনও মর্যাদা নেই। হয়তো সত্যি! কারণ এধরনের কথা যাঁরা আজ কেবলমাত্র শিশুসাহিত্য চর্চা করেন তাঁদের মুখেও আমি অহরহ শুনে থাকি। যে সময়ের কথা আমি বলছি অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তখনও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের খুব নামডাক। কবি তো বটেই, গদ্যকার হিসাবেও। সুভাষদাকে দেখতে পেয়ে খগেনদার মনের ক্ষোভ কিছুটা প্রকাশিত হল। সুভাষদাকে ঠেস দিয়ে খগেনদা বললেন, অবশ্য আমার দিকে তাকিয়ে, আমাদের দিয়ে লিখিয়ে তোমার আর কি হবে বলো! সুভাষবাবুকে দিয়ে লেখাও। যত লেখাবে ততই তোমার পত্রিকার নামডাক হবে। আমরা কী আর লেখক বলো!

আমার খুব খারাপ লাগল। বললাম, খগেনদা কি যে বলেন! আড়চোখে দেখলাম সুভাষদার চোখেমুখে বিরক্তির স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে। আমার কথায় কোনও কাজ হল না। খগেনদা মিটিমিটি হাসতে হাসতে আবার একই কথা বলতে লাগলেন। কি করে যে খগেনদাকে থামাব আমি বুঝতে পারছি না।

এমন সময় চানাচুরের ঠোঙা হাতে ঢুকলেন শিবরাম চক্রবর্তী। ঘরের থমথমে আবহাওয়া দেখে উনি সুভাষদার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে বলে উঠলেন, কি হল, তোমার কোনও প্রিয়জন বিয়োগ হয়েছে না কি?

কোনও কথা না বলে শিবরামদাকে আমি বসার চেয়ার এগিয়ে দিলাম। খগেনদা তখনও থামলেন না। শিবরামদাকে সাক্ষী করে বললেন, আপনিই বলুন আমি ঠিক কি

না! আমি কি কোনও ভুল বলেছি? আমি বলছি, আমরা কি আর লেখক? লেখক হলেন সুভাষবাবু।

বিরক্ত হয়ে সুভাষদা উঠে পড়তেই শিবরামদা হাত ধরে বসালেন। তখন শুরু হল শিবরামদার কথা। নিমেষের মধ্যে ঘরের আবহাওয়া পালটে গেল। তাঁর সেই চিরপরিচিত হাসি হাসি মুখে শিবরামদা বলতে লাগলেন, ঠিকই বলেছেন খগেনবাবু। সত্যিই তো, আমি, আপনি কি আর লেখক? আমি আপনি কি আর গদ্য লিখতে পারি? গদ্য লেখেন সুভাষবাবু। উনি হলেন লেখকের মতো লেখক। আমি আপনি হলাম খুঁটে খুঁটে ঘাস খাওয়া ছাগল ছাড়া কিছু না। এইরকম আরও অনেক কিছু।

খগেনদাকে একা না বলে সবসময় নিজেকে জড়িয়ে নিচ্ছিলেন। দেখতে পেলাম লজ্জায় সুভাষদার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আর খগেনদার হাসি হাসি মুখে ফুঠে উঠেছে বিরক্তির ছাপ। হাসিতে আমার পেট ফেটে যাওয়ার জোগাড়। হাসি চাপতে আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম। ফিরে আসতে আসতেই আর কোনও কথা না বলে খগেনদা চলে গেলেন। তখন জমে উঠল আমাদের তিনজনের নির্ভেজাল আড্ডা।

অন্য সব লেখকের চেয়ে শিবরাম চক্রবর্তী ছিলেন একেবারে অন্যরকম। খোলামেলা জীবন। কোনওরকম ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। যা ভাবতেন তাই বলতেন। নিজের প্রশংসা কখনই শুনতে চাইতেন না। কোনও লেখার প্রশংসা করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গেই অন্য লেখকের প্রশংসা শুরু করতেন। এদিনও তিনি সেই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে অনেক বড় মাপের কবি ও গদ্যশিল্পী এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। খগেনদাকে খাটো করবার কোনও মানসিকতাই তাঁর ছিল না। অন্য আরেকদিন আমাদের এই আড্ডাতেই খগেনদাকে তিনি এমন প্রশংসা করেছিলেন যে সুভাষদার মতো লজ্জায় খগেনদারও চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

তিনি যে কত বড় মাপের লেখক সেকথা আমার বলবার প্রয়োজন নেই। যদিও তাঁকে নিয়ে লেখালেখি হয়েছে খুবই কম। অন্য অনেক লেখককে নিয়ে অনেকে গবেষণা করে ডিগ্রি লাভ করেছেন দেখেছি। তাঁকে নিয়ে কোনও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানি না। ইদানীং দু'একজনের গবেষণার কথা জেনেছি। দু'জন গবেষক তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের গবেষণা বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলাফল জানি না। সত্যই শিবরাম চক্রবর্তী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা বড় কঠিন। যেমন নির্লিপ্ত, নির্মোহ ছিল তাঁর জীবন, তেমনি ভাবে হারিয়ে গেছে তাঁর অনেক রচনা। লিখেই এবং সামান্য সম্মান-দক্ষিণা পেয়ে তাঁর দায়িত্ব শেষ। তারপর লেখাটি যে কোথায় গেল সে ব্যাপারে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। বই প্রকাশের সময় প্রকাশকদেরই লেখাগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছে। তারপর শৈল চক্রবর্তী বা রেবতীভূষণের ছবিতে সেইসব বইগুলি পাঠকের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছে। অধিকাংশ বইয়েরই আজ

আর সন্ধান মেলে না। রচনাবলী প্রকাশ করতে গিয়ে একথা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

রচনাবলী প্রকাশের ব্যাপারটা এখানে একটু বলে নিই। পঞ্চাশের দশকের একেবারে শেষভাগে নিয়মিতভাবে 'আগামী' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে শিবরামদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিছুটা ক্ষীণ হয়ে আসে। মাঝে মধ্যে পটুয়াটোলা লেনে তিনি আমার কাছে আসতেন। বিনা কারণে। ওখানে আমি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে একটি ছোট ছাপাখানা শুরু করেছি। অনেক লিটল ম্যাগাজিন সেখান থেকে প্রকাশিত হয়। আড্ডা ঠিক চলছে। চরিত্রটা একটু অন্যরকম। তরুণ লেখকদেরই ভিড় বেশি। তবে শিবরামদা আকস্মিকভাবে যেদিন এসে হাজির হতেন সমস্ত আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতেন একমাত্র তিনি। সেই আড্ডার অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন কমলকুমার মজুমদার। কমলদা তখন সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।

সত্তরের দশকের শেষভাগে জীবিকা হিসেবে আমি প্রকাশনাকে বেছে নিই। প্রকাশনা ব্যবসার কথা আগে কখনও ভাবিনি। ছোট ছাপাখানাটি হয়েছিল নিয়মিতভাবে 'আগামী' প্রকাশের জন্য। অথচ আমার স্বপ্নের সেই 'আগামী' বন্ধ হয়ে গেল। পুনরায় 'আগামী' প্রকাশের জন্য আমাকে যাঁরা অহরহ চাপ দিচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে শিবরামদা অন্যতম।

যাহোক, প্রকাশনা শুরু করবার কিছুকালের মধ্যে শিবরামদার সকল রচনাকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ একটি রচনাবলী প্রকাশের বাসনা আমার মনের মধ্যে জাগতে থাকে। প্রথম জীবনের তাঁর সিরিয়াস সব লেখা 'ওরা কাজ করে', 'চাকার নিচে', 'ছেলেবয়সে', 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' বা বড়দের মজার লেখা 'স্ত্রী মানে ইস্ত্রী', 'মনের মতো বউ', 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি একমাত্র বসুমতী সংস্করণ ছাড়া পূর্বে প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাঁর জীবিত অবস্থাতে তাঁর পাতানো ভাগনে গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে তিনি একটি বইয়ের দোকান খুলিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে। সেই ঋণের টাকা পরিশোধ নিয়ে পরবর্তীকালে ঝামেলা হয়েছে অনেক। দোকানটির নাম দিয়েছিলেন 'শিবরাম চক্রবর্তীর বইয়ের দোকান'। সেখান থেকেই শুধুমাত্র ছোটদের লেখা নিয়ে পাঁচখণ্ডে প্রকাশিত হয় 'শিব্রাম রচনাবলী'। কিছুকাল পরে বোধহয় তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই সেই দোকান বা প্রকাশনা উঠে যায়।

আগেই উল্লেখ করেছি বড়দের রচনা নিয়ে বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে বেশির ভাগ সিরিয়াস লেখার সংগ্রহে তাঁর প্রথম রচনাবলী প্রকাশিত হয়। অন্য অনেক রচনাবলীর মতো পরবর্তীকালে তাঁর সেই রচনাবলীও হারিয়ে যায়। সেই কারণেই আমি ভেবেছিলাম তাঁর ভিন্ন জাতের, ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন রূপের, ভিন্ন রসের লেখাগুলিকে একত্রিত করে প্রকাশ করব একটি পূর্ণাঙ্গ রচনাবলী। কিন্তু কাজ শুরু করতেই দেখলাম বাধা অনেক। শিবরামদা তখন এই পৃথিবীতে নেই। থাকলে আমাকে কোনও বাধার

সম্মুখীন হতে হত না—এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ভাবনাটা আর দু'চার বছর আগে যদি আমার মাথায় আসত তাহলে কোনও ঝামেলাই আমাকে পোয়াতে হত না। একেবারে যে মাথায় আসেনি তা নয়, তবু মনের মাঝে একটা কিন্তু ছিল। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই সাক্ষরতা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল শিব্রাম রচনাবলী। মহাজাতি সদনে প্রথম খণ্ডের সেই প্রকাশানুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। মঞ্চে শিবরামদাকে দেখে আমার খুবই কষ্ট হয়েছিল। শরীর তখন তাঁর খুবই খারাপ। ধরে ধরে মঞ্চে এনে বসাতে হয়েছে। সাক্ষরতা প্রকাশনের কর্তা-ব্যক্তিরা ছিলেন আমার খুব কাছের মানুষ। এই কারণেই শিবরামদাকে আমি কিছু বলতে পারিনি। এই রচনাবলীতেও বড়দের লেখা বিশেষ কিছু ছিল না। রচনাবলী শেষ হওয়ার আগেই শিবরামদা পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। কিছুকাল পরে সাক্ষরতা প্রকাশন উঠে যায়। সাক্ষরতা প্রকাশন ছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির প্রকাশন বিভাগ।

আমরা সকলেই জানি বা 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা তো জানেনই শিবরাম চক্রবর্তীরা ছিলেন দুই ভাই। শিবরাম আর শিবসত্য। দু'জনের মাঝে বয়সের খুব বেশি তফাত ছিল না। স্বভাবে দু'জনেই ছিলেন একরকম। নিজেদের জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন।

শিবসত্যবাবু থাকতেন ঘাটশিলায়। শিক্ষকতা করতেন সেখানকার একমাত্র বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয় জগদীশ বিদ্যাপীঠে। শিবরামদা বেঁচে থাকতে নিয়মিতভাবে তাঁর বিশ্রামের জায়গা ছিল প্রিয় ভাইয়ের আস্তানা ঘাটশিলা। একথা সকলেরই জানা যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ জীবন কেটেছিল ঘাটশিলায় এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর কয়েকবছর পর ঘাটশিলায় গড়ে ওঠে বিভূতি স্মৃতি সংসদ এবং আশির দশকের মাঝামাঝি সেই সংসদের সঙ্গে আমি ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়ি। সেখান থেকেই আমার শিবসত্যবাবুর সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা।

শিবসত্যবাবুর কাছে শিব্রামের পূর্ণাঙ্গ রচনাবলী প্রকাশের প্রস্তাব পেশ করি। শিবসত্যবাবু সানন্দে অনুমতি দান করেন এবং সেইমতো চুক্তি সম্পাদন করেন। কলকাতায় ফিরে আসবার পর আমার সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা সাক্ষাৎ করেন। প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী। তাঁরা দাবি করেন শিবরাম চক্রবর্তীর রচনাবলীর তাঁরা হলেন অর্ধেক স্বত্বাধিকারী। আমি কোনও বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে তাঁকেও কিছু অগ্রিম প্রদান করি। উদ্দেশ্য ছিল নির্বিঘ্নে প্রস্তাবিত এই রচনাবলী প্রকাশ করা। প্রথম খণ্ড প্রকাশের মুখেই আমাকে কোর্ট থেকে তলব করা হয় এবং তার দু'একদিনের মধ্যেই শিবসত্যবাবুর একটি চিঠি পাই। সিটি সিভিল কোর্টে চলছিল শিবরাম চক্রবর্তীর উইলের প্রবেটের মামলা। নিজের অজান্তেই আমি এই মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। ঘাটশিলায় গিয়ে শিবসত্যবাবুর সঙ্গে আমার বিশদ আলোচনা হল।

শিবসত্যবাবু গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বীকার করতে কিছুতেই সম্মত নন। তাঁর একটিই কথা, আমার কোনও বোনই ছিল না, তা ভাগনে আসবে কোথা থেকে! অকাট্য যুক্তি। এই যুক্তিকে খণ্ডন করা অসম্ভব।

এই ভাগনে প্রসঙ্গে একটু বলি। শিবরাম চক্রবর্তীর মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বিখ্যাত সেই মেস বাড়িটির বিপরীত দিকে গোপালবাবুরা বাস করতেন। গোপালবাবুর মাকে শিবরামবাবু দিদি বলে ডাকতেন এবং নিজের দিদির মতোই শ্রদ্ধা করতেন। সেই কারণেই রক্তের সম্পর্ক থাকুক আর না থাকুক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে গেলেন শিবরামবাবুর ভাগনে। গোপালবাবুকে শিবরামবাবু অসম্ভব স্নেহ করতেন এবং তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। গোপালবাবু ছিলেন বাউণ্ডুলে স্বভাবের। শিবসত্যবাবুর গোপালবাবুর প্রতি উষ্মার এইটিই প্রধান কারণ। গোপালবাবুর এই স্বভাবের জন্য পরবর্তী কালে তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে খুবই কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছে। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আর পৃথিবীতে নেই। সেদিনের তাঁদের সেই শিশুপুত্র জয়দীপ এখন সবকিছু দেখাশুনা করে। আমি তাঁকে নিজের ছেলের মতো স্নেহ করি।

থাক, উইলের কথাটা এবার বলি। শিবরাম চক্রবর্তীর অন্য অনেক মজার কাণ্ডের মধ্যে এই উইলও অন্যতম। যখনই কাউকে তাঁর খুব ভাল লাগত তাঁকেই তিনি তাঁর সম্পত্তি দান করে দিতেন। সম্পত্তি বলতে এই লেখার স্বত্ব। এরকম একটি উইল যে তিনি করেছেন কে জানে! কিন্তু সর্বশেষ এই উইলটির প্রবেট নিয়ে মামলা। আর সেই মামলায় আমি জড়িয়ে পড়লাম। এই উইলের দু'জন প্রধান সাক্ষী ছিলেন, সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশক সুপ্রিয় সরকার। সুপ্রিয়দা বাংলা প্রকাশনা জগতে খুবই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি—এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌সের কর্ণধার। এই ঘটনার কিছুদিন আগেই ভবানীবাবু পরলোকগমন করেছেন, ফলে সুপ্রিয়দাই একমাত্র জীবিত সাক্ষী। তাঁর সাক্ষ্যের ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করছে। গোপালবাবুর আইনজীবী এই কথা বুঝতে পেরে আমাকে এই মামলায় ভালভাবে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই আইনজীবী শ্রীযুক্ত ঘটকের সঙ্গে পরবর্তীকালে আমার খুবই সুসম্পর্ক হয় এবং তাঁর মুখ থেকে একথাটা শুনি। তিনি বলেন, আপনাকে জড়াতে না পারলে শিবসত্যবাবুর মতামতের কোনও পরিবর্তন আমি করাতে পারতাম না। উইলের প্রবেটও কোনওকালে হত না। তিনি আরও বললেন, প্রীতি ও তাঁর শিশুপুত্রটিকে দেখেই আমি বিনা পারিশ্রমিকে এই কাজ করেছি। নাহলে ওরা অনাহারে মরে যেত। শিবসত্যবাবু নির্লোভ ব্যক্তি। কিন্তু গোপালকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। তাঁব দৃঢ় বিশ্বাস শেষজীবনে গোপালের জন্যই তাঁর দাদাকে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।

সুপ্রিয়দার কাছে বিষয়টি আমি খুলে বললাম। সুপ্রিয়দা আমাকে বলেন এই উইল

একশোভাগ সত্যি। শিবরামবাবু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অসুস্থ অবস্থায় এই উইল করেছেন, আমাদের সাক্ষী করেছেন, রেজিস্ট্রিও করেছেন। তুমি শিবসত্যবাবুকে বোঝাও। সুপ্রিয়দা ছিলেন খুবই বৈষয়িক লোক। কিন্তু মানুষ হিসেবে অসাধারণ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোগ করে দিলেন, এই সময়ে তোমার চুক্তিটিও পাকাপোক্ত করে নিয়ো।

আমি ঘাটশিলায় চলে গিয়ে শিবসত্যবাবুকে সব কথা খুলে বললাম। শিবসত্যবাবুর তখন প্রায় একানব্বই বৎসর বয়স। শরীরও খুব খারাপ। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই শিবরাম চক্রবর্তীর সব রচনা সঠিকভাবে প্রকাশিত হোক তিনি মনেপ্রাণে চাইছিলেন এবং প্রকাশের এই কাজ আনন্দ পাবলিশার্স অথবা আমার প্রতিষ্ঠান নবপত্র প্রকাশন করুক এইটাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কপিরাইটের এই ঝামেলার জন্য আনন্দ পাবলিশার্স এর ভিতরে ঢুকতে চাইছিল না। অথচ আমরা যারা সাহিত্য জগতের আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করি তারা সকলেই জানি শিবরামবাবুর শেষ জীবনে তাঁকে দেখাশুনা করবার সব দায়িত্বভারই নিয়েছিল আনন্দবাজার ও আনন্দ পাবলিশার্স। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা'।

কেন জানি না আমার প্রতি শিবসত্যবাবুর গভীর আস্থা ছিল। তাঁকে সম্মত করাতে আমার বিশেষ কোনও অসুবিধা হয়নি। স্থির হয়, কোর্টের দিনক্ষণ স্থির হলে তিনি কলকাতায় এসে তাঁর সম্মতি জানাবেন এবং সাক্ষী হিসেবে সুপ্রিয়দাও উইলের পক্ষে তাঁর অভিমত জানাবেন। কলকাতায় ফিরে ঘটকবাবুকে সব কথা জানাতে তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং কাগজপত্র তৈরির কাজ শুরু হয়। এটাও স্থির হয় প্রকাশক হিসেবে আমার সঙ্গে যে চুক্তিপত্র হবে তাতে কপিরাইট হোল্ডার হিসেবে শিবসত্য চক্রবর্তী এবং গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই স্বাক্ষর করবেন। সেই স্বাক্ষর হবে প্রবেটের পরদিন।

সবই ঠিকঠাক হয়েছিল। এর কিছুকাল পরেই শিবসত্যবাবু পৃথিবী ত্যাগ করলেন। পূর্ণাঙ্গ রচনাবলী শিব্রাম অমনিবাসের কয়েক খণ্ড তিনি দেখে গিয়েছিলেন। তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন যখন জানতে পেরেছিলেন আনন্দ পাবলিশার্স আমাকে পূর্ণভাবে সহযোগিতা করছে। একথা আজ বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে আনন্দ পাবলিশার্সের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই অমনিবাস আমি কখনো প্রকাশ করতে পারতাম না। 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা' প্রকাশ করার অনুমতি তাঁরা আমাকে দিয়েছিলেন। 'ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' যা গ্রন্থাকারে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি, শিবরামদার নিজ-হাতে সংশোধিত সেই কপিও আমাকে দিয়েছিলেন আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসু। তাঁদের কাছে এই ঋণ আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

রচনাবলী প্রকাশ করতে গিয়ে এমন অনেক রচনার সন্ধান আমি পেয়েছি, অতীতে যার কথা বিশেষ কেউই জানত না। আর সেই সন্ধান আমাকে দিয়েছেন শিবরাম

চক্রবর্তীর অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠক। মনে হয় অনেক লেখাই আমি এখনও উদ্ধার করতে পারিনি। চেষ্টার কোনও ত্রুটি করছি না এটুকুই মাত্র বলতে পারি। শিবরাম চক্রবর্তীর ওপর গবেষণার জন্য যাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তাঁদেরও আমি এই অনুসন্ধানের অনুরোধ জানিয়েছি। দেখা যাক কী হয়!

শিবরাম চক্রবর্তীর ছোটদের লেখার সঙ্গে বেশিরভাগ পাঠক পরিচিত। হর্ষবর্ধন, গোবর্ধনের নাম বাঙালি ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে ঘোরে। শব্দের উপর শব্দ সাজানোয় তাঁর সেই অসাধারণ মুন্সিয়ানা আজ আর আমরা দেখতে পাই না। শিবরাম চক্রবর্তী বোধহয় একজনই। বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো লেখক আর হবে কিনা বলা বড় কঠিন। জানি না, বাঘা বাঘা সমালোচকেরাই বলতে পারবেন।

তাঁর 'মানুষ' ও 'চুম্বন' কাব্যগ্রন্থ দুটি আজ বিস্মৃত। তিনি যে তখনকার দিনে অর্থাৎ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থাতে এইসব আধুনিক কবিতা রচনা করেছিলেন সেকথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কবি হিসেবে শিবরাম চক্রবর্তীর স্বীকৃতি কোথাও দেখি না। দুর্ভাগ্য বাংলা কাব্য সাহিত্য জগতের।

'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' গ্রন্থের কথাও কি আমরা ভাবতে পারি? এমন সমাজবাদী ভাবনা তিনি পেলেন কোথা থেকে? তিনি তো কখনও মার্কসবাদী ছিলেন না। একসময় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহমেদের সঙ্গেও তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। মুজফফর আহমেদেরও আমি ছিলাম কাছের মানুষ। তাঁকে আমরা সকলে 'কাকাবাবু' বলে ডাকতাম। কাকাবাবুর কাছ থেকেও শিবরামদা সম্পর্কে আমি অনেক কথা জানতে পারি। শিবরামদাকে আমি সেকথা বলেওছি। কাকাবাবুর প্রতি শিবরামদা ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। আজ মনে হয়, কাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্যই কি তাঁকে এই সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল? কোনও গবেষক যদি তাঁর রাজনৈতিক দিকটায় একটু দৃষ্টিপাত করেন তাহলে বাংলার সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে খুবই উপকার হবে।

বলতে বসেছিলাম শিবরাম চক্রবর্তীর কথা। বলে বসলাম অন্য অনেকের কথা। শিবরাম চক্রবর্তীর মতো শিবসত্যবাবুর কথা আমার খুব বেশি মনে পড়ে। শিবসত্যবাবুকে দেখলে বা তাঁর সঙ্গে মিশলে শিবরামদার চরিত্র বুঝতে কোনও অসুবিধা হত না। দুজনেরই সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই জানেন দুজনেই যেন একই ধাতুতে গড়া। স্বার্থপর এই পৃথিবীতে সত্যিই এমন ধরনের নিঃস্বার্থ মানুষ বিরল। ঘাটশিলায় শিবসত্যবাবুর শেষজীবন কেটেছে দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ও এঁদের কেউ নন। পাতানো সম্পর্ক। অসাধারণ সুন্দরী, বিদুষী, নম্র এই মহিলাই শিবসত্যবাবুকে শেষজীবনে দেখাশুনা করেছেন। ভদ্রমহিলা নিজেও ছিলেন অসুস্থ। তবুও শিবসত্যবাবুর যত্নের কোনো ত্রুটি কখনও করতে দেননি।

শিবরাম চক্রবর্তীর উইলেও এই দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ আছে। সেকথা

আমি বলতে ভুলে গেছি। উইলে বলা আছে, অর্ধেক স্বত্ব তাঁর একমাত্র ভাই শিবসত্য চক্রবর্তী আর বাকি অর্ধেক স্বত্ব গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শিবসত্যবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর এই অর্ধেক স্বত্ব পাবেন দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা জানতেনই না। শিবসত্যবাবুও ভাল করে জানতেন বলে আমার মনে হয়নি। দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেদিন আমি উইলের সংবাদ দিই তখন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বলেছিলেন, আমার কোনও স্বত্বের দরকার নেই। শিবসত্যবাবু বেঁচে থাকুন, এইটিই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

তাঁর সেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়নি। শিবসত্যবাবু আগেই চলে গেলেন। দেখতে দেখতে সেও তো কত বছর হয়ে গেল! সময় কী দ্রুত গড়িয়ে যায়!

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় কলকাতা শহর যখন উত্তাল, প্রতিদিন মিটিং-মিছিলে মুখরিত হয়ে উঠছে এই মহানগরী তখন একদিন দুপুরে আমার পটুয়াটোলা লেনের আস্তানায় এলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গেরুয়া পাঞ্জাবি আর মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা। এই ছিল সুভাষদার স্বাভাবিক পোশাক। পটুয়াটোলা লেনে তখন আমি একটি ছোট ছাপাখানা চালাই। তখনকার দিনে বামপন্থী নানা সংগঠনের নানা জাতীয় প্রচারপত্র ও পুস্তিকা নিয়মিতভাবে ছাপা হত এই ছাপাখানায়। একদিকে বামপন্থী রাজনীতির প্রচারপত্র আর অন্যদিকে অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন মুদ্রিত হত এই ছাপাখানাতে। তাই জমে উঠত রাজনৈতিক কর্মী ও সাহিত্যিকদের জমাটি আড্ডা। সে আড্ডায় সুভাষদাও বেশিরভাগ দিন থাকতেন। সেদিন অবশ্য তিনি যখন এলেন, তখন অন্য কেউ ছিলেন না। স্টুডেন্টস হলে ভিয়েতনামের সপক্ষে একটি সভা ছিল। সভায় পড়বার জন্যে সুভাষদা একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি আমাকে শোনালেন। তার প্রথম লাইন ছিল 'আমার ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না'। সুভাষদার মৃত্যুর পর তাঁকে ঘিরে যেসব বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটল, তাতে আমার বারবার সুভাষদার এই কবিতার লাইনটি মনে পড়ল। মনে হচ্ছে তাঁর মুখ থেকেই শুনছি, আমার ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না।

ভাল লাগবার কথাও নয়।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পঞ্চাশ বছরেরও বেশি দিনের সম্পর্ক। তাঁকে আমি প্রথম দেখি ১৯৪৯ সালে মার্চ মাসে দমদম সেন্ট্রাল জেলে। তাও আবার ফুটবল খেলার মাঠে। সুভাষদা ফুটবল খেলতে খুব ভালবাসতেন। এবং সুযোগ পেলেই খেলতেন। দমদম জেলে অফুরন্ত সময়, তাই বিকালে ফুটবল খেলাতেই সুভাষদার মন বেশি। সেদিন তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর আজীবনের বন্ধু জলিমোহন কল। জলিদাকেও আমি সেই প্রথম দেখি। জলিদা কাশ্মীরের ছেলে। প্রথম জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং সুভাষদার সহপাঠী। জলিদা পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতা হয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সংঘর্ষের পর তিক্ততায় তিনি যখন পার্টি ছাড়েন, তখন ছিলেন জেলা কমিটির সম্পাদক। পরবর্তীকালে জলিদা জনসংযোগ বিভাগে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। জলিদার সঙ্গে বিবাহ হয় এককালের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন-এর। মণিদি দীর্ঘকাল বিধায়ক ছিলেন। অসাধারণ বাংলায় তাঁর বক্তৃতা বিরোধীদেরও মুগ্ধ করে দিত। মণিদি তাঁব যে আত্মকাহিনি 'সেদিনের কথা' লিখেছিলেন তা আজও বাঙালি পাঠকের কাছে মর্যাদা পেয়ে আসছে।

বইটি শেষ করবার পর মণিদি আমার হাতে প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপিটি তুলে দিয়েছিলেন। যাঁরাই মহিলা আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের দেখি আগ্রহভাবে মণিদির বইটি সংগ্রহ করতে। মণিদি আজ আর এই পৃথিবীতে নেই। কিন্তু জলিদা আছেন। সুভাষদার চলে যাওয়ার শেষ সময় দেখেছিলাম জলিদা চুপচাপ তাঁর প্রিয় বন্ধুর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বিরোধী বিপ্লবীর দল তাঁকে ঠেলে সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। জলিদাকে তারা নিশ্চয়ই চেনেন না। সত্যিকারের সাচ্চা মানুষ বোধহয় কাউকেই তারা চেনেন না। জানি না...

সুভাষদাকে আমি যখন প্রথম দেখেছিলাম, তখন তিনি ছিলেন বিনাবিচারে বন্দি। আর আমি ছিলাম বিচারাধীন বন্দি। তিনি ছাড়া পাওয়ার আগেই আমি জামিনে ছাড়া পেয়ে যাই। কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য সুভাষদা ছাড়া পান। তখন আমার বয়স আঠারো, সুভাষদার তিরিশ। সুভাষদা আমার চেয়ে বারো বছরের বড়। সেদিনের সেই সম্পর্ক জীবনে কখনও চিড় ধরেনি, কখনওই আমরা ছাড়াছাড়ি হইনি। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে যেদিন তাঁর মরদেহ মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল, সেই হল সুভাষদার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ ছাড়াছাড়ি।

সুভাষদা আর আমি একসঙ্গে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি করেছি। ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হওয়ার সময় একসঙ্গে সি. পি. আইতে থেকে গিয়েছি। ১৯৬৪ সালে একসঙ্গে পার্টির সদস্যপদ নবীকরণ করাইনি। শুধু পার্টি নয়, সাহিত্য আন্দোলন নয়, ব্যক্তি-জীবনেও আমি সবসময় সুভাষদার কাছাকাছি থেকেছি। সুভাষদা যখন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সংসার পাতলেন তখনও আমি সেখানে সাক্ষী। সেদিনের কথা আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ছোট্ট অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। গীতাদি সবে বিদেশ থেকে ফিরেছেন। একই সময়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে সুভাষদা ও গীতাদি পড়তেন। তারপর কলেজ ছেড়ে গীতাদি কিছুদিন বোম্বাইতে সাংবাদিকতা করে বিদেশ পাড়ি দিলেন। তারপর দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফিরে সুভাষদার সঙ্গে সংসার-পাতা।

সুভাষদার বাবাকে আমি দেখেছি, মাকে দেখিনি। বৌদি মীরাদিকে দেখেছি, দাদাকে দেখিনি। মীরাদি ছিলেন মহিলা আন্দোলনের কর্মী, ভাইঝি তানিয়া ও ভাইপো পুনপুনকে ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি। তানিয়া ও পুনপুন আমাকে ছেলেবেলা থেকে 'কাকা' বলে ডাকে। শুধু ডাকে বললে ভুল হবে, আপন কাকার চোখে আমাকে দেখে। পুনপুন আজ অবশ্য আর ডাকে না। সে এই পৃথিবীতে আর নেই। শান্ত ঋজু দৃঢ় তাজা পুনপুন শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। পুনপুন বিয়ে করেছিল। সুন্দরী, বিদুষী, শান্তিনিকেতনের মেয়ে। স্ত্রীর কাছে যাওয়ার পথেই তার এই মর্মান্তিক জীবনাবসান। সুভাষদার সেই উপন্যাসটির কথাই মনে পড়ে—'কে কোথায় যায়'।

পুনপুনের একমাত্র ছেলে অনির্বাণ তো অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে অনির্বাণকে একটি বই উৎসর্গ করে সুভাষদা লিখেছিলেন—'আমার বাবার পরিবারের একমাত্র সলতে'।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সংসার পাতবার পর সুভাষদা ও গীতাদি কিছুকাল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করবার জন্যে বজবজে কাটিয়েছিলেন। সুভাষদার অনেক কালজয়ী কবিতা বজবজে বসেই লেখা। বজবজে বসেই সুভাষদা লিখেছিলেন 'ভূতের বেগার'। সেই বই নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল সে-কথা আমি অন্যত্র বলেছি। আমি প্রকাশনায় আসবার পর 'ভূতের বেগার' পুনরায় প্রকাশ করেছি। বইটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন দুরূহ বিষয়কে কত সহজ করে লেখা সম্ভব। আর সে-লেখা বোধহয় একমাত্র সুভাষদাই লিখতে পারেন। সুভাষদার গদ্য তো আজকে গবেষণার বিষয়। একবার নীহাররঞ্জন রায় আমাকে বলেছিলেন, সুভাষের গদ্যের আমি অন্ধ ভক্ত। নীহারবাবুর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙালির ইতিহাস'-এর ছোটদের জন্যে সহজ রূপ দিয়েছেন সুভাষদা। এমন সহজ রূপ যে দেওয়া যেতে পারে সে-কথা নীহারবাবু স্বপ্নেও ভাবেননি। নীহারবাবুর মুখ থেকেই একথা আমার শোনা। সুভাষদার 'আমার বাংলা' আমার কাছে তো ছায়াসঙ্গীর মতো থাকে। সময় পেলেই উলটে পালটে দেখি।

সুভাষদা আর গীতাদি যখন পুপেকে দত্তক নিয়ে বজবজ থেকে শরৎ ব্যানার্জী রোডে ফিরে এলেন, তখনও আমি তার সাক্ষী। ছোট্ট পুপে প্রাম-এ শুয়ে যখন আকাশটা লুফে নিতে চাইত সে দৃশ্য আমার দেখা। এইসব দৃশ্য তো সুভাষদা তাঁর কবিতায় লিখে গিয়েছেন। আমার পত্রিকা 'আগামী'তে সুভাষদা অসংখ্য লেখা লিখেছেন। ছড়া কবিতা গদ্য রচনা—কিছুই বাদ যায়নি। শুধু লিখেছেন বললেই ঠিক বলা হবে না, সুভাষদা 'আগামী'র সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। 'আগামী' কার্যালয়ে তিনি নিয়মিত আসতেন। তিনি যখন 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, তখনও কিন্তু 'আগামী' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেননি। লিখেছেন, নিয়মিত এসেছেন, এবং পরিকল্পনায় সাহায্য করেছেন। শেষবার যখন মনীষা গ্রন্থালয় থেকে 'আগামী'র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রধান সম্পাদক ছিলেন সুভাষদা আর সম্পাদক ছিলাম আমি।

একদিনের কথা মনে পড়ছে, আমার মেয়ে তখন শরৎ ব্যানার্জী রোড মাতিয়ে বেড়াচ্ছে। এ-কোল থেকে ও-কোল, এর বাড়ি থেকে ওর বাড়ি সর্বত্রই সে মহারানি। সকাল কাটাচ্ছে চিন্মোহন সেহানবীশের বাড়ি, দুপুরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাসা, আর বিকেল কাটছে পরিতোষ সেনের কোলে। তার পরিচয়ে তখন আমার পরিচয়। সেই সময় আমি আর সুভাষদা একদিন সন্ধেবেলা জমিয়ে গল্পগুজব করছি। কোনো রাজনীতি নয়,

কোনো সাহিত্য আলোচনা নয়, একেবারে একান্ত ব্যক্তিগত কথাবার্তা। সুভাষদা আমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও খোলামেলা ব্যক্তিগত কথাবার্তা আমাকে বলতেন। আমিও বলতাম। সেদিন কথা বলতে বলতে সুভাষদা হঠাৎ বলে উঠলেন, তুমি কিন্তু সবচেয়ে সুখী।

এমন আকস্মিক মন্তব্যে আমি চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

সুভাষদা বললেন, তোমার কোলে রুম্পার মতো মেয়ে আছে, ওকে আমার স্বপ্ন বলে মনে হয়। ঘরে এমন একটি স্বপ্ন আলো করে থাকলে জীবনে আর কিছু প্রয়োজন? তুমিই বলো!

আমি হাসলাম, বাবা হিসেবে আমি সত্যিই গর্বিত।

সুভাষদা তখন বললেন, শোনো তোমাকে পুপের কথা বলি। গীতা যেদিন পুপেকে নিয়ে এল সেদিন আমি সায় দিতে পারিনি। ভেবেছিলাম আমাদের এই টানা-পোড়েনের সংসারে একটি দুধের শিশুকে কি মানুষ করতে পারব! সত্যি সেদিন আমার মনে অনেক জিজ্ঞাসা ছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল দেখলাম ধীরে ধীরে সবকিছু কেমন পালটে যাচ্ছে। গীতা পুপেকে প্রামে শুইয়ে সকালে বাইরে আমার সামনে রেখে যেত। আমি পুপের দিকে তাকিয়ে থাকি। তার মিষ্টি হাসি, আকাশের দিকে মুঠো করে হাত তোলা, আমাকে কেমন পাগল করে দিত। স্নেহের যে কি রূপ সেই প্রথম আমি এমন তীব্রভাবে অনুভব করলাম। তারপর থেকে তো তুমি সবই জানো—আমি কেমন স্নেহের বাঁধনে বাঁধা। বুঝতেই পারছ কেন আমি বলছিলাম তুমি সবচেয়ে সুখী।

এই কথার আমি কোনো জবাব দিই-নি। অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম।

সুভাষদার সঙ্গে দীর্ঘকাল আমি প্রগতি লেখক সংঘ করেছি। আমি অবশ্য যখন প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে আসি, তখন সংঘের আর সেই রমরমা অবস্থা নেই। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি তখন সবে আইনি হয়েছে। সুভাষদাদের সেই রমরমা যুগ আমি দেখিনি। তবে তার রেশ আমি পেয়েছি। সুভাষদা-চিনুদা তখনও প্রগতি লেখক সংঘের নেতৃত্বে আছেন।

সুভাষদার সঙ্গে একসঙ্গে আমি আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘ গড়ে তুলেছি। সুভাষদা ছিলেন সর্বভারতীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত হিন্দি লেখক ভীষ্ম সাহনি আর অন্যতম সম্পাদক ছিলাম আমি। কতবার ভীষ্ম সাহনির দিল্লির বাড়িতে সুভাষদা আর আমি সভায় যোগ দিতে গিয়েছি। ভীষ্ম সাহনি ছিলেন অসাধারণ বিনয়ী ও নম্রভাষী মানুষ। আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন। সুভাষদার সমবয়সী। এককালের বিখ্যাত হিন্দি অভিনেতা বলরাজ সাহনির ছোটভাই। হিন্দি সাহিত্যে দিকপাল লেখক। বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় হলেও আমি 'ভীষম' বলে ডাকতাম। ভীষম দাদার মতো ভাল অভিনেতাও ছিলেন। 'মি. অ্যান্ড মিসেস আয়ার' ছবিতে ভীষমের অভিনয়

দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। ভীষম কলকাতায় এসে একবার আমার বাড়িতে ছিলেন। সুভাষদা আমি কাছাকাছি থাকি, তাই তিনজনের আলোচনার খুব সুবিধা হত। আমার বাড়ির লোক তো ভীষমের মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের কথা মনে পড়ছে। আফ্রিকা এশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে অসংখ্য লেখক প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন সেই সম্মেলনে। সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছিল। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সভাপতি বিখ্যাত হিন্দি কবি হরবন্স বচ্চন ও সম্পাদক মুলকরাজ আনন্দ। আমরা সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও বেশ ঘটা করে আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম। সেই আঞ্চলিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে আমরা কবি বিষ্ণু দে'র আফ্রিকার কবিতার অনুবাদের একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলাম।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচনের কথা মনে পড়ছে। মনে আছে বিজ্ঞান ভবনের একটি সভাঘরে নেতা নির্বাচনের এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক মুলকরাজ আনন্দ। আমরা সবাই ধরেই নিয়েছিলাম তিনি যখন প্রধান উদ্যোক্তা স্বাভাবিকভাবে তিনিই হবেন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা। কিন্তু আমাদের ভাবনাটা যে ভুল, সভা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা তা বুঝতে পারলাম। সভা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একটা গুঞ্জন শুনতে পেলাম। সে গুঞ্জন ক্রমশ উচ্চকিত হয়ে উঠতে লাগল। আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা সবাই এক জায়গায় বসেছিলাম। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ, মণীন্দ্র রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায় ও আরো অনেকে। সুভাষদা আমাদের সঙ্গে না বসে অনেক দূরে দিল্লির লেখকদের সঙ্গে বসেছিলেন। তাঁরা জোর করে সুভাষদাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

গুঞ্জনটা প্রথম আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি, উচ্চকিত হতেই বুঝতে পারলাম। এককোনা থেকে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। তারপর সেই উচ্চারণে ভরে গেল সারা হলঘর। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাই উচ্চকিত স্বরে উচ্চারণ করছে 'সুভাষ—সুভাষ'। ততক্ষণে আমরা বুঝে ফেলেছি। আমরা উঠে দাঁড়ালাম। তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও সুভাষদার নাম উচ্চারণ করতে লাগলাম। 'সুভাষ—সুভাষ' ছাড়া সারা হলঘরে আর কোনও শব্দ ছিল না। সবাই দাঁড়িয়ে উঠলেও সলজ্জভাবে একজনই শুধু বসেছিলেন—তিনি হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

মুলকরাজ বুদ্ধিমান মানুষ। আবহাওয়া বুঝতে তাঁর একটুও বিলম্ব হল না। তিনি মঞ্চ থেকে ঘোষণা করলেন—আমি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়েব নাম প্রস্তাব করছি।

সারা হলঘর করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল। মুলকরাজ উঠে গিয়ে সুভাষদাকে

মঞ্চে তুলে আনলেন। লজ্জায় সুভাষদা জড়োসড়ো হয়ে উঠেছেন। সর্বসম্মতিক্রমে সুভাষদা নির্বাচিত হলেন ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা।

মূল সম্মেলনের মঞ্চে অন্য নেতাদের সঙ্গে সুভাষদাকে বসে থাকতে দেখে সেদিন আমাদের গর্বে বুক ভরে গিয়েছিল।

ইন্দিরা গান্ধীকে, অত কাছ থেকে আমি প্রথম দেখলাম। ইন্দিরা গান্ধীর সেদিনের সেই ভাষণ আজও আমার মনের মাঝে গাঁথা আছে।

সুভাষদা ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলায়। সুভাষদারও সেদিনের বক্তব্য মনে রাখবার মতো। মুলকরাজ আনন্দ আফ্রিকা ও এশিয়ার লেখকদের আশু কর্তব্য নিয়ে অসাধারণ বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন।

মুলকরাজ আনন্দের সঙ্গে তখনই আমার প্রথম পরিচয় হয়। তারপর দিল্লিতে আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের সভায় গেলে মাঝে মাঝেই দেখা হয়েছে। মুলকরাজের লেখার সঙ্গে আমি ছেলেবেলা থেকেই পরিচিত। র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব প্রকাশিত তাঁর বাংলা অনূদিত গ্রন্থ 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি', 'কুলি', 'অচ্ছুত', 'একটি রাজার কাহিনী' প্রতিটি মননশীল বাঙালির কাছে পরিচিত।

আশির দশকে আমি 'র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব' নেওয়ার পর থেকে মুলকরাজের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখন তিনি কলকাতায় এলেই আমার সঙ্গে দেখা করতেন। তিনি এসে সাধারণত উঠতেন রাধাপ্রসাদ গুপ্তের বাড়ি। রাধাপ্রসাদ গুপ্তকে আমি 'সাঁটুলবাবু' বলে ডাকতাম। 'সাঁটুল' তাঁর ডাকনাম। এমন অসাধারণ বাঙালি সত্তার মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। সাঁটুলবাবুকে আমি দীর্ঘকাল আগে থাকতেই চিনতাম। সুভাষদার সঙ্গে সাঁটুলবাবুর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। সাঁটুলবাবু ছিলেন বামপন্থী ভাবনার মানুষ। অসাধারণ গদ্য লিখতেন সাঁটুলবাবু। দারুণ আড্ডাবাজ। সাঁটুলবাবুর সঙ্গে যে কতদিন জমিয়ে আড্ডা মেরেছি সে-কথা ভাবলে আজও বিস্ময় জাগে। সাঁটুলবাবুর ছিল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অসাধারণ সংগ্রহ। যে কোনো বিষয়েই আটকে গেলে আমি সাঁটুলবাবুর কাছে ছুটে যেতাম। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্প্রাপ্য বই বের করে সাঁটুলবাব সমাধান করে দিতেন।

মুলকরাজ যখন সাঁটুলবাবুর বাড়িতে আসতেন তখন আমি অনেকদিন ওঁদের সঙ্গে বসে গল্প করেছি। ওঁদের আলোচনা আমাকে অনেক উন্নত করেছে।

মুলকরাজ অবশ্য আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের কোনো কর্মকর্তা নির্বাচিত হলেন না। দায়িত্বে এলেন সুভাষদা।

সুভাষদার হাত ধরে আমি আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের স্থায়ী সভায় যোগ দিতে মস্কো গিয়েছি। মস্কো ও বাকুতে একই হোটেলে একমাস কাটিয়েছি। সুভাষদা আমাকে হাতে ধরে মস্কো চিনিয়েছেন। মস্কো ছিল সুভাষদার কাছে জলভাত। সুভাষদা তখন আন্তর্জাতিক আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ও 'লোটাস'

পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। রাশিয়া আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যান্য লেখকদের কাছে সুভাষদা যে কতটা জনপ্রিয় তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

সুভাষদার সঙ্গে একই পাড়ায়, একই রাস্তায়, প্রায় পাশাপাশি বাড়িতে আমি পঁচিশ বছর কাটিয়েছি। এই পঁচিশ বছরে একটি দিনও মনে পড়ে না তিনি কলকাতায় থাকলে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। কয়েক বছর আগে সেই পুরানো পাড়া ছেড়ে আসবার পর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এই সেদিনও পি.জি. হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে আমি সস্ত্রীক যখন সুভাষদাকে দেখতে গেলাম, তিনি আমার স্ত্রীর হাত ধরে বললেন. লীনা, তোমরা চলে যাওয়াতে আমাদের পাড়াটা একেবারে কানা হয়ে গেল।

সুভাষদার সঙ্গে আমার যে রাজনীতি বা সাহিত্যের সম্পর্ক ছিল তা নয়। নিজের অজান্তে কেমন একটা পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সুভাষদার পরিবার দিনে দিনে কেমন বড় হয়ে উঠল আমি চোখের পরে দেখলাম। একা পুপে ছিল, তারপর তোতা ও পাপু এল, এক কন্যা থেকে তিন কন্যা হল। তারপর কণিকা এল, তার ভাই লাল্টু এল। আরো তাদের দুই বোন এল। সংসার বাড়তেই থাকল। মেয়েদের সব বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তারা সবাই এখন সংসারী। প্রত্যেক মেয়ের বিয়েতে আমি সুভাষদার পাশে থেকেছি। তানিয়া-পুনপুনের মতো তারাও আমাকে 'কাকা' বলে ডাকে এবং কাকার চোখে দেখে। সকলেই আমার কাছে নিজের মেয়ের মতোই আদরের।

সুভাষদার আর্থিক অসচ্ছলতা আমি চিরকাল দেখে এসেছি। সচ্ছলতার সঙ্গে সম্পর্ক সুভাষদার কখনোই ছিল না। দারিদ্রকে যে কত সহজভাবে নেওয়া যায় তা সুভাষদা-গীতাদিকে না দেখলে বোঝা যায় না। সুভাষদা ও গীতাদি দুজনেই ছিলেন একই স্বভাবের। তাই মনের এত মিল।

সুভাষদা যেবার সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন সেদিনকার কথা মনে পড়ছে। কমিউনিস্ট হিসাবে এই প্রথম কোনো লেখক আকাদেমি পুরস্কার পেলেন। সিপিআই-এর তখনকার প্রাদেশিক কার্যালয় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিটে পার্টির পক্ষ থেকে সুভাষদাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। বিশাল হলঘর গর্বিত পার্টি কর্মীরা ভরিয়ে তুলেছিলেন। অনেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভবানী সেন, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকে সুভাষদাকে অভিনন্দন জানালেন। গীতা মুখোপাধ্যায় আবেগে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন। বলতে বলতে আবেগে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। সুভাষদাকে আমার মনে হচ্ছিল বিবাহবাসরে লাজুক বরের মতো। সুভাষদা তাঁর বক্তব্যে একটি কথাই খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন—আমি যা কিছু শিখেছি বা জেনেছি সবই পার্টির কাছ থেকে।

পার্টি আজ আমাকে যে সম্মান জানাচ্ছে আমার কাছে আকাদেমি পুরস্কারের চেয়ে এই পুরস্কার অনেক বড়।

সুভাষদা ছিলেন সাচ্চা কমিউনিস্ট। প্রথম জীবনে লিউ শাও চি'র একটি বই 'সাচ্চা কমিউনিস্ট হতে হলে' আমরা গীতার মতো পাঠ করতাম। সেই গ্রন্থে কমিউনিস্টদের যেসব গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে সুভাষদার মধ্যে সেইসব গুণাবলী আমি লক্ষ করেছি। আমার মনে হয়েছে আরো বেশি। সুভাষদার কমিউনিস্ট সত্তা নিয়ে যখন আক্রমণ শানানো হয়, তখন আমি শুধু ব্যথিত নয়, কেমন অসহায় বোধ করি। ১৯৬৪ সালে সুভাষদা পার্টি ছেড়ে দিলেও কমিউনিস্ট সত্তা কখনো ছাড়েননি। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হলে পার্টির আলোচনাই বেশি করতেন। খবরাখবর জানতে চাইতেন। পার্টি ছাড়ার পর আনন্দবাজার পত্রিকায় সুভাষদা যে লেখাটি লিখেছিলেন তার শিরোনাম ছিল—'ছেড়ে যাইনি, সরে দাঁড়িয়েছি।'

সুভাষদা সরে দাঁড়িয়েছিলেন একথা ঠিক। তখনকার রাজনীতি তিনি মানতে পারেননি। আমিও পারিনি। সেই কারণেই তো একসঙ্গে সদস্যপদ নবীকরণ করাইনি। আমাদের শরৎ ব্যানার্জী রোড পাড়া থেকে আমাদের সঙ্গে আরও দু'জন সদস্যপদ নবীকরণ করাননি। তাঁরা হলেন উমা সেহানবীশ ও নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। আমরা সবাই বিশ্বাস করতাম দক্ষিণপন্থী শক্তিকে ঠেকাতে গেলে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করা অবশ্য কর্তব্য। কংগ্রেসের সব নীতি যে আমরা মানতাম আদৌ তা নয়। অনেকক্ষেত্রে কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা করার পক্ষে ছিলাম আমরা। কিন্তু কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী সত্তাকে আমরা কখনও অস্বীকার করতাম না। পার্টি কিন্তু আমাদের এই ভাবনা থেকে দূরে সরে গেল। বিরোধিতায় ব্রাত্য হয়ে আমরা সদস্যপদ ছেড়ে দিলাম।

কবিতা লিখেছিলেন। সেদিনও লিখেছিলেন, এবারও লিখলেন। সেদিন কবির হৃদয়ের তন্ত্রীতে যে আঘাত লেগেছিল আজও সে আঘাত লাগলে কারো কি কিছু বলার থাকতে পারে?

১৯৬৪ সালের পর সুভাষদা আর কোনো রাজনৈতিক সভায় যোগদান করেছেন এমন কথা আমি কেন কেউ জানে না। অথচ তাঁর গায়ে একটি লেবেল সেঁটে দেওয়া হল।

একদিন আমি সুভাষদার কাছে গেলে, সুভাষদা বললেন, মমতা আমাকে কিছু কবিতা দিয়ে গেছে। দুয়েকটিতে চোখ বোলাবার পর বুঝতে পারছি আমার কলকাতা ছেড়ে পালানো ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তার আবদার আমাকে তার কবিতাগ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিতে হবে।

আমি হেসে বললাম, তার নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছেন, এখন সামলান।

সুভাষদা বললেন, বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম রাজনীতির তাগিদে। ব্যক্তিগতভাবে তো তাকে সাংসদ করবার জন্যে নয়।

সুভাষদার সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। তাঁর সাহিত্য-ভাবনা তো আমি জানি। সাহিত্যের ব্যাপারে তিনি কখনও সমঝোতা করবার ব্যক্তি নন। কখনও করেননি। প্রকৃত লেখকদের কাছ থেকে এর জন্যে তাঁকে পরোক্ষে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। সুভাষদা তাঁদের পাত্তা দেন না এমন অভিযোগ অনেকে আমার কাছেও করেছেন। সুভাষদার কাছে দু'একবার এই প্রসঙ্গে আমি কথাও বলেছি। সুভাষদা বারবার আমাকে একটি কথাই বলতেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো সমঝোতা চলে না।

সেই সুভাষদার ওপর বর্ষিত হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার বোঝা। অনেক বোঝার সামনে মুখোমুখি মানুষটি আজ কবিতার বোঝায় বিধ্বস্ত।

কিছুকাল পরে সুভাষদার কাছে গিয়ে অবশ্য দেখলাম তিনি খুব হালকা এবং মুক্ত। একগাল হেসে আমাকে বললেন, খুব বেঁচে গিয়েছি। আমার প্রিয় কলকাতা আর আমাকে ছাড়তে হচ্ছে না। মমতা তার কবিতার পাণ্ডুলিপি ফেরত নিয়ে গিয়েছে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

আমি বললাম, আমি জানি। সেই কারণেই তো আপনার কাছে এলাম। দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশু বইটি প্রকাশ করছে। তার মুখ থেকেই গতকাল শুনেছি। মমতা'র 'উপলব্ধি' গ্রন্থটি সে কয়েক হাজার বিক্রি করেছে। তার আশা মমতার কাব্যগ্রন্থ সব কবিকেই ছাড়িয়ে যাবে।

সুভাষদা হেসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সুধাংশুকে কী বললে?

আমি বললাম, সাবধান থেকো, রবীন্দ্রনাথের বিক্রিকে যেন আবার ছাড়িয়ে না যায়। সুভাষদা হেসে উঠলেন।

সুভাষদাকে আমার বরাবরই রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি বলে মনে হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবনায় সুভাষদা ছিলেন খুব গভীর। অনেক পার্টি সভাতেই সে-পরিচয় আমি পেয়েছি। কিন্তু তখনকার পার্টি নেতাদের সুভাষদার রাজনীতি সম্পর্কে মতামত প্রসঙ্গে ধারণা লক্ষ করে আমি খুব মজা পেতাম। সুভাষদা যখন পার্টি ছেড়ে আনন্দবাজারে বিতর্কিত লেখাটি লিখলেন, তখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী'র মতামত জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আগরতলা বইমেলায় নৃপেনদার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। নৃপেনদা আমার কাছে সুভাষদার খবরাখবর জানতে চাইলেন। আমি জানালাম। তারপর আনন্দবাজারের লেখাটির কথা উঠতেই নৃপেনদার মন্তব্য—ও ছেলেমানুষের মতো চিরকাল অনেক কথাই বলে। তা বলুক। কিন্তু সুভাষ যে আমাদের প্রিয় কবি সে কথা আবার ভোলা যায় নাকি! তাছাড়া অমন সাচ্চা মানুষ কজন মেলে!

আজ পার্টির কাছে সুভাষদাও ব্রাত্য, নৃপেনদাও ব্রাত্য।

অপরাধ, দুজনে সত্য কথা বলেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে নৃপেন চক্রবর্তীর অবদানকে অস্বীকার করা স্পর্ধা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে স্পর্ধা যত দ্রুত বিলীন হয় ততই কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে মঙ্গল। নৃপেনদার মৃত্যুর একদিন আগে অবশ্য তাঁর পার্টি সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যখন তাঁর জ্ঞান নেই। তিনি জানতেও পারেননি, বুঝতেও পারেননি। আশ্চর্য প্রহসন!

মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুভাষদা এবং নৃপেনদাকে সাচ্চা কমিউনিস্ট হিসাবে চিহ্নিত করে গিয়েছেন। তারপরেও কি আর কিছু বলার থাকে? আমার একটা তৃপ্তি যে কথাটি আমি গত কয়েক বছর ধরে বলে আসছি, মৃত্যুর অব্যবহিত আগে হীরেনবাবু সেই কথাটিই বলে গেলেন।

তখনকার পার্টি নেতাদের সুভাষদা যে কত প্রিয় ছিলেন তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। মুজফ্ফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, ডা. রণেন সেন, জ্যোতি বসু সকলেরই প্রিয়। এমনকি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অজয় ঘোষ, রাজেশ্বর রাও, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ সকলেই সুভাষদাকে স্নেহ করতেন। সুভাষদা যখন বজবজে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করছেন, তখন পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সুভাষদা অত দরিদ্রভাবে আছেন দেখে খুব বকাবকি করেছিলেন।

আজকালকার পার্টি কর্মীরা এসব কথা জানেন না। নেতারা কেউ কেউ জানলেও চুপ করে থাকেন। এটাই হয়তো আজকের যুগের স্বাভাবিকতা।

তবে আমি ব্যতিক্রম লক্ষ করেছি।

কলকাতায় আমরা সারাভারত মুশায়েরা ও আফ্রো-এশীয় লেখক সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাসিত লেখক আলেক্স লাগুমা এসেছিলেন,

অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ এসেছিলেন। সেবার রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আমরা প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলাম। জ্যোতি বসু তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সুভাষদা ও আমি তখন বেশ কয়েকবার জ্যোতিবাবুর কাছে গিয়েছি। আশ্চর্য হয়ে দেখতাম সুভাষদা যা বলছেন জ্যোতিবাবু তাতেই রাজি। সুভাষদার প্রতি জ্যোতিবাবুর যে কী গভীর স্নেহ, সেদিন তা আমি অনুভব করেছিলাম। সেই জ্যোতিবাবুই সুভাষদা চলে যাওয়ার পর একবারও কোনো খোঁজ করলেন না দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। সুভাষদার মৃত্যু জ্যোতিবাবুর মনে কোনো রেখাপাত করেনি একথা মানতে আমার ঠিক মন চায়নি।

জ্যোতিবাবুর ক্ষেত্রে যেমন আমি ব্যথা পেয়েছি, তেমনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুভাষদাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে না আসায় আমি একইরকম ব্যথিত হয়েছি। বেলভিউ নার্সিং হোম থেকে সুভাষদার মরদেহ বাংলা আকাদেমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। পি.জি. হাসপাতালের বেড থেকে গীতাদিকে যখন তাঁর ছোট বোন আবুদি কয়েক ঘণ্টার জন্যে তুলে নিয়ে এসেছিলেন তখন গীতাদিকে আমি রাজি করিয়েছিলাম। আমার পাশে তখন ছিলেন সুধাংশু দে আর সৌমিত্র মিত্র। সুভাষদার ভাইঝি তানিয়া আমাকে বারবার চাপ দিচ্ছিল সুভাষদার মরদেহ যেন বাংলা আকাদেমিতে নিয়ে যাই। গীতাদি রাজি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসবার পর সবই পরিবর্তিত হয়ে গেল। কিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকল না। আমার বিশ্বাস বুদ্ধদেববাবু যদি প্রথমেই আসতেন, তাহলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। বিধানসভায় বারবার যিনি সুভাষদার কবিতা উদ্ধৃত করে বিরোধী পক্ষের জবাব দিচ্ছেন, তাঁর অনুপস্থিতি তো একটু বিস্ময়কর বলেই আমার মনে হয়। যিনি সুভাষদার কবিতার অন্ধ ভক্ত, তাঁর পক্ষ থেকে অন্যের হাত দিয়ে সুভাষদার মরদেহের উদ্দেশে পুষ্পস্তবক আসবে সে কথা কি ভাবা যায়!

শুধু কমিউনিস্ট পার্টি নয় কংগ্রেস নেতৃত্বেরও সুভাষদার প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল সে কথা আমি জানি। সুভাষদার নেতৃত্বে আমরা যেবার কলকাতায় সারা ভারত লেখক সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম তখন কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলাম। সুভাষদার সঙ্গে আমি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কাছে গিয়েছি। আমি দেখেছি সুভাষদার প্রতি তাঁর কী গভীর ভালবাসা। সুভাষদাকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য করেছিলেন সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে। সুভাষদা যে দীর্ঘকাল সাহিত্য আকাদেমির বাংলা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন সেখানেও সিদ্ধার্থবাবুর অবদান অস্বীকার করা যায় না। আমাদের লেখক সেমিনারে তখনকার তথ্যমন্ত্রী ও বর্তমান মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর দেওয়া উপহার এখনও আমার কাছে আছে। সেই সেমিনারে ড. নীহাররঞ্জন রায় সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে যে অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা

আমার মনে আজও গাঁথা আছে। আজ আমার হাহুতাশ জাগে যখন মনে হয় নির্বোধের মতো সেই বক্তৃতার কোনো রেকর্ড করে রাখিনি।

সি. পি. আই ছেড়ে দেবার পর সুভাষদা অন্য কোনো পার্টিতে যাননি। তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে যে কথা বলা হয়, আমার ধারণা সে-কথা ঠিক নয়। সুভাষদার যখন কান একেবারে চলে যায়নি, অর্থাৎ তিনি কিছুই শুনতে পেতেন না তখন দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করেছি। কান চলে যাওয়ার পর তিনি বলতেন আর আমি আমার কথা লিখিতভাবে জানাতাম। এইভাবে ভাব-বিনিময়ে একটু অসুবিধা হত ঠিকই। তবে একে অপরকে ঠিকই বুঝতে পারতাম। সুভাষদার মনের সম্পর্ক ছিল সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। এককালের সি. পি. আই-এর অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা ও পরবর্তীকালে সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি (ইউ. সি. পি.) সম্পাদক মোহিত সেন যখন কোনো পার্টির সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সব কমিউনিস্টদের একত্রিত করবার চেষ্টা করেছিলেন তখন সুভাষদাকে রেখেছিলেন পুরোভাগে। পার্টি ছেড়ে আসা কমিউনিস্টদের যে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল তার আহ্বায়ক ছিলেন সুভাষদা। মোহিত সেনের আকস্মিক মৃত্যুতে সে সম্মেলন হতে পারেনি। সে ঘটনা খুব বেশিদিনের নয়।

.

সুভাষদা যখন সাহিত্য আকাদেমির দায়িত্বে ছিলেন, তখন একে একে সন্তোষকুমার ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন। তাঁদের সকলকেই আমি সুভাষদার বাড়িতে নিয়মিত দেখেছি। সন্তোষদার সঙ্গে তো সুভাষদার দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব। গৌরদা ও নীরেনদাকে সুভাষদা খুব স্নেহ করতেন। পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে সুভাষদা নাকি আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন একথা অনেকেই ভাবতেন। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে সুভাষদা কারোর নাম পুরস্কারের জন্যে সুপারিশ করেননি। যে তিনজনের নাম আমি উল্লেখ করলাম তাঁরা সকলেই অনেক আগে পুরস্কার লাভ করতে পারতেন। আমার সঙ্গে সুভাষদার কথাবার্তায় যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠত তা হল সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়ন। সুভাষদার খুব ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে প্রগতি সাহিত্য শিবির থেকে আমাকে প্রায়ই অভিযোগ শুনতে হত যে সুভাষদা আনন্দবাজার গোষ্ঠীর দিকে ঝোঁকা এবং আমি সুভাষদাকে কিছুই বলি না। সুভাষদাকে কিছু বলবার থাকলে তো কিছু বলব! তিনি মানুন বা না মানুন আমি নিজেই তো দেখতাম সুভাষদা কোনো ভুল করছেন না।

সুভাষদার মতের বিরুদ্ধে একবারই শুধু সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার দেওয়া হল। পুরস্কার লাভ করলেন মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'ন হন্যতে' উপন্যাসের জন্যে। মস্কো যাওয়ার আগে বন্ধ খামে তাঁর সুপারিশ সুভাষদা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনাটা আমি জানতাম। তখনকার সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ ও

সুপারিশে মৈত্রেয়ী দেবী পুরস্কার লাভ করেছিলেন। আকাদেমির ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। মৈত্রেয়ী দেবীও আমার খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তিনি আমার কাছে সুভাষদার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ করেছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবীকে বুঝিয়েও শান্ত করতে পারিনি। সুভাষদাকেও নয়। সুভাষদা মৈত্রেয়ী দেবীর এই উপন্যাসকে কোনোভাবেই সাহিত্য বলতে সম্মত নন। তারপর আনন্দবাজার পত্রিকায় উভয়ের যে অক্ষর-যুদ্ধ হয়েছিল সে-কথা হয়তো অনেকেরই মনে আছে। সুভাষদা লিখেছিলেন, 'ক্ষমা নেই'। সুভাষদার সেই শানিত, তীব্র, ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ সহ্য করা বড় কঠিন। মৈত্রেয়ী দেবী তারপর একদিন আমার কাছে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। আজও 'ন হন্যতে' উপন্যাসকে যখন সমানভাবে জনপ্রিয় দেখতে পাই, তখন বুঝে উঠতে পারি না সেদিন কে ঠিক ছিলেন। 'ন হন্যতে'র জনপ্রিয়তার কথা সুভাষদাকে দু'একবার বলবার চেষ্টা করলে তিনি শুধু মৃদু মৃদু হাসতেন। কোনো জবাব দিতেননা।

সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কারের ব্যাপারে সুভাষদার সঙ্গে একবারই আমার মতপার্থক্য হয়েছিল। তবে সেটা পুরস্কারের যোগ্যতা সম্পর্কে নয়—সময় সম্পর্কে। সুভাষদা যে কার নাম পুরস্কারের জন্যে সুপারিশ করেছেন সেইবারই আমি আগে থাকতে জানতাম না। সুভাষদা মস্কো থেকে ফিরে আমাকে বললেন, এবারে যে পুরস্কার ঘোষণা হচ্ছে তাতে বোধহয় তুমি সবচেয়ে খুশি হবে। তোমার সমবয়সী এবং ঘনিষ্ঠ একজনকে এবার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

আমি জবাব দিলাম, প্রতিবারই তো আমার ঘনিষ্ঠজনকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। মৈত্রেয়ী দেবীও আমার ঘনিষ্ঠ। এবারের নতুনত্বটা কিরকম?

সুভাষদা বললেন, তোমার সমবয়সী এবার এই পুরস্কার পাচ্ছে। শঙ্খকে এবার তার 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের জন্যে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শঙ্খ ঘোষের নাম তখনও ঘোষিত হয়নি।

আমি সুভাষদাকে বললাম, শঙ্খবাবু পুরস্কার পেলে আমি খুবই খুশি হব। কিন্তু অরুণ মিত্র এখনও পুরস্কার পেলেন না। সেখানে শঙ্খবাবুকে পুরস্কার দেওয়াটা কি ঠিক হল?

সুভাষদা জবাব দিলেন, অরুণবাবুর নাম বিবেচনার জন্যে আসেনি।

আমি বললাম, আপনি তো সুপারিশ করবেন!

সুভাষদা চুপ করে থাকলেন।

এমনই আশ্চর্যের ঘটনা যে পরদিন সকালে সুভাষদার বাড়ি গিয়ে দেখি, অরুণবাবু আর শান্তিদি বসে আছেন। সুভাষদাও ছিলেন। আমি গিয়েছি সুভাষদা ও আমি একসঙ্গে বাজারে যাব বলে। সুভাষদা কলকাতায় থাকলে আমি ও সুভাষদা একসঙ্গে লেক মার্কেটে বাজার করতে যেতাম।

অরুণবাবুকে সামনে পেয়ে আমি এবারের পুরস্কারের কথাটি আবার তুললাম। অরুণ মিত্র খুব লজ্জা পেয়ে গেলেন।

সুভাষদা বললেন, অরুণবাবুর কোনো বই নেই তো আমি কী করব? প্রসূন কাল থেকে আমার কাছে এই অভিযোগ করে আসছে।

আমি বললাম, আপনি যদি কথা দেন, তাহলে আমি অরুণবাবুর বই শীঘ্রই প্রকাশের ব্যবস্থা করব। তারপর অরুণবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি আমাকে অবিলম্বে পাণ্ডুলিপি গুছিয়ে দিন।

সুভাষদা বললেন, অরুণবাবুর নতুন বই তুমি প্রকাশ করলে আমি খুবই খুশি হব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি অরুণবাবু যাতে পুরস্কার পান তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি আমি করব না।

আমি তখনও পুরোমাত্রায় প্রকাশনা জগতে আসিনি। তবু প্রকাশ করলাম অরুণ মিত্রের নতুন কবিতার বই—'শুধু রাতের শব্দ নয়'।

এমনই কপাল যে সেবারেই সুভাষদাকে সাহিত্য আকাদেমি থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। তবে অরুণবাবু এবং আমার উভয়েরই কপাল অন্য দিক থেকে ভাল। কিছুদিন আগে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে। 'শুধু রাতের শব্দ নয়' কাব্যগ্রন্থের জন্যে অরুণ মিত্র 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করলেন। বামফ্রন্ট আমলে এটিই প্রথম সাহিত্য পুরস্কার। মনে আছে রেডিয়োতে রাতে এই সংবাদ শুনে পরদিন সকালে সুভাষদা আর আমি অরুণবাবুর তিলজলার বাসায় তাঁকে অভিনন্দন জানাতে ছুটে গিয়েছিলাম।

অরুণবাবু 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার পেয়েছিলেন আরো পরে।

অরুণ মিত্র ছিলেন অসাধারণ অমায়িক মানুষ। সবাইকে দাদা বললেও অরুণ মিত্রকে কেন যে আমি অরুণবাবু বলতাম, তা আজও জানি না। অথচ তাঁর স্ত্রী শান্তি মিত্রকে চিরকাল শান্তিদি বলেই ডেকে এসেছি। শান্তিদি ছিলেন তৃপ্তি মিত্রের আপন দিদি। শান্তিদিও ভাল লিখতেন। সুভাষদা শান্তিদির লেখার খুব ভক্ত ছিলেন। সুভাষদার মুখেই শুনেছি শান্তিদিরা যখন তাঁর মামা ও বিখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে থাকতেন তখন সুভাষদা প্রায়ই সেখানে গিয়ে শান্তিদিকে লেখার জন্যে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। কিন্তু শান্তিদি লেখা ছেড়ে দিলেন। আমি অরুণবাবুকে বলতাম, আপনার জন্যেই শান্তিদির লেখা হল না। অরুণবাবুর ঠোঁটের কোণা দিয়ে মিষ্টি হাসি ঝরে পড়ত।

প্রথম জীবনে অরুণ মিত্র দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করেছেন। তিনি ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক। সাহিত্য বিভাগের দায়িত্বেও ছিলেন অনেকদিন। সুভাষদার মুখে শুনেছি সেই সময় তিনি ডাকযোগে অরুণবাবুর কাছে কবিতা পাঠিয়েছিলেন। তবে তখন ঠিক কবিতা ছাপা হত কিনা আমি জানি না। অরুণবাবু 'অরণি' পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্বেও ছিলেন অনেকদিন। সুভাষদাও সেই পত্রিকায় লিখেছেন। 'অরণি' পত্রিকাতে বোধহয় প্রথম সুকান্ত ভট্টাচার্য'র কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। অরুণবাবুও তখন মার্কসবাদী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী।

কিছুকাল পরে উচ্চশিক্ষার জন্যে অরুণ মিত্র ফ্রান্স পাড়ি দিলেন। প্যারিসে অরুণবাবু ছিলেন অনেকদিন। ফরাসি ভাষায় তিনি সেখান থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। প্যারিসে থাকবার সময় লুই আরাগঁ, পল এল্যুয়ার প্রমুখের সঙ্গে অরুণবাবুর খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়। অরুণবাবুর সেই সময়কার বা পরবর্তীকালের কবিতায় ফরাসি প্রভাব বেশ লক্ষ করা যায়। অন্যেরা কী ভাবেন আমি জানি না, তবে পল এল্যুয়ারের কবিতা পড়বার পর আমার তো সেই কথা মনে হয়েছে। আমি একদিন কবি বিষ্ণু দে-কে সে-কথা বলেওছিলাম।

দেশে ফিরে অরুণ মিত্র এলাহাবাদে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন। সেই সময় অরুণবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়। মনে আছে পার্ক সার্কাসে শম্ভু মিত্রের বাড়িতে আমি অরুণবাবুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেছিলাম। অরুণবাবুর মিষ্টি ব্যবহারে সেদিন আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিনই অরুণবাবুকে 'আগামী' পত্রিকায় লিখবার জন্যে অনুরোধ জানাতে তিনি আমাকে ছোটদের বিখ্যাত ফরাসি উপন্যাস 'লিটল প্রিন্স' ফরাসি থেকে অনুবাদ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অরুণবাবু প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। 'আগামী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল মূল ফরাসি থেকে অরুণবাবুর সেই অনুবাদ—'ক্ষুদে রাজপুত্তুর'। বইটি তারপরে নানাজনে অনুবাদ করেছেন—আমিও করেছি। কিন্তু অরুণবাবুর অনুবাদের স্বাদই আলাদা। সেদিন থেকে অরুণবাবুর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল—সে সম্পর্ক ম্লান হয়নি কখনো।

অরুণবাবু প্রথমদিকে সেরকম সম্মান না পেলেও, শেষ জীবনে খুবই সম্মান লাভ করেছিলেন। অরুণবাবুর প্রতি অবিচার নিয়ে আমার যে ক্ষোভ ছিল, পরবর্তীকালে সে ক্ষোভের আর কোনো কারণ ছিল না। শেষ জীবনে আমি আর অরুণবাবু খুব কাছাকাছি বাস করেছি। সুভাষদার মতন। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় অরুণবাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুব ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল।

পার্টিগত আলোচনা করতে করতে সুভাষদা একদিন আমাকে বলেছিলেন, একজনকে আমি পার্টি সদস্যপদ নিতে নিষেধ করেছিলাম।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে?

সুভাষদা বলেছিলেন, শঙ্খ। শঙ্খ একবার পার্টি সদস্যপদের জন্যে খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম শঙ্খ'র মতো চরিত্রের মানুষের পার্টির বাইরে থেকে সমর্থক হওয়া অনেক ভাল। ভেতরে এলে কিছুদিনের মধ্যেই সে সদস্যপদ ছেড়ে দেবে।

আমি সুভাষদার কথা বুঝতে পেরেছিলাম। শঙ্খ ঘোষের নম্র কোমল স্বভাবের কথা আমি জানি। সত্যিই এমন স্বভাবের মানুষদের পার্টির ভেতরে থাকা বড় কঠিন।

সুভাষদার ক্ষেত্রে দেখলাম অবশ্য বিপরীত। পার্টির ভেতরে থাকবার সময় তিনি

পেলেন শ্রদ্ধা স্নেহ প্রীতি ভালবাসা আর বাইরে এসে পেলেন শুধুই ধিক্কার। ১৯৮০ সালের পর সুভাষদা বামপন্থীদের কাছে অচ্ছুৎ হয়ে গেলেন। এমনকি তাঁর বইয়ের বিক্রি দারুণভাবে কমে গেল। বামফ্রন্ট সরকারের কোনো ব্যাপারেই সুভাষদাকে ডাকা হত না। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সাধারণ পরিষৎ সদস্যও তাঁকে করা হয়নি। অথচ বাংলা আকাদেমি নিয়ে সুভাষদার ভাবনা-চিন্তার শেষ ছিল না। তিনি নিয়মিত বাংলা আকাদেমিকে নানারকম ভাবনা-চিন্তার কথা জানাতেন। সুভাষদার কাছে গেলে সেইসব পরিকল্পনার কথা আমাকে প্রায়ই বলতেন। অথচ সুভাষদার একটা চিঠিকে প্রয়োজনে ঠিক কাজে লাগানো হয়েছিল।

সুভাষদা শেষবারের মতো হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে যখন পিজি'র উডবার্ন ওয়ার্ডে ছিলেন তখন হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন, অসিত বন্দ্যোপাধায়ের মৃত্যুর পর বাংলা আকাদেমির সভাপতির যে পদটি খালি হয়েছে সেখানে জ্যোতিভূষণ চাকীকে বসানো অবশ্যই উচিত।

আমার হাত ধরে বললেন, তুমি একটু চেষ্টা করো।

আমি লিখে সুভাষদাকে জানালাম, আমার সেই পরিস্থিতি আজ আর নেই। কে আমার কথা শুনবে! আমিও আপনার মতো ব্রাত্য।

সুভাষদা আবার বললেন, তবুও তুমি চেষ্টা করো।

আমার চেষ্টা করার কোনো সুযোগ ছিল না। অসুস্থ শরীরে সুভাষদা বোধহয় বুঝতে পারছিলেন না। পরে শুনেছি সুভাষদা আমি ছাড়া আরও দু'একজনকে নাকি এই কথা বলেছেন। শুনেছি, হীরেনবাবুকেও তিনি জ্যোতিবাবু প্রসঙ্গে একটি চিঠিও লিখেছিলেন।

জ্যোতিভূষণ চাকী বাংলা আকাদেমির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে থাকলেও তিনি সভাপতি হতে পারবেন না একথা আমি বুঝেছিলাম! কেন বুঝেছিলাম সে কথা হয়তো আমি কাউকে বোঝাতে পারব না। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনে থাকবার সুবাদে হয়তো একথা আমি বুঝেছিলাম। ঠিক জানি না।

সুভাষদা যতদিন পার্টিতে ছিলেন ততদিন এমন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আমি খুব কম দেখেছি। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-মহিলা-ছাত্র-সকল ফ্রন্টের কর্মীদের কাছেই সুভাষদা ছিলেন আপনজন। সকলের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব। ছোট-বড় কোনো ব্যাপার নেই। নেতা-কর্মী'র কোনো পার্থক্য নেই। দূর-দূরান্তর থেকে কত পার্টি কর্মীকে যে সুভাষদার বাড়িতে আসতে দেখেছি তার কোনো হিসেব নেই। অসংখ্য সাধারণ পার্টিকর্মীদের মুখ থেকে আমি সুভাষদার প্রশংসা শুনেছি। সুভাষদাকে নিয়ে তাঁরা বেশ গর্ব অনুভব করতেন। এইসব পার্টি কর্মীরা কখনো পাদপ্রদীপের আলোয় আসেনি। অথচ তাঁদেরই অসাধারণ ত্যাগে গড়ে উঠেছে এই পার্টি। তাঁদের বেশিরভাগই যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে গিয়েছেন। তবু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁদের পার্টিই ছিল প্রাণ।

এমন একজনের কথা আজ মনে পড়ছে। সুভাষদা তাঁকে অসম্ভব ভালবাসতেন। কতবার যে তাঁর কথা আমাকে বলেছেন! তাঁর জীবন-সংগ্রামকে সুভাষদা খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। আমিও দেখতাম। তিনি হলেন অতি সাধারণ একজন কর্মী—প্রকৃতি মিত্র। প্রকৃতিবাবুকে আমি যখন চিনি তখন তিনি চেতলার একটি বস্তিতে থাকেন। নিদারুণ দারিদ্র। সুভাষদার মতো দারিদ্র্যকে জয় করবার অসাধারণ ক্ষমতা। মুখে সবসময় লেগে আছে মিষ্টি হাসি। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী, অথচ নিয়মিত ভাতা পান না। ছেলেমেয়ে নিয়ে কী কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল তাঁকে।

তারপর প্রকৃতিবাবুর জীবন-সংগ্রাম এক নতুন মোড় নিল। অনেক সহকর্মীর উপদেশে প্রকৃতিবাবু খুব ছোট আকারে কাগজের ব্যবসা শুরু করলেন। সেইসময় প্রকৃতিবাবুকে আমি প্রায়ই সুভাষদার বাড়িতে আসতে দেখেছি। সুভাষদা সবসময় উৎসাহ জোগাতেন। ব্যবসা শুরু করলেও প্রকৃতিবাবু কিন্তু পার্টির কাছ থেকে সরে গেলেন না। প্রতিটি মিটিং মিছিলে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনে ব্যবসা শিকেয় তুলে তাঁকে দিনরাত কাজ করতে দেখেছি। ছেলেরা বড় হলে প্রকৃতিবাবু একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ব্যবসার হাল তারাই ধরল। পরবর্তীকালে সেই ব্যবসাকে তারা অনেক বড় করেছে। খোকন, গলু আজ কাগজের জগতে খুবই কৃতী ব্যক্তি। কিন্তু বাবার কমিউনিস্ট সত্তাকে তারা কখনো ভুলে যায় নি।

অবস্থা ফিরবার পরেও প্রকৃতিবাবুর কোনো পরিবর্তন আমি দেখলাম না। ঠিক যেভাবে প্রথম যুগে পার্টি করতেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই একইভাবে পার্টি করে গেছেন। সুভাষদা আমার কাছে বারবার প্রকৃতিবাবুর উদাহরণ তুলে ধরতেন। বলতেন, ভিত্তি যদি ঠিক থাকে তাহলে মানুষের পরিবর্তন হয়না। প্রকৃতিই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

আমি সুভাষদার সঙ্গে একমত হতাম। সত্যিই হেরে না গিয়ে জিতবার পথই জীবনের পথ। সেই জিতবার সংগ্রাম আমরা সবাই করে চলেছি। আজও।

গ্রামে অথবা মফস্‌সল শহরে নতুন যারা লিখছে তাদের সবার জন্যে সুভাষদার দরজা ছিল খোলা। সুভাষদা বন্ধুর মতো তাদের সঙ্গে মিশতেন। সুভাষদার এই ব্যবহার আমাকে খুব বিস্মিত করত। অন্য কোনো লেখকের দরজা এমনভাবে খোলা থাকত না। ৫ বি, ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোডের ঠিকানা সকলেরই যেন জানা ছিল। ছোটদের সঙ্গে মিশবারও সুভাষদার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। একই পাড়ার বাসিন্দা হিসেবে দেখেছি, পাড়ার কচি-কাঁচারা 'সুভাষজেঠু' বলতে অজ্ঞান ছিল। দু'একজন পাকা ক্ষুদে ব্যক্তি 'সুভাষদা' বলেও ডাকত। সুভাষদা সব ডাকেই বেশ মজা পেতেন। পরবর্তীকালে সুভাষদার নাতনিদেরও দেখলাম 'দাদু' যেন তাদের সমবয়সী বন্ধু।

একটা ব্যাপারে সুভাষদা আর আমার খুব মিল ছিল। আমাদের দু'জনেরই শখ গান

গাইবার, কিন্তু কারোরই গলায় কোনো সুর নেই। তবে একবার সুভাষদার সাহস দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কলকাতায় নয়, বাকু শহরে। আজারবাইজানের রাজধানী। আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে সমাপ্তি অধিবেশনে সুভাষদা রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলেন। আমার মনে হয়েছিল সুভাষদা সুন্দর আবৃত্তি করলেন। সেদিন রাতে সুভাষদাকে আমি আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলাম। আমরা একবার রানিক্ষেতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাদের দলে ছিলেন সুপ্রীতি ঘোষ ও তাঁর কন্যা। সুপ্রীতি ঘোষ সম্পর্কে আমার দিদি। সেখানে উপস্থিত বাঙালিরা সুপ্রীতি ঘোষের গান শুনবার দাবি জানালে সুপ্রীতিদি রাজি হয়ে একটি গানের আসর বসালেন। কোরাস গানে আমি পিছনের সারিতে বসে গলা মেলাবার চেষ্টা করেছিলাম। একটু পরেই আমার সামনে বসা সুপ্রীতিদির মেয়ে চৈতি পিছন ফিরে আমাকে ধমক দিয়ে উঠল, তুমি তোমার আবৃত্তি থামাবে! আমার সব তাল কেটে যাচ্ছে। আমি ব্যাজার মুখে চুপচাপ উঠে গিয়েছিলাম।

সুভাষদা হেসে বললেন, যাঃ, তোমার মতো অত খারাপ আমি গাই না। কতবার গণনাট্যের দলে গলা মিলিয়েছি তুমি জানো! বিশ্বাস না হয় তুমি বটুকদা-সলিলকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

বটুকদা মানে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র আর সলিল অর্থাৎ সলিল চৌধুরী।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কোনোদিন হয়তো শুনব আপনি বলবেন আমি হেমন্ত'র সঙ্গেও গেয়েছি।

সুভাষদা এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন সুভাষদার প্রিয় বন্ধু। শেষদিন পর্যন্ত সে-বন্ধুত্ব অটুট ছিল। সুভাষদার বাড়িতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে আমি অসংখ্যবার দেখেছি। সুভাষদার সঙ্গে মেনকা সিনেমার পাশে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি। দুই বন্ধু যখন কথা বলতেন, মনে হত তাঁরা সেই তরুণ-জীবনেই রয়ে গেছেন। সময় যে তাঁদের বয়সটা বাড়িয়ে দিয়েছে, শরীরটা অনেক পঙ্গু করে দিয়েছে, সে-কথা কখনো মানতে চাইতেন না। সাহিত্য ও সংগীত জগতে এই দুই দিকপালের কথোপকথন শোনা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কথা বলতে বলতে কত ছেলেমানুষই না তারা করতেন।

সুভাষদার কথা বলে শেষ করা আমার পক্ষে বড় কঠিন। একটা বলতে গেলে আরেকটা বাদ পড়ে যায়। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় পাশে থাকলে এত সহজে কী সব কথা বলা সম্ভব?

সুভাষদা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, দেখতে দেখতে তাও তো দেড় বছর হয়ে গেল। ছ'মাস আগে গীতাদিও চলে গেলেন। তবু বারবার মনে হয়, সুভাষদার এভাবে চলে যাওয়া কেমন যেন অস্বাভাবিক, কেমন যেন ছন্দপতন। আমার দৃঢ় ধারণা

সুভাষদার চিকিৎসা ঠিকমতো হল না। রাজ্য সরকার কত মানুষের জন্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন, অথচ সুভাষদার দিকে ফিরে তাকালেন না। এমনকি বারবার হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও কেউ একবারের জন্যেও দেখতে এলেন না। মন্ত্রীই হোন, আর নেতাই হোন। সুভাষদার চিকিৎসার সমস্ত খরচ জুগিয়েছেন মাত্র কয়েকজন মানুষ। একবার নয়, বারবার। আর তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন করেছেন নিঃশব্দে, কাউকে না জানিয়ে। আমার বারবার মনে হয়, যাঁরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাজ্য শাসন করছেন তাঁদের ভিত্তিভূমি রচনার ক্ষেত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অবদান কি খুব কম? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকে বাদ দিয়ে কি কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব?

তবু কেন এমন হয়! কেন এমন হতে দেওয়া হয়—আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

আমার বারবার বিস্ময় জেগেছে যখন দেখেছি সুভাষদার মাঝে কোনো অভিযোগ নেই, কোনো অভিমান নেই, কোনো বিদ্বেষ নেই। সব কিছুকে তিনি সহজ সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পার্টির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। কমিউনিস্ট সত্তা পরিত্যাগ করা এইসব মানুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। পার্টিতে থাকুন বা নাই থাকুন, পার্টির সঙ্গে মতান্তর হোক বা না হোক, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি থেকে যান সাচ্চা কমিউনিস্ট। আজ যে যা বলছেন বলুন, ইতিহাসই সবকিছু বিচার করবে।

সুভাষদার সম্পর্কে আরও অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়ে। সব কথা বলতে গেলে রাতের পর রাত কাবার হয়ে যাবে। এই দীর্ঘ স্মৃতিকে সহজে কী ভোলা যায়! আবার সেইসব স্মৃতি যখন ঐতিহাসিক মুহূর্তে ভরা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের এমন মধুময় স্মৃতি ক'জনের আর ভাগ্যে জোটে। ভাবতে ভাল লাগে আমি তাদেরই একজন।

নিজেকে আজ আমার বড় অসহায় লাগছে। জানি না কতদিন এই পৃথিবীতে আছি। সুভাষদা সবকিছুকে বিদায় জানিয়ে লিখেছিলেন—'যাচ্ছি'। সত্যিসত্যি সুভাষদা চলে গেলেন। দেড় বছর কেটে গেল তবু আমি ভাবতে পারি না! মনে হচ্ছে রবিবার সকালেই যাব ৫বি. ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোডে, পুরানো সেই বাড়ির একতলার পিছনের বারান্দায় সুভাষদার মুখোমুখি গিয়ে বসব। তাঁর সেই অসাধারণ হাসিতে মিলিয়ে যাবে আমার সব দুঃখ, সব যন্ত্রণা।

এই হাসি একজন প্রকৃত মানুষের হাসি। অমর কবির হাসি, সাচ্চা কমিউনিস্টের হাসি।

সরোজ দত্ত

কেন জানি না নিজেকে আজকাল বড় বেশি ক্লান্ত লাগছে। তবু মাঝেমাঝে দু'একজন তরুণ বন্ধু আসেন, শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। তখন নিজেকে কেমন যেন উজ্জীবিত মনে হয়। তাঁরা এখনও স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন। আমার মতো তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হয়নি। সেদিন এক তরুণ বন্ধু এসে আমাকে একটি বই উপহার দিয়ে গেলেন। আমাকে সজীব করাই হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য। বইটি হল 'সরোজ দত্ত'র রচনাসংগ্রহ'। বইটি আমার আগে পড়া। তবুও বইটির পাতা নাড়তে নাড়তে আমার চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকল নীরব নিস্তেজ এই বর্তমান। আর নিজের অজান্তে আমি ফিরে গেলাম পঞ্চাশের দশকের সেই উজ্জ্বল শব্দময় দিনগুলিতে।

হাইকোর্টের রায়ে কমিউনিস্ট পার্টি আইনি ঘোষিত হল। জেল থেকে নেতৃবৃন্দ এবং অসংখ্য কর্মীরা ছাড়া পেলেন। আমার উপর গৃহবন্দির যে আদেশ ছিল তা বাতিল হয়ে গেল। আমি আবার ঘরে ফিরে গেলাম। পরিবারের সঙ্গে পার্ক সার্কাসে বসবাস শুরু করলাম। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কর্মীদের ডেকে একটি সভা করলেন। যতদূর মনে আছে সভাটি হয়েছিল চার নম্বর পুলের কাছাকাছি একটি প্রেস-বাড়িতে। ওই রাস্তা দিয়ে গেলে নিজের অজান্তে বাড়িটির দিকে আমার চোখ চলে যায়। পুরানো দিনের নানা স্মৃতি জেগে ওঠে। জ্যোতিবাবুর এই সভার উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকাকে পুনরায় প্রকাশ করা। 'স্বাধীনতা' প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ডেকার্স লেন থেকে। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে, স্বাভাবিকভাবে 'স্বাধীনতা' বন্ধ হয়ে যায়। পুরানো সেই স্বাধীনতা-প্রেস, কার্যালয় সব কিনে নিয়ে শরৎচন্দ্র বসু 'দি নেশান' প্রকাশ করেন। এই 'নেশান' পত্রিকাতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের মুখপত্র 'লাস্টিং পীস' পত্রিকায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভ্রান্ত রাজনীতি সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদকীয়টি জেলে এবং বাইরে কমিউনিস্ট শিবিরকে তোলপাড় করে তোলে। যাক সেসব কথা। কিছুদিনের মধ্যেই 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত হয়। কার্যালয় হয় তেত্রিশ নম্বর আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। আমাদের মধ্যে নতুন উৎসাহের জোয়ার জাগে। তখন পার্ক সার্কাস লেখক শিল্পী সমাজ গড়ে উঠেছে। আমরা ছোটদের পত্রিকা, 'আগামী' প্রকাশ করছি। আমাকে 'আগামী'র সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে। অল্প দিনের মধ্যে 'আগামী' হয়ে উঠল কমিউনিস্ট পার্টির অঘোষিত ছোটদের পত্রিকা। আর এই 'আগামী'র জন্যেই 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় আমি জড়িয়ে পড়লাম।

তখন স্বাধীনতার চিফ রিপোর্টার ছিলেন অধীর চক্রবর্তী। অধীরদা একদিন খবর পাঠালেন তিনি বরেনদা আর আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বরেনদা মানে বিখ্যাত 'রঙরুট' উপন্যাসের লেখক বরেন বসু। নির্দিষ্ট দিনে অধীরদা বরেনদার বাড়িতে

এলেন। সেখানে আমরা তিনজন ছাড়াও নরেনদা উপস্থিত ছিলেন। নরেনদা হলেন বরেনদা'র অভিন্নহৃদয় শিল্পীবন্ধু নরেন্দ্রনাথ মল্লিক। অধীরদা জানালেন, প্রথম যুগে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ছোটদের জন্য 'কিশোরসভা' নামে যে পাতাটি চালাতেন, সেটি পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমাদের সেই পাতাটির দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানালেন। যেহেতু আমরা কিশোর পত্রিকা 'আগামী' চালাচ্ছি, সেইহেতু ছোটদের পাতাটির দায়িত্ব আমাদের নেওয়া উচিত বলে পার্টি মনে করে। বরেনদা আমাকে দেখিয়ে বললেন, ওই-ই তো 'আগামী'র সম্পাদক, ছোটদের ব্যাপারটা ওই বোঝে। ওর পক্ষে দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয় নিক। একা আমি রাজি হলাম না। বললাম, 'আগামী' আমি একা চালাচ্ছি না, অনেকে আছে। আপনাদের সঙ্গে আমি দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। তখন ঠিক হল বরেনদা, নরেনদা আর আমি 'কিশোর সভা'র দায়িত্ব নেব। কারোরই কোনো নাম থাকবে না। পাতাটির পরিচালকের নাম হবে 'কিশোরভাই'। যেমন মৌমাছি, স্বপনবুড়ো ঠিক তেমনি। বড়দের সব ব্যাপার-স্যাপার তখন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। নামে তিনজন থাকলেও সব দায়িত্ব গিয়ে পড়ল আমার ওপর। অধীরদাকে গিয়ে অভিযোগ জানাতে অধীরদা হেসে বললেন, তুমিও তো নিজে প্রায় কিশোর। তোমার পাতা তুমি দেখবে না তো কে দেখবে! তাছাড়া তুমি তো জানো তোমাকে এই দায়িত্বের ভার আসলে দিয়েছেন কাকাবাবু ও প্রমোদবাবু। তোমাকে আলাদাভাবে ডেকেও তো তাঁরা কথা বলেছেন। তাহলে আমাকে বলে কি লাভ! অধীরদা হাসতে হাসতে গায়ে হাত বুলিয়ে এমনভাবে বললেন যে, আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। বরেনদা, নরেনদা যে একেবারে সরে গেলেন তা নয়, আমি যখনই বলতাম তখনই এসে পরিকল্পনায় যোগ দিতেন। আমার কাঁধে নতুন এক দায়িত্বভার চাপল। যে পাতা সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং চালিয়েছিলেন, পুনরায় সেই পাতার পরিচালনার দায়িত্বভার আমি কাঁধে তুলে নিলাম ভাবতেও আজ বিস্ময় জাগে। সকলের স্নেহ আর ভালবাসা আমাকে অসাধারণ জীবনীশক্তি দান করেছিল।

সেদিনের 'স্বাধীনতা'র 'কিশোরসভা' আজ যদি কেউ দেখেন তাহলে তাকে কোনোভাবেই খারাপ বলতে পারবেন না। যে সম্পাদকীয় নীতির ভিত্তিতে 'আগামী' চলছিল 'কিশোরসভা'র নীতিও হয় সেই একই। অনেকে কিশোরসভার পাতায় লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, আবার কিশোরবাহিনী গড়তে কিশোরসভা বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ তখন শিশুসাহিত্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। সোভিয়েত থেকে প্রকাশিত ছোটদের একটি বই 'দাদুর দস্তানা' সেই সময় কলকাতা শহরকে মাতিয়ে দিয়েছিল। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে প্রকাশিত অনেক পত্র-পত্রিকা আমাকে 'কিশোরসভা' পরিচালনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

এখন যেমন কমিকসের ছড়াছড়ি, কমিকস ছাড়া যেমন কোনো ছোটদের পত্রিকা চলে না, তখন সেরকম ছিল না। 'সন্দেশ' পত্রিকার কথা বাদই দিলাম। তার সঙ্গে অন্য কোনো পত্রিকার তুলনা করা চলে না। মনে আছে নরেন দেব সম্পাদিত 'পাঠশালা' বা কামাক্ষীপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রঙমশাল' আমাদের ছেলেবেলায় খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রঙমশালের প্রথমদিকে সম্পাদক ছিলেন অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রতিটি পত্রিকাতেই গল্প-ছড়া-কবিতা-উপন্যাস ও ছোটদের আকর্ষণ করবার মতো অনেক কিছুই প্রকাশিত হত। 'শিশুসাথী' পত্রিকারও তখন খুব নাম-ডাক। আমাদের ছেলেবেলায় যখন খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ভোম্বল সর্দার' শিশুসাথীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত তখন গ্রামের ছেলে হিসেবে নিয়মিত পত্রিকা আমরা পেতাম না। তাছাড়া পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার আর্থিক ক্ষমতা আমাদের ছিল না। কিন্তু বন্ধুদের কাছ থেকে সংখ্যাটি সংগ্রহ করবার জন্য মন আঁকুপাঁকু করত। নরেন দেবের 'পাঠশালা' অন্য পত্রিকার তুলনায় আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয় ছিল। কেন, ঠিক আজ বলতে পারব না। 'আগামী' বা 'কিশোরসভা'র চিন্তাধারা ছিল এইসব পত্রিকা থেকে একটু স্বতন্ত্র।

কিশোরসভার টেবিলের ঠিক পিছনেই বসতেন সরোজ দত্ত। সরোজদা 'স্বাধীনতা'র কর্মী, রবিবারের পাতার ভারপ্রাপ্ত।

কিশোরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরোজদা আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করতেন। তরুণ বন্ধুটি আমাকে যে বইটি উপহার দিয়ে গিয়েছেন, সেখানে সরোজদার একটি প্রবন্ধ আছে 'শিশুসাহিত্যের সমস্যা'। প্রবন্ধটির কথা সরোজদা তখন আমায় বলেছিলেন। শিশুসাহিত্য রচনার যে সঠিক পথ কী হওয়া উচিত এই প্রবন্ধে সরোজদা সেই কথাই আলোচনা করেছেন। 'আগামী' বা 'কিশোরসভা' পরিচালনার নীতিও ছিল এই প্রবন্ধটির বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও প্রবন্ধটির কথা তখন আমি জানতাম না। 'কিশোরসভা' প্রকাশের বেশ কিছুদিন পরে সরোজদা কথায় কথায় এই প্রবন্ধটির কথা আমাকে বলেন। প্রবন্ধটি আমি পড়েছি পরে।

সাংবাদিক হিসেবে সরোজদার আগেই খুব নাম-ডাক ছিল। যুগান্তর পত্রিকায় সাংবাদিক ছিলেন, ধর্মঘট করায় তাঁর চাকরি যায়। কবি-সাহিত্যিক হিসেবে সরোজ দত্তর পরিচিতি সাংবাদিকের চেয়ে আরও অনেক বেশি ছিল। সরোজদা অসাধারণ কবিতা লিখতেন, দেশি ও বিদেশি কবিতার অসংখ্য অনুবাদ করেছেন। প্রাবন্ধিক এবং অনুবাদক হিসেবেও সরোজদার বিশেষ স্বীকৃতি ছিল। রম্যাঁ রলাঁর 'শিল্পীর নবজন্ম' গ্রন্থের অনুবাদ সরোজদার। কখনই অনুবাদ বলে মনে হয় না। বইটি আজও জনপ্রিয়।

সরোজদা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। সরোজদা ছিলেন যশোহর জেলার লোক। আমিও। একদিন আমাকে বললেন, তুমি আমার আত্মীয় হও তা জান?

আমি বললাম, সরোজদা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। যশোরের লোক হলেই আপনার আত্মীয়?

সরোজদা বললেন, ঠিক আছে। তুমি সুকুমার মিত্রকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

সুকুমার মিত্রের সরোজদার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা ছিল সেটা আমি জানতাম। কিন্তু সুকুমারদার সঙ্গে আমার যে কাছাকাছি একটা সম্পর্ক আছে তা আমি জানতাম না। সরোজদা-ই সুকুমারদাকে ধরে আনলেন। সুকুমারদা ছিলেন ধীর-স্থির, খুবই শান্ত প্রকৃতির মানুষ। সুকুমারদা হেসে সম্পর্কটি পরিষ্কার করে দিলেন। দেখলাম আমরা সত্যিই পরস্পরের আত্মীয়। মা'কে গিয়ে রাত্রে জিজ্ঞেস করতে, মা আত্মীয়তার সম্পর্কটি ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন। ওঁরা দুজনেই ছিলেন আমার মামারবাড়ির দিক থেকে আত্মীয়।

সরোজদা খুব মেজাজে গল্প করতেন। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। আমি বুঝতে না পারলে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতেন। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সরোজদা রামকৃষ্ণদেবের কথা তুললেন। আমি তখন একেবারে ছেলেমানুষ কমিউনিস্ট, ধর্মগুরুর নাম শুনলেই গা জ্বলে যায়। বললাম, সরোজদা ওঁর সম্পর্কে আমার কোনো আকর্ষণ নেই।

সরোজদা বললেন, তুমি ওঁর সম্পর্কে কতটা জান?

বললাম, যতটুকু জানি তাতে শ্রদ্ধার কিছু আমি খুঁজে পাই না।

সরোজদা বললেন, আমি তো তোমাকে শ্রদ্ধা করতে বলিনি, তোমাকে কি আমি গিরিশ ঘোষ হতে বলেছি। তুমি 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়েছ?

আমি বললাম, না।

সরোজদা বললেন, সুযোগ পেলে পড়ে নিও। একদিক দিয়ে রামকৃষ্ণকে কৃষক প্রতিনিধি বলা যেতে পারে।

আমি হেসে ফেলে বললাম, দারুণ আবিষ্কার সরোজদা।

সরোজদা বললেন, ব্যঙ্গ কোরোনা। শোনো তাহলে, গ্রামের কৃষকেরা যেভাবে কথা বলে, অতি কঠিন বিষয়কে অতি সহজে ব্যক্ত করতে পারে—রামকৃষ্ণের কথা ঠিক সেইরকম। রামকৃষ্ণ লেখা-পড়া জানতেন না। কিন্তু কৃষকদের কাছ থেকে জীবনের উপলব্ধি ও প্রকাশের ঢং শিখেছিলেন।

সরোজদা যত গম্ভীর হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, রামকৃষ্ণের প্রতি আমার এতই অ-ভক্তি যে আমি ততই হেসে ফেলছিলাম।

সরোজদা চটলেন না। সরোজদা আমার ওপর অবশ্য কখনই চটেননি। বললেন, রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, জীবন কীরকম। তিনি উত্তর দিচ্ছেন, ঠিক পেঁয়াজের মতো। তারপর সরোজদা ব্যাখ্যা করলেন, পেঁয়াজ ছাড়াতে ছাড়াতে যেমন শূন্যতা ছাড়া কিছু নয়, জীবনও সেইরকম। জীবনের এই ব্যাখ্যা তুমি-আমি বিশ্বাস করতে পারি, নাও

পারি, কিন্তু এত সহজ করে এই গভীর তত্ত্বকথা বলা কিন্তু খুবই কঠিন। গ্রামের কৃষকেরা তাদের উপলব্ধির কথা ঠিক এই ভাবেই ব্যক্ত করে। প্রথমত শুনলে মনে হবে কিছু নয়, কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলে বুঝতে পারবে এটা অনেক কিছু।

সরোজদার এই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ব্যাখ্যা শুনে আমি কিন্তু আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারিনি। কথামৃত পড়ব পড়ব করেও আর পড়া হয়ে ওঠেনি। পরে যখন পড়েছি, তখন সরোজদার কথা বারবার মনে পড়েছে। বুঝতে পেরেছি সঠিকভাবে সেদিন সরোজদা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

গল্প করতে করতে সরোজদা একদিন বললেন, তোমাকে আজ আমি একটা মজার সত্যকাহিনি শোনাব।

আমি বললাম, 'আগামী' বা 'কিশোরসভা'য় ছাপা যাবে তো!

সরোজদা বললেন, ছাপার কথা পরে। আগে গল্পটা তো শোনো। কলকাতা শহর থেকে সদ্য ছাত্রজীবন শেষ হওয়া একজন কমিউনিস্ট কর্মী আমাদের ওখানে কৃষক আন্দোলন করতে এসেছেন। বড়লোকের ছেলে, যে কোনো ব্যাপারেই মার্কসবাদী ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতা। এমনকি টুকিটাকি সাংসারিক বিষয়েও। পরনে সবসময় পাজামা-পাঞ্জাবি। কাঁধে ঝোলা। ঝোলায় সবসময় মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন-এর বই থাকবেই। আমাদের ঠাট্টা-রসিকতা-আড্ডা তার একদম পছন্দ নয়। আমি আবার আড্ডা ছাড়া থাকতে পারি না তা তো তুমি জানো। আমরা যখন চুটিয়ে আড্ডা মারতাম, তখন তিনি আমাদের চোখের সামনে ঝোলা থেকে মার্কসবাদী তত্ত্বের বই বের করে পড়া শুরু করতো। পড়ার সময় বইটি এমনভাবে ধরত, যাতে আমরা স্পষ্ট বইটির নাম দেখতে পাই। শহুরে কমিউনিস্টের লোক দেখানো পড়ার এই ভান দেখে, আমার ইচ্ছে হল একদিন ওকে একটু পরীক্ষা করা যাক।

কয়েকজন মিলে আমরা একটি পরিকল্পনা করলাম। নদীর পাড়ে আমাদের গ্রামের শ্মশান। পাড় থেকে বেশ খানিকটা চড়া। জোয়ারে চড়ায় জল উঠে আসে, ভাঁটায় নেমে যায়। শ্মশানে বৃদ্ধ বটগাছের নীচে খানিকটা জায়গা জুড়ে দাহ করা হয়। আমরা সেই শহুরে সাচ্চা কমিউনিস্টবাবুকে বললাম, আমাদের এই শ্মশানে নানা জাতের ভূত আছে। অমাবস্যার রাতে তুমি যদি একা একা শ্মশানে যেতে পারো, তাহলে বুঝব তুমি কত বড় কমিউনিস্ট।

আমাদের দিকে তাকিয়ে, ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে সে বলল, তোমরা দেখছি মার্কসবাদের কিছুই পড়াশোনা করোনি। ভূত আছে, সেটাও তোমরা বিশ্বাস করো। তোমাদের কুসংস্কারের বহর দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।

আমরা একস্বরে বলে উঠলাম, তা বটে!

আমি বললাম, এত কথার কি দরকার। তুমি শ্মশানে গিয়ে দেখিয়ে দাও না!

সে দৃঢ়ভাবে বলল, ঠিক আছে।

সামনে দু-চারদিনের মধ্যেই অমাবস্যা। আমরা তাকে ঠেলে শ্মশানের দিকে পাঠালাম, আর বলে দিলাম আমরা কেউই কিন্তু যাচ্ছি না। তোমাকে একাই যেতে হবে।

সে বলল, আমি যে গিয়েছিলাম তোমরা বুঝবে কি করে?

আমি বললাম, অনেক দূরে লণ্ঠন হাতে আমরা দাঁড়িয়ে থাকব, ঠিকই বুঝতে পারব। আমরা এমন দূরত্বে দাঁড়াব যাতে ভূত এসে আমাদের ঘাড় মটকাতে না পারে।

আমাদের কুসংস্কারে বিরক্ত হয়ে কলকাতা শহরের সাচ্চা কমিউনিস্ট বাবুটি বীরদর্পে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রথমটা আমরা হতচকিত হয়ে গেলাম। বুঝলাম আমাদের আন্দাজ ও পরিকল্পনা ভুল। সত্যি বস্তুবাদী দর্শন সে গুলে খেয়েছে। আমরা নিজেদের মধ্যে যখন এইসব ভাবনা নিয়ে কথাবার্তা বলছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম একটি জোরালো কণ্ঠস্বর, আমি কমিউনিস্ট—আমি মার্কসিস্ট।

রাস্তার গা ঘেঁষে ঘেঁষে আমরা এমনভাবে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলাম যাতে আমাদের দেখা না যায়, বিশেষভাবে হাতের লণ্ঠনটি যাতে চোখে না পড়ে। শ্মশানের কাছাকাছি গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম কমিউনিস্ট বাবুটি এক পা এগোচ্ছে আর দু'পা পিছোচ্ছে, আর মন্ত্রপাঠের মতো আউড়ে যাচ্ছে 'আমি কমিউনিস্ট—আমি মার্কসিস্ট'।

গলার স্বর বেশ কাঁপা কাঁপা। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে। প্রথমের সেই জোরালো কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠেছে। তার সামনা-সামনি নদীর কিনারের দিক থেকে ছায়ার মতো এগিয়ে আসছে একটি মূর্তি। মাথায় টুপির মতো একটা মড়ার খুলি। ডান হাতে আর একটি খুলি আর বাম হাতে একটি বিশাল লম্বা হাড় এবং তা দেখে লাঠির মতো মনে হচ্ছে। ডান হাতের খুলি থেকে মাঝে মধ্যে কী খাচ্ছে আর কিসব গালাগালি করতে করতে কমিউনিস্ট বাবুটির দিকে তেড়ে আসছে। তখনই কমিউনিস্ট বাবুটি দু'পা পিছিয়ে আসছেন আর পরক্ষণেই এক পা এগিয়ে মন্ত্রপাঠ করছেন 'আমি কমিউনিস্ট—আমি মার্কসিস্ট'। এই মন্ত্রপাঠ আর বেশিক্ষণ চলল না। ধড়াস করে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। আমরা দৌড়ে গিয়ে লণ্ঠনের আলোয় দেখি কমিউনিস্টবাবু জ্ঞান হারিয়েছেন আর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। আমরা ভূতের ভয়ের চেয়েও বাবুর অবস্থা যে কি হবে তাই ভেবে ভয় পেয়ে গেলাম। সব ভয় ভুলে আমাদের মধ্যে একজন ছুটে নদীতে জল আনতে গেল, কিন্তু তার কাছে কোনো পাত্র ছিল না। যার ভয়ে আমাদের এই সাচ্চা কমিউনিস্ট বাবুটির জ্ঞান হারানো, ডানহাতের মড়ার খুলিটি সেই-ই ছুঁড়ে দিল জল আনবার পাত্র হিসেবে। বন্ধুটি খুলি ভর্তি করে জল নিয়ে এল এবং তখন ছায়ামূর্তিটি কাছে এগিয়ে আসতে দেখি, সে আর কেউ নয়, আমাদের ভৈরব পাগলা। সে তান্ত্রিক, সবাই জানে শ্মশানে সে তন্ত্রসাধনা করে। শ্মশানে যারা মরদেহ দাহ করতে আসে তাদেরই পরিত্যক্ত জিনিসে তার জীবনযাত্রা চলে। মরদেহের সব পোশাক বা অন্য সবকিছু তারই পাওনা।

অমাবস্যার রাতে খুলিতে মদ ভর্তি করে সে নদীর পাড়ে মনের আনন্দে তন্ত্রসাধনা করছিল। আর তখনই মুখোমুখি আমাদের কমিউনিস্ট বাবুটির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ।

চোখে মুখে জল দিতে বাবুটি জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলে আমাদের সবাইকে দেখতে পেলেন। ঠোঁটের কোণে কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠল।

পরদিনই তিনি আমাদের সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে গেলেন।

সরোজদা থামলেন। আমি রুদ্ধশ্বাসে কাহিনিটি শুনছিলাম আর ভিতরে ভিতরে ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। বলার ব্যাঘাত হতে পারে ভেবে একটুও হাসিনি। আমি সরোজদাকে জিজ্ঞেস করলাম, কমিউনিস্ট বাবুটির নাম কি?

সরোজদা বললেন, তা আমি বলব না। আমি বলি আর তুমি চারদিকে চাউর করে দাও।

আমি বললাম, আপনি গল্পটি লিখে দিন। ছোটদের জন্য তো, একটু ঘুরিয়ে লিখে দেবেন। আমার মনে হয় লেখাটি একটু বড় হবে। আপনি 'শারদীয়া আগামী'তেই লিখে দিন।

সরোজদা রাজি হলেন। এবং কয়েকদিনের মধ্যে গল্পটি আমাকে দিয়ে দিলেন। সে বছরই 'শারদীয়া আগামী'তে প্রকাশিত হল সরোজ দত্ত'র 'নাকেশ্বরী'।

সরোজদার সঙ্গে আমার সম্পর্কের গভীরতা দিনে দিনে বেড়ে গেল। সরোজদা তখন শোভাবাজারে থাকতেন। দু'চারদিন সরোজদার সঙ্গে বাড়িতেও গিয়েছি। সরোজদা সাধারণত আমার সঙ্গে রাজনীতির খুব আলোচনা করতেন না। মনে হয় আমাকে খুব ছোট হিসেবে ভাবতেন।

কয়েকবছর 'কিশোরসভা' চালানোর পর আমার পক্ষে নিয়মিত সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সরোজ মুখোপাধ্যায় তখন 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক। আমি সরোজদাকে গিয়ে অসুবিধার কথা বললেও সরোজদা আমাকে ছাড়তে রাজি হলেন না। আমি তখন সরোজ দত্তকে ধরলাম। এই সরোজদা ওই সরোজদাকে রাজি করালেন। কিন্তু একটি শর্তে, আমাকে সপ্তাহে নিজের সময় মতো দু'তিনদিন করে আসতে হবে, এবং নতুন যে আসবে তাকে সাহায্য করতে হবে। তাতেই আমি রাজি। কোনোরকমে ছাড়া পেলে বাঁচি। ইতিমধ্যে দায়িত্ব গ্রহণের নতুন ব্যক্তির সন্ধান মিলল। কবি আবুল হুদাকে আমি আমার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলাম। ঢুকেছিলাম আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে আর ছাড়লাম পার্ক লেনে। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে 'স্বাধীনতা' পার্ক লেনে উঠে এসেছিল। তখন 'স্বাধীনতা' ছাপা হচ্ছে চীন থেকে আসা রোটারি মেশিনে। ঝকঝকে তকতকে 'স্বাধীনতা'র অফিস।

ইতিমধ্যে জল অনেক দূর গড়িয়ে গেল। মতবাদের যে লড়াই পার্টির ভেতরে চলছিল, তা ক্রমশ প্রকাশ্যে এসে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে শুরু হল চীন-ভারত যুদ্ধ। আমরা

একের কাছ থেকে অপরে ছিটকে যেতে লাগলাম। কমিউনিস্ট পার্টি দু-টুকরো হয়ে গেল। সরোজদা গেলেন সি.পি.এম-এ আর আমি থাকলাম সি.পি.আইয়ে। তবু সরোজদার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে আমার কোনো চিড় ধরল না। শুধু দেখা-সাক্ষাৎ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেল। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হল। নানা চক্রান্তের শিকার হয়ে কিছুকাল ক্ষমতাচ্যুত থেকে ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট দ্বিগুণ ক্ষমতাশালী হয়ে ফিরে এল। তখন শুরু হয়ে গেছে নতুনভাবে আবার মতবাদের লড়াই। নকশালবাড়ি আন্দোলন ও সি.পি.আই (এম. এল)-এর জন্ম হল। যে ঘরে বসে এখন আমি আমার জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করছি, সেখান থেকেই প্রকাশিত হল 'কালপুরুষ' পত্রিকা। র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাবের কর্ণধার বিমল মিত্র-ই ছিলেন 'কালপুরুষ' প্রকাশের অন্যতম উদ্যোগী। সি.পি.এম ছেড়ে সরোজদা সি.পিআই (এম. এল)-এ যোগ দিয়েছেন। বিমল মিত্রও তাই। সরোজদার মতো আমি বিমল মিত্রেরও স্নেহধন্য। কিছুদিনের মধ্যে বিমল মিত্র প্রমুখ অনেকেই গ্রেপ্তার হলেন। সরোজটা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে তিনি পরিচালনা করতে থাকেন 'দেশব্রতী' পত্রিকা। আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার আগে সরোজদার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাবে ঢুকিয়ে নিয়ে আড্ডাও মেরেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সরোজদা বা বিমলদা কেউই আমার সঙ্গে রাজনীতির কোনো আলোচনা করেননি। আমার উপর সরোজদাদের খুব রাগই থাকার কথা। কারণ সি.পি.আইয়ের মুখপত্র 'কালান্তর' আমার প্রেস থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। তখন অবশ্য 'সাপ্তাহিক কালান্তর', 'দৈনিক' হয়নি। আমার পটুয়াটোলা লেনের প্রেসে তখন ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ীদের প্রতিদিনের যাতায়াত। আমি সরোজদাদের বিরুদ্ধ মতবাদের একজন সক্রিয় কর্মী হওয়া সত্ত্বেও কেন যে আমাকে কিছু বলতেন না বা মুখ ঘুরিয়ে নিতেন না, সেকথা এখন ভাবলে আমার বিস্ময় জাগে। কেন আমাকে এত স্নেহ প্রীতি ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছিলেন।

পুলিশ সরোজদাকে বন্দি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সরোজদাকে বন্দি করে সেই রাত্রেই গোপনে গুলি করে হত্যা করা হয়—১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের গোড়ায়। সরোজদা-হত্যার খবর পাওয়ার পর দারুণভাবে ভেঙে পড়ি। কত রাত ঘুমোতে পারিনি। বারবার সরোজদার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

তারপর কতদিন চলে গেছে। বহমান সময়ের হাত ধরে আমি কত পথ হেঁটে এসেছি। কত স্বপ্ন দেয়ালে মাথা কুটে কুটে পাথরে পরিণত হয়েছে! কি নির্মম সময়ের মুখোমুখি আজ আমরা দাঁড়িয়েছি। ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্ষণিকের সুখ আনন্দ আজ আমাদের জীবনকে গ্রাস করেছে। তবু ক্ষণিকের জন্যে হলেও সরোজদার মতো আত্মত্যাগী, দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার মধুমাখা সান্নিধ্য-স্মৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় সতেজ মনে হচ্ছে। রাজনৈতিক-ভাবনায় সরোজদা আমার বিপরীত মেরুর, কিন্তু মানুষ হিসাবে সরোজদা আমার আদর্শ।

সমরেশ বসু

এক : গ্রেপ্তার-কাহিনি

সময় দ্রুত বহমান আমি জানি, কিন্তু মানতে পারি না। অতীতেও মানিনি, আজও মানি না। মানতে পারি না বলেই বারবার মনে হয় সকলেই আমার মাঝে আছেন, আর সবার মাঝে আমিও আছি। এই অনুভূতি বুকে বিঁধেই কাটছে আমার জীবন।

আজ যে ঘটনাটির কথা আমি বলতে বসেছি তার সূত্রপাত কিন্তু আমি কখনও করিনি। যিনি সূত্রপাত করেছিলেন তাঁর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার কথা আজ আমি বলছি। তিনি হলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব সমরেশ বসু। যাঁকে আমি পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই 'সমরেশদা' বলে ডেকেছি। কবে সেই ১৯৪৯-এ সমরেশদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আর সমরেশদা যখন চিরদিনের জন্যে আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন সেই পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক। তাঁর দুঃখের দিনে আমি তাঁর পাশে থেকেছি, সুখের দিনেও তিনি কখনও আমাকে সরিয়ে দেননি। তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘটনার আমি সাক্ষী। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের অনেক কাহিনিই কাছ থেকে দেখা অথবা তাঁর মুখ থেকে শোনা—সুখ দুঃখ প্রেম বিরহ ব্যথা বেদনা অনেক উপলব্ধি তিনি আমার কাছে খোলা মনে প্রকাশ করেছেন। সেসব কথা আমি কখনও বলিনি এবং আজ পরে বলব। আজ তাঁর বিচিত্র জীবনের একটি মাত্র ঘটনার কথা আমি বিশদভাবে বলছি, কারণ সমরেশদা নিজেই লিখিতভাবে আমার নাম জড়িয়ে দিয়েছেন। সমরেশদা যখন 'দেশ' পত্রিকার জন্য তাঁর 'কমিউনিস্ট জীবন' লেখাটি শেষ করেন তখন তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। আমিও সেখানে তাঁর পাশে উপস্থিত। ১৯৭১ সালে বিশ্ব গ্রন্থমেলা উপলক্ষ্যে আমরা দুজনেই সেখানে গিয়েছি। সেখানেই সমরেশদা তাঁর লেখাটির কথা আমাকে বললেন, তোমার আমার গ্রেপ্তারের ঘটনাটা আজ শেষ করলাম।

আমি হাসলাম।

সমরেশদা তাঁর চোখে-মুখে দুর্লভ সেই হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হাসছ কেন?

আমি বললাম, দিলেন তো আমাকে ফাঁসিয়ে। দেশে ফিরে এবার টেকাই দায় হবে। প্রশ্নে প্রশ্নে আমি জর্জরিত হয়ে উঠব।

সেদিন যে আশঙ্কার কথা সমরেশদার কাছে প্রকাশ করেছিলাম, দেশে ফিরে দেখলাম সমরেশদা রাতারাতি আমাকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন। আমাকে এভাবে ডোবানোর কথা সমরেশদার কাছে তুললে তিনি মৃদু মৃদু হাসতেন। যাক সেসব কথা, এখন মূল ঘটনায় আসি।

আমি তখন এক নম্বর কেস্তারডাইন লেনের বাসিন্দা। বৌবাজার ও সেন্ট্রাল

এভিনিউর সংযোগস্থলে। সেটি ছিল অঘোষিত পার্টি-কমিউন। বয়স তখন আঠারো। সিটি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। কিছুদিন হল দমদমে জেল খেটে মুক্ত হয়েছি।

আমাদের তিনতলার ঘরে পর পর আটটি বিছানা পেতে আমরা আটজন থাকতাম। আমার ঠিক পাশের বিছানা ছিল লক্ষ্মীদার। অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্ত ঘোষের। লক্ষ্মীদার পরে আর কোনো বিছানা ছিল না, যেহেতু লক্ষ্মীদার শোওয়া ছিল খুব খারাপ। ঘুমের ঘোরে লক্ষ্মীদার লাথি খাওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। লক্ষ্মীদার বাড়ি ছিল নৈহাটি। রাজনৈতিক কারণে লক্ষ্মীদা নৈহাটি না থেকে আমাদের এই কমিউনে থাকতেন। ডালহৌসি স্কোয়ারের কিলবার্ন কোম্পানিতে লক্ষ্মীদা চাকরি করতেন। একদিন রাত প্রায় ন'টা নাগাদ লক্ষ্মীদার কাছে নতুন এক আগন্তুক এসে উপস্থিত হলেন। বেঁটেখাটো চেহারা, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, অসাধারণ উজ্জ্বল চোখ, সব মিলিয়ে চোখে পড়বার মতো। ভদ্রলোকের মুখে মৃদু হাসি লেগে ছিল। লক্ষ্মীদা আমার এবং অন্যদের সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অন্যেরা সেই নামের সঙ্গে তেমন পরিচিত না থাকলেও আমি পরিচিত ছিলাম। তাই লক্ষ্মীদা যখন বললেন এর নাম 'সমরেশ বসু' তখন আমি চমকে উঠলাম। সাহিত্য আমি যে ঠিক করি তা নয়, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাতে এই কারণেই সমস্ত বাধা নিষেধ ভুলে আমি ছুটে গিয়েছিলাম। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত সমরেশ বসুর 'আদাব' আমার পড়া। সেই সমরেশ বসু আমার বিছানায় বসে। এতে আমার রোমাঞ্চিত হওয়া তো স্বাভাবিক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমরেশ বসু আমার কাছে সমরেশদাতে পরিণত হলেন। কথায় কথায় জানা গেল রাতে সমরেশদার কিছুই খাওয়া হয়নি। অতরাত্রে ওই পাড়ায় খাবার পাওয়া কঠিন না হলেও সমরেশদাকে বাইরে খেতে নিয়ে যাওয়া আমাদের কারোরই নিরাপদ বলে মনে হল না। লক্ষ্মীদার চেহারাটা ছিল সাদাসিধে ধরনের। লক্ষ্মীদা একাই বেরিয়ে মোড়ের পাঞ্জাবি দোকান থেকে রুটি আর তরকা কিনে আনলেন। সমরেশদাকে আমাদের কারোরই খাওয়াবার কোনো উপায় ছিল না। কারণ প্রায় আধঘণ্টা আগে আমাদের সকলেরই খাওয়া শেষ। আমি চারতলায় উঠে থালা-গেলাস নিয়ে এলাম। পরম তৃপ্তি সহকারে সমরেশদা রাত্তিরের খাওয়া সারলেন। আমি বাসন তুলতে গেলে জোর করে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেই চারতলায় রেখে এলেন। কিছুই চেনেন না তাই আমিও সমরেশদার সঙ্গে চারতলায় গেলাম। এবং ছাদের কোণায় রাখা জলের ট্যাঙ্ক দেখিয়ে দিলাম। ওই ট্যাঙ্কে একটি কল লাগানো ছিল আর তাতেই আমরা হাতমুখ ধুতাম। সমরেশদা ভালভাবে হাতমুখ ধুয়ে আমার সঙ্গে নীচে নেমে এলেন। ঠিক হল, আমার আর লক্ষ্মীদার বিছানা জুড়ে নিয়ে আমরা তিনজনে একসঙ্গে শোব।

সমরেশদাকে লক্ষ্মীদা একটি লুঙ্গি দিলেন। সমরেশদা ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে বেশ

স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। আমরা তিনজনেই আধ-শোয়া অবস্থায় নানারকম গল্প-গুজব শুরু করলাম। সমরেশদার কাছে লক্ষ্মীদা ততক্ষণে আমার আসল পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন। নৈহাটি পার্টি সম্পর্কে নীচু গলায় লক্ষ্মীদার কাছে সমরেশদা নানারকম অভিযোগ উথাপন করছিলেন। আমি না শোনার ভান করে পাশ ফিরে শুলাম। কিন্তু কান খাড়া থাকল। সমরেশদার অভিযোগ ছিল, তাঁকে ইচ্ছা করে দিনের পর দিন বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্মীদা সমরেশদাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। আর সমরেশদা ততই বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। মনে হচ্ছিল, যেভাবে সমরেশদা তাঁর কথাগুলি পেশ করছিলেন, তার মধ্যে যুক্তিই বেশি। আমার মনে হল সমরেশদাকে সমর্থন করা উচিত। আমি অপরদিকে পাশ ফিরে বললাম, আমার মনে হচ্ছে সমরেশদা আপনি ঠিকই বলছেন। লক্ষ্মীদা অহেতুক স্তোকবাক্য দিচ্ছেন। লক্ষ্মীদার স্বভাব আমি জানতাম। সবসময় সংঘর্ষকে এড়িয়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা। আমার সমর্থনে সমরেশদা খুব খুশি হলেন। বললেন, লক্ষ্মী দেখ, প্রসূনও আমাকে সমর্থন করছে। লক্ষ্মীদা আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, বেশ রাত হল, এবার ঘুমিয়ে পড়া যাক। ঘরের অন্য সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনোরকম ব্যাঘ্যাত যাতে না হয় তার জন্যে আমরা আলো নিভিয়ে কথা বলছি। তারপর তিনজনেই চুপচাপ। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

বিকট চিৎকারে হঠাৎ আমাদের সকলের ঘুম ভেঙে গেল। নীচে বাইরের দরজায় বুটের আঘাত। সবাই প্রায় একসঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে বাইরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি কয়েকজন পুলিশ নীচের মূল দরজায় লাথি মারছে আর দরজা খোলার জন্য হাঁক-ডাক করছে। নীচে কারখানায় যে কর্মীরা থাকে তারা আমাদের চিনত, জানত আমরা বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির লোক। তাদের যে ঘুম ভাঙেনি তা নয়। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে দরজা খুলছে যাতে আমাদের কাছে বে-আইনি কিছু থাকলে আমরা সরিয়ে ফেলার সুযোগ পাই। সকলের কাছে না থাকলেও তুষারদা, লক্ষ্মীদা, সমরেশদা এবং আমার কাছে কিছু বে-আইনি কাগজপত্র ছিল। আমাদের ঘরে ঢুকবার আগেই বাঁ হাতে টয়লেট। আমরা দ্রুত কাগজ একসঙ্গে জড়ো করে টয়লেটের প্যানের ভেতর ঢুকিয়ে আমার পড়ার স্কেল দিয়ে যতটা সম্ভব চেপে জল ঢেলে দিয়েছিলাম। তারপরে সেগুলির কী যে অবস্থা হয়েছিল কে জানে! সেগুলি দেখবার আর কোনো সুযোগ আমাদের হয়নি। নিমেষের মধ্যে ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে মটকা মেরে ঘুমের ভান করেছিলাম। পুলিশ সন্দেহ করতে পারে ভেবে আমরা ঘরের আলো একবারের জন্যও জ্বালিনি। পুলিশ যে আমাদের ঘরের দিকেই আসছে কিছুটা সন্দেহ করলেও আমি সম্পূর্ণ অনুমান করতে পারিনি। আমরা শুয়ে শুয়ে সিঁড়িতে বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। শব্দ ক্রমশ আমাদের ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। তারপর শব্দ থেমে গিয়ে দরজায় বুটের লাথি। এই আস্তানায় তুষারদাই ছিলেন আমাদের প্রধান নেতা।

তুষারদা অর্থাৎ তুষার চক্রবর্তী, পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। তিনি উঠে গিয়ে দরজার খিল খুলে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঠেলায় তুষারদাকে পাশে ফেলে দিয়ে ঘরের মাঝে ঢুকে পড়ল চার-পাঁচজন পুলিশ। নেতৃত্বে একজন অফিসার। অফিসারটির হাতের রিভলবার তাক করে ধরা। পুলিশগুলোর কাঁধে রাইফেল ঝোলানো। আমরা সকলেই তখন উঠে বিছানায় বসে। পুলিশ অফিসারটি পা দিয়ে দিয়ে আমাদের পাতানো বিছানাগুলি লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছিল। আমরা কেউ কোনো কথা বলিনি। তুষারদা কিছু বলবার চেষ্টা করতেই পুলিশ অফিসারটি কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠল। তারপর সার্চ করার নামে আমাদের গোছানো ঘরটিকে তছনছ করে দেওয়া হল। সার্চ সমাপ্ত। কী যে সার্চ করতে চেয়েছিল তা পুলিশই জানে। তাড়াতাড়িতে সরাতে গিয়ে আমার পড়ার বইয়ের মাঝে লুকিয়ে থাকা বেশ কিছু কাগজপত্র আমি সরাতে ভুলে গিয়েছিলাম। পুলিশের বুদ্ধির যা দৌড়—সবকিছু তছনছ করলেও বইগুলি ছুঁয়ে দেখল না। ছুঁলে এমন কিছু কাগজপত্র তার হাতে এসে যেত, তার ফলে ভবিষ্যতে কপালে প্রমোশন জুটবার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। বেচারা পুলিশ অফিসার!

আমরা ভাবলাম এখানেই শেষ। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম এটা শেষ নয়, শুরু। আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলা হল, জামা কাপড় পরে নাও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই। আমি নিরীহ বালকের মতো জামা কাপড় পাল্টে বললাম, চলুন। ঘরের মাঝে বয়সে আমি সবচেয়ে ছোট। বড়দের চোখ তাই ছলছল করছিল। সমরেশদা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমাকে নিয়ে তিনতলা থেকে দোতলায় পৌছেই পুলিশ অফিসারটি থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন ভেবে আবার উপরে উঠে গেলেন। রাইফেলধারী সিপাইরা আমাকে ঘিরে দোতলার বারান্দায় পুতুলের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সামান্য কয়েক মুহূর্ত সময়। তারপরেই শুনি বুটের শব্দ নীচের দিকে নেমে আসছে। আমি পিছু ফিরে অবাক। সামনে সমরেশ বসু পেছনে পুলিশ অফিসার। হাতের মাঝে তখনও রিভলবার তাক করা। সমরেশদার পরনে সেই গতরাতের ধুতি-পাঞ্জাবি। আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুললেন। আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে তারপর পুলিশ বাহিনী হাঁটাপথে বৌবাজার থানার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। পিছু ফিরে আমরা দুজনেই তিনতলার জানলার দিকে তাকালাম। সকলেই হাত নাড়িয়ে আমাদের বিদায় সংবর্ধনা জানাচ্ছে। সমরেশ বসু আর আমি এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে। নিস্তব্ধ রাত, সারা কলকাতা শহর বোধহয় ঘুমুচ্ছে। আকাশের দিকে তাকালাম। ভোর হতে বোধহয় এখনো অনেক বাকি। নক্ষত্রগুলি জ্বলজ্বল করছে। মনে হতে লাগল এখনি বোধহয় শিউলি ফুলের মতো আমাদেব মাথায় ঝরঝর করে ঝরে পড়বে।

সামান্য পথ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা বৌবাজার থানায় পৌঁছে গেলাম। একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে আর সমরেশদাকে পাশাপাশি বসানো হল। তারপর যে অফিসারটি সজ্জিত বাহিনী নিয়ে আমাদের গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিলেন, তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সিপাহীরাও কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। ঘরের মাঝে আমি আর সমরেশদা—মাত্র দুজন। গ্রেপ্তারের জন্য আমাদের কারোর যে খুব একটা অনুশোচনা ছিল বলে মনে হয় না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার ভূমিকা পুলিশ জানতে পেরেছে। যে কোনোভাবেই হোক নিশ্চিত না হয়ে তারা আসেনি। না হলে আর যাওয়ার সময় একমাত্র আমাকে ধরে নিয়ে নেমে যেত না। সমরেশদা সম্পর্কে প্রথমে হয়তো তাদের সংশয় ছিল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে সেই সংশয় দূর করে সমরেশদাকেও তারা ধরে নিয়ে এল।

থানায় কোনোরকম রাজনীতির আলোচনা আমরা করিনি। আমি সমরেশদার কাছে লেখার কথা জানতে চাইছিলাম। এবং সমরেশদা আমাকে 'আদাব' গল্প লেখার কাহিনি শোনাচ্ছিলেন। রাজনীতির চেয়ে সাহিত্যের প্রতি সমরেশদার ঝোঁক যে অনেক বেশি সেদিন সেকথা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা পরস্পর নিজেদের জীবনকথা জানতে চাইছিলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যে দুজনে নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে গেলাম। বিপদে মানুষ অনেক কাছাকাছি হয়। তাই আমিও হয়ে গেলাম সমরেশদার কাছের মানুষ। সমরেশদার সঙ্গে আমার এই কাছের মানুষের সম্পর্ক তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। গল্প করতে করতে রাত ফুরিয়ে ভোরের আলো যে ফুটে উঠেছে তা আমরা খেয়ালই করিনি। থানায় যে ঘরে আমাদের বসানো হয়েছিল, সে ঘরটি ছিল অসম্ভব নোংরা। ঘরে অসংখ্য র‍্যাক, র‍্যাকভর্তি রাশিরাশি ফাইল, কালো ঝুল আর ধুলোয় ভরা ফাইলগুলিতে কখনো হাত পড়ে বলে মনে হয় না। ভোর হওয়ার পরে আমাদের বাথরুমে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। আমরা হাত মুখ রুমালে মুছে আবার চেয়ারে বসলাম। এবার অন্য এক পুলিশ অফিসার দুইটি সাদা কাগজ ও কলম আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আপনারা কিছুটা ইংরেজিতে কিছুটা বাংলায় যা মনে আসে তাই লিখে আমাকে ফেরত দিন। কি কি লিখব আমি যখন ভাবছি তখন দেখতে পেলাম সমরেশদা কাগজে খস খস করে কী সব লেখা শুরু করেছেন। ভাবলাম, সমরেশদা তো লেখক তাই যা খুশি লেখা তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন নয়। কিন্তু আমি তো আর সমরেশ বসু নই। আমি কিছু লিখছি না দেখে, তাঁর লেখা কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে সমরেশদা বললেন, এই জাতীয় কিছু-না-কিছু লিখে দাও। ইংরেজি আমরা ভাল জানি না, তাই শুধু নামটি লিখে দেব। সমরেশদার লেখা দেখে আমি হতবাক! আমার সমস্ত চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। লজ্জা পেলেও প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছিল আমার। ভাগ্যিস, কাগজ কলম ধরিয়ে অফিসারটি বাইরে বেরিয়ে গেছেন। হাসতে হাসতে বললাম, এসব যাচ্ছেতাই কী সব লিখেছেন সমরেশদা? ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা

টেনে সমরেশদা বললেন, শুনলে না, ব্যাটাচ্ছেলে তো বলে গেল যা মনে আসে তাই লিখে দিন। আমি তো ব্যাটার কথা রেখেছি। আমার মনে যা আসছে তাই লিখেছি। এই পরিবেশে এসব ছাড়া আর কোনো কথা মনে আসে? তুমিও ভেবে ভেবে এইরকম কিছু লিখে দাও।

আমি বললাম, সমরেশদা আমাকে মেরে ফেললেও আমি এর একটি শব্দও লিখতে পারব না।

ঠোঁটের কোণে সেই মায়াবী হাসি ফুটিয়ে সমরেশদা বললেন, তাহলে কি তুমি আসন্ন বিপ্লবের কথা লিখবে? আর সেই কাগজ ওদের ওই সব নোংরা ফাইলে লটকানো থাকবে?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, না তা ঠিক নয়।

সমরেশদা বললেন, তাহলে তুমি জমিয়ে একটা প্রেমপত্র লেখ। চোখ কান বুজে মাঝখানে আমার মতো দু-একটি শব্দ গুঁজে দিও। আমি কিছু জবাব দেওয়ার আগেই কাগজ কলম বিলি করা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন আর বললেন, কই লেখা হয়েছে তো!

আমার পেট ফেটে হাসি বেরিয়ে আসছিল। সমরেশদা গম্ভীর মুখে তাঁর হাতে কাগজখানি ধরিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক কাগজখানি হাতে নিয়ে লেখায় চোখ রেখে পাথরের মূর্তির মতো কিছুক্ষণ কেমন যেন থ' হয়ে রইলেন। তারপর গম্ভীরমুখে এবং কড়া চোখে সমরেশদার দিকে তাকিয়ে বললেন, এসব আপনি কী লিখেছেন? এই লেখা ফাইলে রাখা যায়? আপনাদের হাতের লেখা তো আমাদের ফাইলে রাখার কথা। আপনি অন্য কিছু লিখুন।

সমরেশদা একটুও হাসলেন না—বললেন, আপনিই তো বলে গেলেন যা মনে আসে তাই লিখুন। আমার মনে এসব কথা এলে আমি কী করব? আমি যতই ভাববার চেষ্টা করছি, ততই আমার মনে নতুন নতুন এইসব শব্দ ভেসে আসছে। এছাড়া তো আর কিছু আমি লিখতে পারব না। মনকে তো আর আমি ফাঁকি দিতে পারি না।

আশ্চর্যের ব্যাপার ভদ্রলোক কাগজখানা ছিঁড়লেন না, গুটিয়ে ফেললেন না। কাগজখানা হাতে নিয়ে হন হন করে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তারপর পাশের ঘর থেকে আমরা অট্টহাসির আওয়াজ শুনতে পেলাম। সমরেশদা হেসে বললেন, ব্যাটার খুব মনে ধরেছে। সবাইকে পড়ে শোনাচ্ছে আর তার হাসির আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছি। সমরেশদার লেখা ওই কাগজে যতগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল, একটি শব্দও অশ্লীল ছাড়া শ্লীল ছিল না। সমরেশদা নৈহাটির লোক, কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গেই তাঁর জীবন কাটে—তাই তাঁর অশ্লীল শব্দের সীমাহীন ভাণ্ডার।

আমি কিছু না লিখে সাদা কাগজ নিয়ে চুপচাপ বসে আছি দেখে সমরেশদা বললেন, প্রেমপত্র লেখা তোমার দ্বারা হবে না। তোমার মুখে কিছু উচ্চারণ করতে হবে না।

আমার স্টকে আরও অনেক শব্দ আছে। আমি বলছি তুমি লিখে নাও। দেখি ব্যাটারা কাগজ দু'খানি ফাইলে রাখে কি করে!

আমি পারি নি। সমরেশদা যতবার নানা জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করছিলেন, ততবারই আমি লজ্জায় লাল হয়ে হেসে ফেলছিলাম। বাধ্য হয়ে সমস্ত কাগজ ভর্তি নিজের নাম লিখে পুলিশকে জমা দিয়েছিলাম। কোথাও কোনো ফাঁক রাখিনি। পুলিশকে বিশ্বাস নেই। স্বাক্ষরের উপরে যা খুশি তাই লিখে দিতে পারে। আমি জানি না অশ্লীল শব্দ ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ সমরেশদার সেই কাগজ নিয়ে পুলিশ কী করেছিল।

সঠিক সময় মনে না পড়লেও যতদূর মনে পড়ছে, তখন বোধহয় সকাল ন'টা হবে। ইতিমধ্যে দু-একবার বাথরুমে গিয়ে আর গল্পগুজব করে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছিল। আমাদের নিয়ে পুলিশ যে কী করতে চায় তা আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ইতিমধ্যে আমাদের অবশ্য চা-বিস্কুট এনে খাওয়ানো হয়েছে। তার বেশি কিছু নয়। খুব যে একটা খিদে পাচ্ছিল তা নয়। মনের মাঝে উত্তেজনা থাকলে খাওয়ার বোধহয় খুব একটা ইচ্ছে থাকে না। আমরা চুপচাপ বসে আছি, এমন সময় একজন সিপাই এসে আমাদের অন্য একটি ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে ঢোকার আগেই নেমপ্লেট দেখে বুঝলাম থানার বড়বাবুর চেম্বারে আমরা ঢুকছি। প্রয়োজনে শুয়ে ঘুমিয়ে নেওয়া যায় এমন একটি টেবিলের ওপাশে গম্ভীর মুখে বসে থাকা ভদ্রলোককে সিপাইজি সেলাম ঠুকতেই বুঝলাম ইনিই বড়বাবু। একটি আশ্চর্যরকমের চেহারা ওই ভদ্রলোকের। প্রচণ্ড মোটা, গায়ের রং কুচকুচে কালো। মাথায় বিশাল টাক। নাকটা এত চ্যাপ্টা যে দুটো ফুটো না থাকলে নাক বলে বোঝাই যেত না। দুটি গোল চোখের উপরে আধখানা করে ভুরু। সকলের মতো একভাগ নয়, দুটি কানই দুইভাগ করা। এমন বিস্ময়কর কান জীবনে আমি কখনো দেখিনি। হাতে সোনা রঙের ঘড়ি ও ব্যান্ড। চোখে সোনালি চশমা। ভদ্রলোক একবার সামান্য চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকালেন, কিন্তু বসতে বললেন না। অথচ টেবিলের এপাশে বসার খানদশেক চেয়ার পাতা। আমরা আর ভদ্রতার ধার না ধরে দুটি চেয়ার সরিয়ে দুজনে পাশাপাশি বসে পড়লাম। ভদ্রলোকের টেবিলের দুইপাশে অসংখ্য ফাইল ও কাগজপত্র জমানো। সামনে কিছু কাগজপত্র পেপারওয়েট দিয়ে চাপা। ভদ্রলোক আর একবার সামান্য চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকালেন। বুঝতে পারলাম তাঁর অনুমতি ছাড়া বসাতে উনি খুবই বিরক্ত হয়েছেন। এটা অবশ্য আমাদের অনুমান। কারণ ভদ্রলোকের বিদঘুটে সারা মুখ জুড়ে এমনই বিরক্তি ছড়ানো যে নতুন করে বিরক্তি বোঝা বড় কঠিন।

নিশ্চুপ হয়ে তাঁর সামনে আমরা বসে আছি। ভদ্রলোক একটিও কথা বলছেন না। তাঁর সামনে রাখা কাগজগুলোর উপর শুধু চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন। পাশে পুতুলের মতো সিপাইটি দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্যরকম নিস্তব্ধতা। সমরেশদা আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, আমিও তাঁর দিকে তাকাচ্ছি। দুজনেরই দুজনকে দেখে মনে হচ্ছিল হাসি

চাপতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আকস্মিকভাবে বড়বাবু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন এবং হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, এর মানে কি? আপনারা দুজন তো দাগী খুনির অধম। কতগুলো খুন করেছেন এতদিনে? করাচ্ছি রাজনীতি। খুনে, ডাকাত। দেখে তো মনে হয় দুটি নিরীহ গোবেচারা ছেলে। ভাজামাছ উল্টে খেতে পারেন না। এক নিঃশ্বাসে কথাকটি বলে তিনি কলিং বেলে দড়াম করে একটি থাপ্পড় মারলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-ছ'জন লোক ঘরের মধ্যে ছুটে এল। আমরা দুজনে কেমন বোকা হয়ে গেলাম। কিছুই বুঝতে পারছি না, কেন যে বড়বাবু অত চটে গেলেন। পাশে দাঁড়িয়ে থেকে প্রায় ঘুমিয়ে পড়া সিপাইটি তখন ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। ধুতি শার্ট পরা এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে স্যার?

বড়বাবু তখনও দাঁড়িয়ে। রাগে থরথর করে কাঁপছেন। চিৎকার করে জবাব দিলেন, গারদে না ঢুকিয়ে এদের বাইরে রাখা হয়েছে কেন? জানেন এরা কারা?

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন স্যার?

বড়বাবু বললেন, কারা তা এখনো জানি না। সে জানবে জানার যারা কর্তা তারা। এরা একটা রিভলবার ও চারটে রাইফেল সহ ধরা পড়েছে।

আমরা দুজনেই হতবাক, এ কি কথা! এই ভয়ঙ্কর চার্জ কি এরা আমাদের দুজনের বিরুদ্ধে দিচ্ছে? একটা রিভলবার ও চারটি রাইফেল সহ আমরা দুজন নিরীহ ভদ্রলোক চেহারার মানুষ ধরা পড়েছি শুনে সবাই বিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকালেন। পাথরের মতো আমরা দুজনে নিশ্চল। নিষ্পলক নেত্রে ঘুরন্ত ফ্যানের দিকে তাকিয়ে আছি। এতক্ষণে বড়বাবু চেয়ারে বসেছেন। এবার কণ্ঠস্বর একটু নরম ও স্বাভাবিক। জিজ্ঞাসা করলেন, আই. ও. কখন আসবেন বলে গিয়েছেন। একজন সিপাই জবাব দিল, এখুনি ফিরবেন বলেছেন। সিপাইটি আর কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার মধ্যে রিভলবার উঁচিয়ে যে ভদ্রলোক আমাদের গ্রেপ্তার করে এনেছেন, তিনি ঘরে ঢুকলেন। ঘরে এত লোকের ভিড় এবং সামনের চেয়ারে আমাদের বসা দেখে ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন আমাদের নিয়েই কিছু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোনো কথা না বলে তিনি বড়বাবুর কাছে এগিয়ে গেলেন। খুব শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো সমস্যা হয়েছে কি স্যার?

বড়বাবু বললেন, এদের গারদে ভরা হয়নি কেন?

অফিসারটি বললেন, গারদে ঢোকানোর কোনো কারণ তো ঘটেনি স্যার। সেরকম হলে আপনি না আসা পর্যন্ত কী আমি থানা ছেড়ে বেরুতাম!

বড়বাবু গম্ভীর মুখে বললেন, চারটে রাইফেল আর একটা রিভলবার নিয়ে ধরা পড়া কি বড় কোনো কারণ নয়?

আমাদের দুই জোড়া চোখের দৃষ্টি অফিসার ভদ্রলোকের মুখের প্রতি নিবদ্ধ। মুখ দেখে বুঝতে পারলাম, তিনিও আমাদের মতো হতবাক।

বড়বাবুর সামনে রাখা কাগজগুলি 'একটু নিচ্ছি স্যার' বলে, তাতে চোখ বোলাতে

বোলাতে অফিসার ভদ্রলোকটিও যে হাসি চাপার চেষ্টা করছেন তা লক্ষ করলাম। কাগজগুলি আস্তে আস্তে বড়বাবুর টেবিলের সামনে চাপা দিয়ে রেখে তিনি ধীর গলায় বললেন, আপনি একটু ভুল বুঝেছেন স্যার। এই দুজনকে ধরতে আমি থানা থেকে চারটে রাইফেল ও একটি রিভলবার নিয়ে গিয়েছিলাম এবং ফিরে এসে জমা দিয়েছি, রিপোর্টে সেই কথাই লেখা আছে।

ঘরের সকলেই অভিনেতা, আমরা দুজনেই শুধু নীরব দর্শক। আমার ও সমরেশদার চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর বোধহয় কোনো ভূমিকা ছিল না। হাজার হোক থানার বড়বাবু তো! ভুল স্বীকার করা কি তার সাজে? কোন জাতের ইংরাজিতে রিপোর্ট লেখা ছিল তা তো আর আমরা জানি না। অভিনয়ের মাঝে আমরা শুধু দেখতে পেলাম যে অস্ত্র নিয়ে আমাদের ধরতে যাওয়া হল, বড়বাবুর ব্যাখ্যায় সেই অস্ত্রগুলিই নাকি আমাদের কাছে পাওয়া গিয়েছে। তাজ্জব পুলিশ, তাজ্জব পুলিশি ইংরাজি, তাজ্জব বউবাজার থানার আশ্চর্য চেহারার বড়বাবু মানুষটি।

আমাদের দুজনকে নিমেষের মধ্যে সরিয়ে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। দুজনেরই পেট ফেটে হাসি বেরিয়ে আসছে। শব্দ করে হাসবার উপায় নেই। তাহলে কপালে আবার কী বিড়ম্বনা আছে কে জানে!

হাসি সংবরণ করে সমরেশদা আস্তে আস্তে বললেন, জীবনে সুযোগ পেলে এই বিচিত্র বড়বাবুটিকে নিয়ে আমি একটি লেখা লিখব। আমার কেবল এই ভদ্রলোকের বউকে দেখতে ইচ্ছে করছে। এই মানুষটির সঙ্গে সে জীবন কাটায় কী করে!

সমরেশদা এমন কোনো উপন্যাস লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। পরবর্তীকালে ঘটনাটির কথা আমারও মনে পড়েনি। তাহলে থানার সেই প্রতিশ্রুতির কথা নিশ্চয় সমরেশদাকে মনে করিয়ে দিতাম।

যে-ভদ্রলোক মাঝরাতে কেন্ডারডাইন লেন থেকে আমাদের তুলে এনেছিলেন, সেই মুহূর্তে তাঁকে আমার ভীষণ নির্মম এবং কঠোর বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্মম পুলিশ অফিসারটি যখন আমাদের দুজনের জন্যে নিজহাতে করে দুই প্লেট খাবার নিয়ে এলেন, তখন আমরা দুজনেই বিস্মিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। এখন এই পুলিশের অন্য এক চেহারা। মিষ্টি গলায় বললেন, রাতদুপুর থেকে ঘুম হয়নি, সকাল থেকে ঠিকমতো খাওয়াও হয়নি, আমাকে ভুল বুঝবেন না, খেয়ে নিন। তখন তাঁকে আমার পুলিশ না ভেবে 'আশ্চর্য মানুষ' বলে মনে হয়েছিল। পুলিশকে কখনোই আমার মানুষ হিসেবে ভাবতে ভাল লাগে না।

সত্যিই আমাদের দুজনের খুব খিদে পেয়েছিল। দেখলাম ভরা প্লেটে নিমকি, সিঙাড়া আর রসগোল্লা। একজন সিপাই অতি যত্ন সহকারে দুই গ্লাস জলও দিয়ে গেল। কোনো কথা না বলে আমরা খাওয়া শুরু করলাম। আপনিও নিন, বলে সমরেশদা তাঁর দিকে প্লেটটা এগিয়ে দিলেন। তিনি নিঃসংকোচে একটি নিমকি তুলে নিয়ে প্লেটটি আবার

সমরেশদার দিকে ঠেলে দিলেন। আমিও সমরেশদার মতো ভদ্রতা দেখাতে গেলে, অফিসারটি বললেন, থাক, আপনি খুবই ছেলেমানুষ, সবটাই খেয়ে নিন। আমি আর কোনো কথা না বলে, সব খাবারই খেয়ে নিলাম। 'আমি আসছি' বলে ভদ্রলোক উঠে গেলেন।

সমরেশদা বললেন, পুলিশের এত জামাই আদর, ব্যাপার কী বলো তো? তোমার তো আগের অভিজ্ঞতা আছে। কিছু ধরতে পারছ?

আমি বললাম, ঠিক বুঝতে পারছি না। মারধর করবে না তো! বলির আগে পাঁঠাকে খাওয়ানোর মতো ব্যবস্থা করেছে কি না কে জানে!

—কেন তোমাকে আগের বারে এমন করেছিল না কি?

আমি হেসে বললাম, এ রকম না হলেও কাছাকাছি। থাপ্পড় মেরে চেয়ারসুদ্ধ ফেলে দিয়ে সান্ত্বনার জন্য খাবার এনে দিয়েছিল।

সমরেশদা বললেন, এরা বোধহয় একটু বেশি ঘুঘু। তাই আগে থাকতেই গায়ে হাত বুলিয়ে একটু নরম করে নিচ্ছে।

আমি হেসে ফেললাম। আমাদের কথোপকথনের মাঝে পুলিশ অফিসারটি ফিরে এলেন। তারপর দাঁড়ানো অবস্থাতেই বললেন, আমার দায়িত্ব শেষ। এবার আপনাদের আসল জায়গায় পাঠানো হবে। আসল জায়গা বলতে উনি যে কী বোঝাতে চাইছেন তা আমরা দুজনে কেউই বুঝতে পারলাম না।

আমি বললাম, কোথায় পাঠাচ্ছেন আমাদের? কোনো জেলে?

অফিসারটি বললেন, না, না জেলে পাঠাবার আমরা কি মালিক? আপনাদের এস. বি. অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরই নির্দেশে আপনাদের আমরা ধরে এনেছি। যা কিছু করার তারা করবে। প্রথমবার ধরা পড়ার সময় আমাকে এস. বি. অফিসে যেতে হয়নি। এবার যখন যেতে হচ্ছে তখন বুঝতে পারলাম, প্রথমবারের চেয়ে এবারের অপরাধ আরও গুরুতর।

সমরেশদা কোনো কথা বলছিলেন না, চুপচাপ শুনছিলেন। আমার মনে হল ব্যাপারটা একটু বুঝে নিতে চাইছেন।

তারপরে দেখতে পেলাম রাইফেল কাঁধে সিপাই এসে ঘরে ঢুকে আমাদের দুই পাশে দাঁড়ালো। কোমরে রিভলবার গোঁজা, ধবধবে সাদা পোশাকে একজন অফিসার ঘরে ঢুকে আমাদের উঠতে বললেন। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম। প্রথমে পুলিশ অফিসার তারপর রাইফেল কাঁধে দু'জন সিপাই, তার পিছনে আমরা দু'জন, আবার আমাদের পিছনে রাইফেলধারী বাকি দু'জন সিপাই। এই অবস্থায় আমরা বউবাজার থানার বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখন কর্মব্যস্ত কলকাতা, ব্যস্ত পায়ে সকলেই কর্মস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রচণ্ড রোদ্দুর, আলোয় চোখ ঝলসে যায়। তবু স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে, মুক্ত আকাশের নীচে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে

অসম্ভব তৃপ্তি অনুভব করতে লাগলাম। সামনে দেখলাম একটি জীপ দাঁড়িয়ে আছে। রাইফেলধারী পুলিশগুলি জীপের পিছনের সিটে উঠে গেল। আমাদের দু'জনকে সামনে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে অফিসারটি বামপাশে বসলেন। আড়চোখে দেখলাম, রিভলবারটি এবার আর কোমরে নয়, তাঁর ডানহাতের মাঝে ধরা। নিজেদের দারুণ বীর বলে মনে হল। আমার আর সমরেশদার মতন দু'জন নিরীহ চেহারার মানুষকে নিয়ে যাওয়ার কি অসাধারণ আয়োজন।

সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে হু হু করে জীপ ছুটে চলছিল, চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রিট ছাড়িয়ে বাঁদিকে জীপ ঘুরে গেল। নিমেষের মধ্যে জীপটি এসে থামল পুরোপুরি সাহেব পাড়া— লর্ড সিনহা রোডে। লর্ড সিনহা রোডে পাশাপাশি যে আই. বি—এস.বি-র অফিস তা আমি আগেই জানতাম। রাজনৈতিক বন্দিদের সব পুলিশ রেকর্ডপত্র এখানেই থাকে। তাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে তাদের প্রতি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের সকলরকম ব্যবস্থা এখানে আছে। এখানকার অফিসারেরা অনেক বেশি পাকাপোক্ত, সামনাসামনি খুবই নিরীহ-ভদ্র। তাদের আসল রূপ তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে বুঝবার ক্ষমতা বোধহয় কারোর নেই। জীপ থেকে নামিয়ে এক ভদ্রলোকের হাতে কিছু কাগজ ধরিয়ে এবং আমাদের দুজনকে হস্তান্তর করে, বৌবাজার থানার অফিসারটি চলে গেলেন। আমরা দুজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ঠিক থানা থানা চেহারা নয়, যে কোনো সরকারি অফিস বলে মনে হতেই পারে। কারোরই পরনে পুলিশি পোশাক নয়। তবে সকলের শরীরের মাঝে লুকানো আছে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র।

চোদ্দ নম্বর বাড়িতে ঢুকবার সামনেই বারান্দা। বারান্দার বাঁদিকের ঘরে আমাদের দু'জনকে বসানো হল। আমরা দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

আমি বললাম, সমরেশদা এবার বোধহয় আমাদের দুজনকে আলাদা করে ফেলবে। আমাদের একসঙ্গে থাকার পালা শেষ হল মনে হচ্ছে। সমরেশদা যে ক্রমশ চিন্তিত হয়ে উঠছেন, তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। এমনিভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল, দুজনে চুপচাপ বসে আছি। কেউই বিশেষ কথা বলছি না। সত্যিই আমরা বিভ্রান্ত। আমার আগে জেলের অভিজ্ঞতা থাকলেও এখানকার কোনো অভিজ্ঞতা তো নেই। আর সমরেশদার এটাই তো প্রথম গ্রেপ্তার হওয়া।

আমি যখন এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু বুঝবার চেষ্টা করছিলাম, হঠাৎ লক্ষ করি সমরেশদা অপলক নেত্রে সামনের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। আমাকে ঠেলা দিয়ে বললেন, সামনের দিকে তাকাও, এ দৃশ্য জীবনে দেখতে পাবে না।

সত্যি কথাই বটে, বন্দি অবস্থায় বলি হওয়ার আগে এমন রসময় দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য ক'জনের কপালে জোটে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আমাদের বসবার ঘরের ঠিক বিপরীতে অন্য একটি বিশাল বাড়ির স্নানঘর, বাগানের গাছের ফাঁক দিয়ে

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাথরুমের জানালা খোলা। একটি অসাধারণ সুন্দরী তরুণী একে একে তার পোশাকের আবরণ খুলে ফেলছে। স্নানের শাওয়ার খোলা। বিশাল জানালার অর্ধাংশ ঢাকা, উপরের অর্ধাংশ খোলা। আমরা দুজন প্রাণ ভরে সুন্দরী ও ধনী রমণীর দেহের উর্ধ্বাংশ অবলোকন করে এত ক্লান্তিতেও রসধারায় আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম— তবে তা ক্ষণিকের জন্য। ভদ্রমহিলার হঠাৎ বোধহয় সংবিৎ ফিরে এল, তিনি জিভ কেটে একটু পাশে সরে উপরের কপাট দুটি বন্ধ করে দিলেন।

সমরেশদা বললেন, পোড়া কপাল আর কাকে বলে! স্নানটি সেরেই বন্ধ করতে পারতিস! মেয়েটির একদম রসবোধ নেই।

এসব ব্যাপারে এমনি আমি খুব লাজুক। সমরেশদাকে একটি ঠেলা দিয়ে বললাম, রসবোধ আপনার বেরিয়ে যাবে, পিঠে ডাণ্ডা পড়ার সময় বোধহয় হয়ে এসেছে।

ঠিক এই সময়ে যে ভদ্রলোক আমাদের ঘরে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে আমি হতবাক। আমি দেখি দিদির বড়ভাসুর 'মন্টুদা'। মন্টুদা সরকারি চাকরি করতেন বলে আমি জানতাম। তিনি যে পুলিশের লোক এবং তা আবার আই. বি. বিভাগে তা আমি কখনোই ভাবতে পারিনি।

মন্টুদা আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে এলেন।

আমি বললাম, আপনি এখানে?

মন্টুদা বললেন, এখন আর গোপন করে লাভ কি, আমি এখানকারই ইন্সপেক্টর। এবার রিপোর্টের ভিত্তিতে তোকে ধরা হয়েছে। তোর ছাড়া পাওয়ার কোনো পথ দেখছি না।

দিদির ভাসুর হিসেবে মন্টুদা আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁকে আমি কি জবাব দেব? আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। মন্টুটা আবার বললেন, দেখা যাক কি হয়, গীতা বড্ড দুঃখ পাবে। দেখি তোর জন্যে আমি কি করতে পারি।

আমি আস্তে আস্তে জবাব দিলাম, মন্টুদা আপনি কিছু না করলেই খুশি হব। যা হবার তাই হবে।

মন্টুদার পরনে ছিল ধুতি আর ফুলশার্ট। হঠাৎ লক্ষ করলাম কোমরের সামনের দিকটা একটু উঁচু। আমার বুঝতে অসুবিধা হল না. ওখানেই রিভলবার গোঁজা আছে।

মন্টুদা বললেন, এবার তোদের পৃথক করে দেব। এই বাড়িটা এস. বি-র, পাশেরটা আই. বি-র। আমাদের কাছে এখান থেকে তোদের রেকর্ড চেয়ে পাঠিয়েছে। তোর নাম দেখেই আমি চলে এলাম। পরে দেখা হবে। এই কথা বলেই হন হন করে মন্টুদা চলে গেলেন। আমি ঘরে ফিরে এলাম। সমরেশদার পাশে বসলাম। এর আগে ছিলাম মুখোমুখি। সমরেশদার চোখেমুখে কৌতূহল। ব্যাপারটি জানবার জন্যে তিনি গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আমি সব কথা তাঁকে খুলে বললাম।

এখন প্রায় বেলা দুটো বাজে। দুপুরে আমাদের খাওয়া জুটবে কি না জানি না। কাল

রাত থেকে একসঙ্গে পাশাপাশি আছি। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে এবং পরে। এবার দুজনের ছাড়াছাড়ির সময় আগত। জানি না কখন কোথায় দেখা হবে অথবা আদৌ দেখা হবে কিনা।

দুজনেরই গম্ভীর মুখ। বিচ্ছিন্নতার বেদনায় দুজনেই ব্যথিত। ঠিক এই সময়েই সামনের টেবিলে একজন দু'টি ভাতের থালা রেখে খাবার অনুরোধ জানাল। খুব একটা খাওয়ার আকর্ষণ আমাদের দুজনের ছিল না। দুজনেই ডাল ঢেলে সামান্য ভাত খেয়েছিলাম। ডিমের ডালনা ছিল, আমি ঝোল থেকে ডিমটি তুলে নিয়েছিলাম। সমরেশদা ডিম না খেয়ে বললেন, আমারটা তুমি খাবে?

আমি বললাম, আপনি ডিম খান না?

সমরেশদা বললেন, ডিম বেচে বেচে বেড়াতাম তো! ময়রা কখনো মিষ্টি খায় নাকি!

সমরেশদা যে ডিম বিক্রি করে সংসার চালাতেন, সে কথা তখন আমি জানলাম। পরে দেখেছি সমরেশদা যে ডিম খেতেন না তা নয়, সেই মুহূর্তে হয়তো ভাল লাগেনি। যে লোকটি আমাদের খাবার দিয়ে গিয়েছিল, সে আমাদের খাবার ধরন দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। গ্লাসের জল দিয়ে কোনোরকম হাত-মুখ ধুয়ে আর একটু খেয়ে, আমরা আবার যে যার নিজের জায়গায় এসে বসলাম।

মন্টুদা যা বলে গিয়েছিলেন তাই সত্যি। দুজন লোক এসে আমাদের দুজনকে ডেকে নিয়ে দুইদিকে চলে গেল। সমরেশদার সঙ্গে সেবারের মতো সেই আমার শেষ দেখা। আমাকে বিশাল এক হলঘরে সুন্দর সুপুরুষ এক ভদ্রলোকের সামনে বসিয়ে দেওয়া হল। ভদ্রলোক আমাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, তুমি শরদিন্দুর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তোমাকে কি আর বলব। তারপর সামনে রাখা ফাইল থেকে একটি ছবির খাম আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ তো এই ছবিগুলো তুমি চেন কিনা। আমাকে 'তুমি' বলাতে আমি ভীষণ চটে গিয়েছিলাম। স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ অফিসার তায় তীক্ষ্ণ চোখ, তিনি আমার মুখ দেখেই আমার মনের ভাব বুঝে ফেলে বললেন, শরদিন্দু আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তুমি তার ছোট ভাই-বউয়ের অনেক ছোট ভাই। এই কারণে তোমাকে 'তুমি' বলেছি। তোমার আপত্তি থাকলে বলো আপনিই বলব। আমি আপত্তি করতে পারিনি।

খামের ছবিগুলি দেখে আমি একেবারে হতবাক। প্রত্যেকটি ছবির মাঝে আমি আছি। পুলিশ কীভাবে এই ছবি পেল! আর কীভাবেই বা গোপনে এই সব ছবি তুলল। কখনো আমার পাশে বিজু-জগদীশ, কখনো ইলা, আর সবচেয়ে বিস্ময়ের একটি গোপন ঘরোয়া সভায় আমি কিছু বলছি তার ছবি। আর লাইটহাউসের সামনে অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তারও ছবি। ছবিগুলো দেখে দেখে যত আমার চোখ বিস্ফারিত হচ্ছিল, ততই ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসছিলেন। পুলিশের জাল যে এমনভাবে চারিদিকে ছড়ানো, তা আমার কখনোই জানা ছিল না। ভদ্রলোক ফাইলটির

পাতা উল্টে একে একে বলে যাচ্ছিলেন, আমি কবে প্রথম ধরা পড়েছিলাম, কোন কোন দায়িত্ব পালন করতাম। আরও কত কী। তারপর ফাইল বন্ধ করে ভদ্রলোক বললেন, সব সত্যি তো! পুলিশের চোখ এড়ানো বড় কঠিন। পুলিশ প্রথমে কাউকে তোলে না। খেলিয়ে তোলে। ঠিক সময়ে তোমাকে তুলে আনা হয়েছে। সমরেশ বসুকে তুলতে আমাদের অন্য জায়গায় হানা দিতে হত। তোমার কাছে ওখানে ওঁকে পেয়ে যাওয়া উপরি পাওনা। ওখানে যে উনি গিয়েছিলেন সেই খবর পেতে আমাদের একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। না পালালে ওখানেই হয়তো আমরা ওকে ধরে ফেলতাম। তবে পরে, তোমার সঙ্গে নয়। তোমাকে ধরতে যাওয়া পুলিশ অফিসারটির উপস্থিত বুদ্ধিতে উনি ওখানে ধরা পড়ে যান।

একনাগাড়ে কথা ক'টি বলে ভদ্রলোক থামলেন।

আমি বললাম, এসব আমাকে শুনিয়ে লাভ কী? সমরেশ বসু লেখক তা আমি জানি।

ভদ্রলোক আবার একটু মৃদু হেসে সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, যাকগে। তোমার সম্পর্কে যা বললাম তা সত্যি তো! তুমি স্বীকার করছ তাহলে?

আমি বললাম, একবার ভুল করে আমাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল, এটাই সত্য। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে মিথ্যা ছিল, তা প্রমাণিত হওয়াতেই তো আমি জেলে মুক্তিলাভ করেছি। জেলে যাওয়া ছাড়া আমার সম্পর্কে আপনি যা যা বললেন সব মিথ্যা। আমি কোনো কিছুই স্বীকার করি না।

এই সময় মন্টুদা তাঁর কাছে এসে হাজির। মন্টুদারই ভাল নাম শরদিন্দু ঘোষ। মন্টুদাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, তোর ভাই-বউয়ের ভাই তো বেশ পাকাপোক্ত রে! একে সামলানো বড় কঠিন। তুই যা বলছিস তা কি হবে?

তখনই মন্টুটা আমার হাতে একটি টাইপ করা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এতে সই করে দে।

আমি বললাম, আগে পড়ে দেখি।

কাগজের লেখাগুলি পড়ে আমি অবাক। ইংরেজি লেখার বাংলা করলে দাঁড়ায়— আমি সব কথা স্বীকার করছি। আমি অঙ্গীকার করছি জীবনে আর কখনো কমিউনিস্ট রাজনীতি করব না। কাগজটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন আমি কঠোর হয়ে উঠলাম। মন্টুদাকে একজন ষড়যন্ত্রকারী আই. বি. ইন্সপেক্টর ছাড়া আর কিছুই আমার মনে হল না। আমি কাগজখানি মন্টুদাকে ফেরত দিয়ে বললাম, আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই করুন, এই সব অন্যায় অঙ্গীকারপত্র আমাকে দিয়ে সই করাতে পারবেন না।

মন্টুদা এবং তার বন্ধুটি দুজনেই অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তারপরে আমাকে অন্য একটি ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে গিয়ে আবার আমি অবাক। সর্বাধিক স্বাক্ষর সংগ্রহ করে যিনি হেলসিঙ্কির শান্তি সম্মেলনে যোগদান করার সম্মান অর্জন

করেছিলেন, সেই সুশীল রায় বসে। দুজন দুজনেরই চেনা। তবু এমন ভাবলেশহীনভাবে আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালাম, যেন কেউ কাউকে চিনি না। সামান্যক্ষণ ওখানে বসিয়েই, পরে আমাকে অন্য একটি ছোট্ট ফাঁকা ঘরে বসিয়ে দেওয়া হল। সুশীল রায়ের কাছে পরে শুনেছি, আমাকে নিয়ে পুলিশ সুশীল রায়কে অনেক প্রশ্ন করেছিল। একই প্রশ্ন সেদিন আমাকেও করেছিল। সুশীল রায়ের মতো আমিও জবাব দিয়েছিলাম, চেনা তো দূরের কথা জীবনে কখনো দেখিই নি।

একা ঘরে বসে বারবার আমার সমরেশদার কথা মনে পড়ছিল। কীভাবে তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হচ্ছে বুঝতে পারছিলাম না। মন্টুদা আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও, অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করায় আমার ভাগ্যে কি আছে তা জানি না। সমরেশদার অবস্থা যে আমার চেয়ে খারাপ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

ফাঁকা ঘরে আমি যখন একা বসে, এইসব ভাবনায় ডুবে যাচ্ছি, তখন মন্টুদা আবার এসে হাজির। মন্টুটা বললেন, আমার দিদি অর্থাৎ তার ভাই-বৌয়ের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন।

আমি মন্টুদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার কী প্রস্তাব নিয়ে এলেন তা ভাববার চেষ্টা করছিলাম।

মন্টুদা বললেন, তোর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। তোকে এরা কিছুতেই ছাড়তে চায় না। আমি অনেক বুঝিয়েই রাজি করিয়েছি। বুঝতেই তো পারছিস! আমারও তো চাকরি! বন্ডের বক্তব্য অনেক সোজা করে দিয়েছে। এবার তুই সই করে দে।

আমি বললাম, মন্টুদা আপনি যে এখানে জড়িত তা আমি সত্যিই আগে জানতাম না। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আপনার কাছে আমি কতটুকু বাচ্চা ছেলে। আমি আবার জেলে থাকলে দিদি খুব দুঃখ পাবে জানি। কিন্তু বন্ডে সই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা আমার কাছে খুব লজ্জার ও ঘৃণার বলে মনে হচ্ছে।

মন্টুদা একটুও চটলেন না। বললেন, তোর মা-বাবার কথা একটু ভাব। সকলের স্বপ্ন তুই একেবারে চুরমার করে দিচ্ছিস।

আমি বললাম, অন্যের কথা এমনকি বাবার কথাও বলতে পারব না। তবে দেশ সেবার জন্যে যদি আমাকে আবার জেলে যেতে হয়, তাহলে মা অন্তত ভেঙে পড়বেন না একথা আমি জানি।

মন্টুদা চুপ করলেন। পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটি সিগারেট ধরালেন। তারপর সিগারেট টানতে টানতে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। আমি মাঝে মাঝে মন্টুদার চোখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। নতুন কী বলবেন তা বোঝার চেষ্টা করছিলাম।

আর কোনো কথা না বলে, এমনকি আমার দিকে না তাকিয়ে মন্টুদা সোজা বেরিয়ে গেলেন। আমার মনে হল আমার সর্বশেষ মতামত সম্পর্কে মন্টুদা দিদিকে সব

জানাবেন। কিন্তু আমি অসহায়, আমার কিছুই করার নেই। বিশ্বাসঘাতকতা করে মুক্তির চেয়ে আমার মৃত্যুই ভাল।

একটু পরে অন্য এক ভদ্রলোক এসে ডাকলেন, বললেন, আসুন। আমাকে সোজা হাঁটিয়ে অন্য একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল এবং সেখানে সমরেশদার সঙ্গে আবার দেখা। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। মুখে কেউ কোনো কথা বললাম না। সমরেশদার সমস্ত চোখেমুখে গভীর চিন্তার ছাপ। তাঁর সামনে তিনজন ভদ্রলোক বসে। বুঝলাম তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সমরেশদার পাশের চেয়ারে আমাকে বসানো হল। এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এঁকে কতদিন চেনেন?

আমি বললাম, কাল রাত থেকে।

—আগে কখনো দেখেননি?

বললাম, না।

—নাম শুনেছেন?

বললাম, হ্যাঁ।

—এই যে বললেন চিনি না, আবার বলছেন হ্যাঁ। মানেটা কী?

—উনি লেখক। সেই হিসেবে ওঁকে চিনি।

—ওর কী লেখা পড়েছেন?

বললাম, 'আদাব'।

—কই নাম শুনিনি তো! উনি যে লেখক তা তো জানি না।

আমি বললাম, তার জন্যে আমি কি করতে পারি!

যিনি প্রশ্ন করছিলেন তিনি এবার চুপ করলেন।

অন্য একজন বললেন, উনি যে নৈহাটির কমিউনিস্ট সে কথা তো আপনি জানেন?

আমি বললাম, কী করে জানব?

ভদ্রলোক এক গাল হেসে ফেলে বললেন, দুজনেই বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, অথচ কেউ কাউকে আগে থেকে চেনেন না? আপনি তো ওরই মতো কথা বলছেন দেখছি? পুলিশের সঙ্গে কথা বলার ট্রেনিং দেওয়া হয় বুঝি আপনাদের?

আমি বললাম, আমার জানা নেই। উনি কী আমি জানি না। তবে আমি যে কোনো পার্টির সদস্য নই, সেকথা বলতে পারি।

তৃতীয় ব্যক্তি এবার উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন।

সকলের দিকে তাকানোর অছিলায় আমি আবার সমরেশদার মুখের ভাবটাও দেখে নিলাম। তারপর যিনি আমাকে নিয়ে এসেছিলেন, তিনিই ডেকে নিয়ে গিয়ে অন্য একটি ঘরে বসিয়ে দিলেন। এবারও আমি সম্পূর্ণ একা। এইসব প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হতে, ও স্পেশাল পুলিশের প্যাঁচপোঁচের নানারকম কায়দাকানুন দেখতে দেখতে কখন যে

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে খেয়াল করিনি। দিনের বেলাতেও সারা ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং বাইরে না গেলে অথবা না তাকালে দুপুর-সন্ধ্যা-রাত্রি বোঝা কঠিন। এবার যে ঘরে বসানো হয়েছে তার খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকানো যায়। বাইরের দিকে চোখ যেতেই বুঝতে পারলাম, সন্ধ্যা আগত।

খুব বেশি সময় এখানে বসতে হয়নি। আবার মন্টুদা এলেন, এবারও হাতে একটি কাগজ। এবার আর মুখ গম্ভীর নয়, বেশ হাসি হাসি মুখ। বললেন, উঠে আয়। উপরওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলে রাজি করিয়েছি। এই নে, কাগজ পড়ে দ্যাখ।

মন্টুদার হাত থেকে টাইপ করা কাগজটি হাতে নিয়ে, প্রতিটি অক্ষরে খোলা চোখ রেখে আমি সবটাই পড়ে ফেললাম। কোনো বন্ড নয়। আমাকে শর্তে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। পুরো গৃহবন্দি না হলেও সকালে এবং সন্ধ্যায় দুবার আমাকে বউবাজার থানায় হাজিরা দিতে হবে। কোনো সভা সমিতিতে আমি যোগ দিতে পারব না। কলেজ ও দিদির বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও আমি যেতে পারব না। আরও নানারকম বিধিনিষেধ। চিঠির উপরে বড় হরফে লেখা 'ইনটার্ন অর্ডার।'

এবার মন্টুদা আমাকে অন্য একটি ঘরে নিয়ে এলেন। অর্ডারটি যে আমি পেলাম, সেই খাতায় সই করতে বললেন, এতে বোধহয় তোর কোনো আপত্তি নেই!

আমি মন্টুদার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসলাম। সই করার পর অর্ডারটা আমি পকেটে ভরে নিলাম।

সমরেশদার কী পরিণতি হল! কিন্তু মন্টুদাকে জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমার জেলযাত্রা বাঁচালেন ঠিকই, কিন্তু হাজার হোক পুলিশের লোক তো!

মন্টুদা আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আর আমাকে বিদায় দেওয়ার আগে বললেন, এই শর্তাবলীর যদি কোনোরকম ব্যতিক্রম হয় তাহলে আমার আর কিছু করার নেই। তোর সঙ্গীর মতো তোকেও নির্ঘাত্ দুদিন এখানে রেখে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হত।

আমি 'আসছি' বলে পুলিশের বেষ্টনি ছাড়িয়ে মুক্ত জনপথে ফিরে এলাম।

সমরেশদার পরিণতিও আমার জানা হয়ে গেল।

আমি ঘরে ফিরতে সবাই অবাক, তখন প্রায় রাত আটটা বাজে। সকলেই ঘরে ফিরে এসেছে। আমাকে পেয়ে প্রত্যেকের মুখে হাসি ফুটল। আমি লক্ষ্মীদাকে বললাম, সমরেশদাকে দুদিন পরে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেবে। আপনি নৈহাটিতে খবর দিয়ে দেবেন।

হাতে হাতে আমার ইনটার্ন অর্ডারটি ঘুরছিল। তুষারদা বললেন, কিছুদিন একটু সাবধানে থাক। এ বাড়ির ওপর নজর বেড়ে গেছে। এখান থেকে আর কিছু করা যাবে না। বাইরে বেরোলেই চারদিক ভাল করে দেখে নিস। কোনোদিনই হাজিরা দিতে ভুল

করিস না। তাহলে আবার তোকে তুলে নেবে। অনেক ধকল গেছে, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়, কাল সব শোনা যাবে।

লক্ষ্মীদা বললেন, সমরেশ যে এখানে কেন এল বা কেউ কায়দা করে পাঠাল কিছুই বুঝতে পারছি না। এখানে না এলে তো ওর ওই পরিণতি হত না।

আমি বললাম, হত-লক্ষ্মীদা, তবে অন্যভাবে অন্য কোনোখানে। কাল সব বলব। তখন বুঝতে পারবেন।

লক্ষ্মীদা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ওদের পরিবারের দুর্দশা যে আরও কত বাড়বে সে আমি জানি।

লক্ষ্মীদা গৌরীদির কথা বললেন, সে অনেক কথা। আমি কেন বাকি সকলেই মন দিয়ে শুনছিল। সমরেশদার জীবনের আশ্চর্য অনেক কাহিনি লক্ষ্মীদার মুখ থেকে শুনতে পেলাম।

আমার খুব খারাপ লাগছিল। সমরেশদার জন্য খুবই মন কেমন করছিল। মনে হচ্ছিল শারীরিক না হলেও আরও কত মানসিক যন্ত্রণা তাঁকে সহ্য করতে হবে। শারীরিক অত্যাচার হবে কি না, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

জেল থেকে ফিরে সমরেশদা এখানে আবার আমার কাছে এসেছিলেন। সে কাহিনি পরে বলছি।

দুই : অন্যকথা

সমরেশ বসুর গ্রেপ্তার-কাহিনি আমি আগেই বিশদভাবে বলেছি। আমাকে আজও তাড়া করে যে দিনগুলি সেই দিনগুলিতেই ঘটেছিল এমন গ্রেপ্তার। সেই উত্তাল দিনে যে সম্পর্ক আমার সঙ্গে সমরেশ বসুর গড়ে উঠেছিল সেই সম্পর্ক অম্লানভাবে টিকেছিল চল্লিশ বছরেরও বেশিসময়, তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত। সমরেশ বসু যে দিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, তখন আমি তাঁর কাছ থাকতে পারিনি। এ দুঃখ আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। আমি তখন ত্রিপুরায় আগরতলা বইমেলায় যোগ দিতে গিয়েছি। সমরেশদারও আমাদের সঙ্গে যাবার কথা ছিল। বিশেষ অতিথি হিসাবে তিনি আমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য শেষ মুহূর্তে যেতে পারলেন না। ভুবনেশ্বরে একটি সাহিত্য সভায় যোগ দিতে গিয়ে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলকাতায় ফিরে আসেন। ফিরে এসেও বলতে থাকেন, আগরতলাতে আমি যেতে পারব—প্রসূন আছে, সুধাংশু আছে, আমার কোনও অসুবিধা হবে না। সুধাংশু অর্থাৎ দেজ পাবলিশিং-এর সুধাংশুশেখর দে। কিন্তু এই ইচ্ছা থাকলেও ডাক্তার তাঁকে যেতে দেননি। গেলে যে কি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটত ভাবলে আজও আমি শিউরে উঠি। আগরতলার বইমেলা হল সরকারি বইমেলা। ওখানকাব তথ্য অধিকর্তা গুরুপদ সাউ আমাকে ডেকে এই দুঃসংবাদ দেন, যে সমরেশ

বসু আর নেই। তাঁর সম্মানে মাঝপথেই সরকার সেদিনের মতো মেলা বন্ধ করে দেন। আমি আর সুধাংশু আগরতলায় একই ঘরে থাকতাম। মনে আছে, সেদিন সারারাত জেগে আমরা সমরেশদার কথা বলেছিলাম। একটা পুরো রাত যে কেটে গেল তা আমরা কেউই টের পাইনি।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সমরেশদার সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাঁর আর্থিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ। সমরেশদার সামান্য রোজগার। লেখাই তাঁর একমাত্র পেশা। তখন লিখে এমন বিপুল অর্থ মিলত না। সমরেশদার স্ত্রী গৌরীদি গানের স্কুল করে কিছু রোজগার করতেন, তাতে কোনওরকমে টেনেটুনে সংসার চলত। কিন্তু সমরেশদার চোখে মুখে কোথাও কোনও দারিদ্র্যের ছাপ ছিল না। পরনে সেই ধপধপে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। যে পোশাক তাঁর কাছে চিরকালের প্রিয় পোশাক।

সমরেশদা সেই সময় 'পরিচয়' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লেখা শুরু করেন। 'পরিচয়' অন্য কোনও লেখককে সম্মান দক্ষিণা না দিলেও তাঁকে সামান্য অর্থ দিত। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর দু-একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটে। অর্থ প্রাপ্তি ছাড়া যেটি সবচেয়ে লাভ হয়—সমরেশদা আলোচনায় উঠে আসেন। তাঁর প্রথম গল্প 'আদাব' এই 'পরিচয়' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েই তাঁকে সাহিত্য জগতে আসন করে দিয়েছিল। 'পরিচয়' পত্রিকার প্রতি সমরেশদার ছিল অসীম দুর্বলতা। যখন তিনি খুবই ব্যস্ত লেখক তখনও 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

আমি আগেই বলেছি সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁর কমিউনিস্ট জীবন নিয়ে তিনি 'দেশ' পত্রিকায় বিশদভাবে লিখেছেন, পার্টি ছাড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সেই লেখাতেই তিনি আমার নাম উল্লেখ করে আমাকে বিশেষ বিপদে ফেলেছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা এর আগে এমনভাবে কেউ জানত না। সমরেশ বসু পার্টি ছাড়ার পর নানা দিক থেকে তাঁর সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য করা হয়েছে। সেই সম্পর্কে সমরেশদা ও আমি একান্ত-ভাবে অনেকদিন আলোচনা করেছি। সমরেশদার মতামতকে আমার মতো এমন ঘনিষ্ঠভাবে কেউ জানত না। অনেক বিষয়ে তাঁর অনেক বক্তব্য ছিল ঠিকই, তিনি কখনই কমিউনিস্ট বিরোধী হননি। পরবর্তীকালে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে পার্টির মুক্ত মানসিকতায় তিনি খুবই তৃপ্ত হচ্ছিলেন। এই সময় তিনি বিশেষ আমন্ত্রণে সোভিয়েত দেশে ভ্রমণ করে আসেন। তবে আমার একটা ক্ষোভ ছিল—তাঁকে লেখক সংঘ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, এমনকি তিনি মস্কো গেলে লেখক সংঘ থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। আমি পরবর্তীকালে মস্কো গেলে

লেখক সংঘের কর্মকর্তাদের কাছে আমার এই অভিযোগ জানিয়েছিলাম। তাঁরা তাঁদের ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন। কথা ছিল তাঁরা সমরেশদাকে পৃথকভাবে আমন্ত্রণ জানাবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে শুরু হয়ে গিয়েছিল টালমাটাল অবস্থা।

সমরেশদার আর্থিক অবস্থা ফিরল 'দেশ' পত্রিকায় সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে। সাহিত্য জগতেও তখন বাণিজ্যিক প্রভাব পড়ল। এই প্রভাবের সুফল সমরেশদা লাভ করতে লাগলেন। সমরেশদার অবস্থা ফেরাতে আমি খুবই খুশি হলাম। সমরেশদা তখন নৈহাটিতে থাকেন। কলকাতার বাসিন্দা হননি। নৈহাটি ছিল সমরেশদার জীবনের শিকড়। তিনি এই শিকড় কখনও উপড়ে ফেলার চেষ্টা করেননি। বরঞ্চ তাকে সযত্নে লালন পালন করেছেন। তাঁর অসংখ্য লেখায় নৈহাটি ও তার আশপাশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন আশ্চর্যভাবে উঠে এসেছে। 'জগদ্দল' তো তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাস। মৃত্যুর পর সমরেশদার মরদেহ তাই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নৈহাটিতে। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ইতিমধ্যে আমারও বাসস্থান পরিবর্তন হয়েছে। পার্কসার্কাস ছেড়ে আমি তখন বালিগঞ্জের বাসিন্দা। কিন্তু সমরেশদার সঙ্গে আমার দেখাশুনো হত পটুয়াটোলা লেনে। সেখানেই ছিল আমাদের 'আগামী'র কার্যালয় ও পরবর্তীকালে ছাপাখানা। সমরেশদা তখন নিয়মিত আনন্দ পাবলিশার্সে যাতায়াত করতেন। আনন্দ পাবলিশার্স তখন ছিল চিন্তামণি দাস লেনে—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে। আমাদের আস্তানার ঠিক পেছনে। সেখানে যাওয়ার আগে সমরেশদা নিয়মিতভাবে কিছু সময় আমার সঙ্গে কাটিয়ে যেতেন। সমরেশদার ব্যক্তিগত যত কথা আমাকে না বলে তিনি হালকা হতে পারতেন না। কোনও কথাই সমরেশদা আমায় কাছে গোপন করতেন না, আমিও করতাম না। তখন সমরেশদার নিয়মিত লেখার জায়গা ছিল আনন্দ পাবলিশার্সের নির্জন একটি ঘর। মাঝে মাঝে তখন সমরেশদা কফি হাউসে গিয়েও বসতেন। তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করার থাকলে কফি-হাউসেই দেখা-সাক্ষাৎ হত।

যে সময়ের কথা আমি বলছি সেই সময় এসে পড়ল চীন-ভারত সংঘর্ষের ঘটনা। 'দেশ' পত্রিকায় প্রতি সংখ্যায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা' নামে একটি বিভাগ প্রকাশিত হতে লাগল। প্রতিটি লেখার একই উদ্দেশ্য—'কমিউনিস্ট বিরোধিতা'। সমরেশদা সেই বিভাগে লেখেননি। সত্যি কথা বলতে কি সমরেশদাকে বিশাল ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। যে আর্থিক সচ্ছলতা ও সাহিত্যিক সফলতা তিনি লাভ করেছিলেন তার বিশাল ক্ষতি হতে পারত। কিন্তু হয়নি। তাঁর প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর গভীর দুর্বলতায় অন্যরকম ঘটনা ঘটেনি। সমরেশদা আমাকে পরে বলেছিলেন, আমি সাগরদাকে বলেছি, সাগরদা আপনি যা বলবেন আমি তা করতেই রাজি আছি, কিন্তু প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট

বিরোধিতা করতে পারব না। এই কারণেই অনেকদিন পরে তিনি 'দেশ' পত্রিকাতেই কমিউনিস্ট জীবন নিয়ে লেখাটি লিখেছিলেন।

সমরেশদা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়লেন তাঁর 'বিবর' উপন্যাস প্রকাশের পর। সাহিত্য জগৎ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক দল সোচ্চারে ঘোষণা করল যে 'বিবর' একটি অশ্লীল উপন্যাস। অন্য দল সেই মতের ঘোর বিরোধী। তাঁদের মতে বিবর বাংলা সাহিত্যের নতুন একটা দিকের উন্মোচন করেছে। 'বিবর' অসাধারণ পরিণত উপন্যাস। আমি ছিলাম এই দ্বিতীয় মতের সঙ্গে। দ্বিতীয় মতের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন প্রথিতযশা মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও লেখক গোপাল হালদার। গোপালদাকে সমরেশদা গভীর শ্রদ্ধা করতেন। সাহিত্য সমালোচক হিসাবেও গোপালদা ছিলেন প্রথম সারিতে। তাঁর একাধিক লেখায় তিনি 'বিবর' উপন্যাসের নিখুঁত বিশ্লেষণ করেছেন।

'বিবর' উপন্যাস নিয়ে কলকাতা যখন উত্তাল তার ঢেউ যে মফস্‌সলে গিয়ে আছড়ে পড়েছে সে কথা আমরা কেউ জানতাম না। জানলাম জামশেদপুর শহরে গিয়ে। জামশেদপুরে সাহিত্য সম্মেলনে আমরা সবাই যোগ দিতে গিয়েছিলাম। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বরেন গঙ্গোপাধ্যায় সব ব্যবস্থা করেছিল। তখন নকশাল যুগ—কলকাতায় প্রতিদিন লাঠি-গুলি, খুন-খারাপি লেগে আছে। কোনোরকমে স্টেশনে পৌঁছে, আমরা জামশেদপুরের দিকে রওনা হয়েছিলাম। নৈহাটি থেকে ট্রেনে সমরেশদা হাওড়া পৌঁছে গিয়েছিলেন। দলে ছিলাম সমরেশদা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বরেন, শংকর চট্টোপাধ্যায় আর আমি। সারা ট্রেন হৈ হৈ রৈ রৈ করতে করতে আমরা চলেছিলাম। সমরেশদাদের মদ্যপান চলছিল পুরোদমে। অলোকরঞ্জন মদ স্পর্শ করে না, আমিও তখন অভ্যস্ত নই। জামশেদপুরে পৌঁছে আমরা দুইভাগে ছিলাম। আমি আর অলোকরঞ্জন এক বাড়িতে, সমরেশদা, শংকর অন্য বাড়িতে আর বরেন তার নিজের বাড়িতে। পরের দিন সাহিত্য সভার শুরুতেই উঠে গেল 'বিবর' প্রসঙ্গ। শুরু হয়ে গেল তুমুল বিতর্ক। কলকাতার মেয়ে তখন জামশেদপুরের বাসিন্দা পূরবী মুখোপাধ্যায় শুধু 'বিবর' উপন্যাস নয় সমরেশদাকে তীব্র আক্রমণ করলেন।

পূরবী যখন কলকাতায় ছাত্রী ছিল তখন বিতর্কে তার খুব নামডাক। আমাদের বন্ধু ডা. বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পূরবীর বিয়ে হয়। বিষ্ণুরও বিতর্কে খুব নামডাক ছিল। কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে বিষ্ণু জামশেদপুরেই তার ডাক্তারি শুরু করে। পূরবী সেই কারণেই জামশেদপুরের বাসিন্দা। পূরবীর আক্রমণ সমস্ত আবহাওয়াকে খুব তপ্ত করে তুলেছিল। কিন্তু পূরবীর বক্তব্যে কোনওরকম অশালীনতা ছিল না। সমরেশদাকে সে যে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিল সেটা মূলত সমরেশদা পার্টি ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গে। মতবাদের দিক দিয়ে পূরবী ছিল একটু কট্টর। পূরবীর বক্তব্যে আমরা সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সমরেশদা ছিলেন আশ্চর্যরকম শান্ত। তীব্র এইসব সমালোচনা মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারেনি। আমরা প্রত্যেকেই

পূরবীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেও মূল জবাব দিয়েছিলেন সমরেশদা নিজে। সমরেশদার সেদিনের সেই জবাব যদি রেকর্ড করে রাখা হত তাহলে সেই বক্তব্যটি পরিগণিত হত বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে। আমাদের ত্রুটি, আমরা কিছু ধরে রাখতে জানি না। সমরেশদার জবাবের সব কথা আজ আমার স্পষ্ট মনে নেই, তবে তিনি সাহিত্য ভাবনার মূল শিকড় ধরে টান দিয়েছিলেন। সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রসঙ্গে তাঁর সেদিনের বক্তব্য পূরবীর মতো জাঁদরেল বক্তাকেও বিভ্রান্ত করেছিল। সমরেশদার অনেক বক্তব্যই পূরবী মেনে নিয়েছিল।

সমরেশদার সঙ্গে আরও অনেক সাহিত্যসভা বা অধিবেশনে আমি গিয়েছি। আজ বিশেষভাবে মনে পড়ছে কলকাতা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে বইমেলার কথা। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা বিশ্বের এক নম্বর বইমেলা। ১৯৭১ সালে সেই মেলায় যোগ দিতে আমি আর সমরেশদা গিয়েছিলাম। আরও অনেক লেখক-প্রকাশক ছিলেন। আমরা যারা একসঙ্গে গিয়েছিলাম তারমধ্যে ছিলেন সুপ্রিয় সরকার। তাঁর কথা তো পৃথকভাবে বলেছি। সেখানে মেলার উল্লেখও করেছি। কিন্তু সমরেশদার কথাটা এখানে বলি।

কলকাতা থেকেই আমি ছিলাম সমরেশদার সঙ্গী। ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে অবশ্য আমরা একসঙ্গে ছিলাম না। কিন্তু প্রতিদিনই দুপুর থেকেই মেলায় আমরা একসঙ্গেই থাকতাম। যেবার আমরা ফ্রাঙ্কফুর্ট গিয়েছিলাম সেবারের মেলার মূল বিষয় ছিল 'ভারতবর্ষ'। সদ্য প্রয়াত নরসিংহ রাও তখন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তিনি এই মেলায় যোগদান করেছিলেন। ভারতের জন্যে সেবার একটি পৃথক মণ্ডপ তৈরি হয়েছিল। সেই মণ্ডপে 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড' ও 'আনন্দ পাবলিশার্স' দুটি পাশাপাশি স্টল নিয়েছিল। সেই জায়গাটিই ছিল আমাদের মিলনক্ষেত্র ও আড্ডার স্থল। আনন্দবাজার পত্রিকার অভীক সরকার ও অরূপ সরকার এই মেলায় গিয়েছিলেন। বাঙালি লেখকদের মধ্যে সমরেশদা ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী, বুদ্ধদেব গুহ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও কবিতা সিংহ। বিদেশে বেশ জমিয়ে কেটেছিল কয়েকদিন।

একদিন সমরেশদাকে নিয়ে ওখানকার বাঙালি সমিতি ওই মণ্ডপেই একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শীতের দেশেও সমরেশদা কোরা ধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবি পরে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। বাঙালি থেকে জার্মান নানাজনে তাঁর সাহিত্য নিয়ে যেসব প্রশ্ন করেছিলেন, সমরেশদা নিখুঁতভাবে তার প্রতিটির জবাব দিয়েছিলেন। সমরেশদার বক্তব্যে এবং বলবার পারদর্শিতায় দেশি-বিদেশি সকলেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে অরূপবাবুর আতিথেয়তার কথা আমার মনে পড়ে। সাতদিন ফ্রাঙ্কফুর্ট ছিলাম—একদিনও তিনি আমাকে কোনও খরচ করতে দেননি। এমন খাদ্যরসিক ব্যক্তি আমি জীবনে দেখিনি। এমন আতিথেয়তা আমি জীবনে কখনো পাইনি।

যাক সমরেশদার কথায় ফিরে আসি। একদিন আমাদের সেই মিলনক্ষেত্রে আমি আর সমরেশদা পাশাপাশি বসে আছি। এমন সময় দেখি নরসিংহ রাও সদলবলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি সমরেশদা উঠে দাঁড়ালাম। নরসিংহ রাও সোজা এসে সমরেশদার সামনে দাঁড়ালেন। সমরেশদার দুই হাত নিজের হাতের মাঝে টেনে নিলেন। তারপর পাশের সাহেব ভদ্রলোকের সঙ্গে সমরেশদার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হলেন সমরেশ বসু। আমাদের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। আমার সঙ্গে ও প্রথম সাক্ষাৎ। আমার সৌভাগ্যই বলতে পারি। ওঁর ছবি আমি আগে অনেকবার দেখেছি, তাই আমার চিনতে একটুও ভুল হয়নি।

জানলাম সাহেবভ দ্রলোক হলেন জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী। নরসিংহ রাওয়ের এমন আকস্মিক কথা ও ব্যবহারে সমরেশদা হতচকিত। আমিও স্তম্ভিত। অন্যেরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপর নরসিংহ রাও সমরেশদাকে হাত ধরে গল্প করতে করতে অনেকদূর নিয়ে গেলেন। সমরেশদা আমাকে পাশে টেনে নিলেন। সমরেশদা যে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এই কথাটি বারবার বলছিলেন নরসিংহ রাও। যতবার এই কথা বলছিলেন, ততবারই দেখছিলাম সমরেশদা গুটিয়ে যাচ্ছেন। সমরেশদার এমন সম্মান সমরেশদাও ভাবেন নি, আমিও ভাবিনি। সমরেশদার জন্যে গর্বে আমার বুক সেদিন ফুলে উঠেছিল।

তারপর লন্ডন শহরেও সমরেশদার জনপ্রিয়তা লক্ষ করেছি। সেখানে এক সাহিত্য সভায় শরৎচন্দ্রের যে মূল্যায়ন সমরেশদা করেছিলেন, সেকথা আজও আমার মনে আছে।

এবার দেশের একটি সাহিত্য সভার কথা বলি—সমরেশদাকে একবার আমি ঘাটশিলায় নিয়ে যাই বিভূতি স্মৃতি সংসদের অনুষ্ঠানে। সমরেশদা ছাড়াও দলে ছিলেন অমিতাভ চৌধুরী, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও অভ্র রায়। হিন্দুস্থান কপার সকলকে অতিথি করে তাঁদের অতিথিশালায় রেখেছিলেন। ব্যবস্থাপনা ও মর্যাদার কোনও ত্রুটি ছিল না। সিরাজ তখন সবে আমেরিকা থেকে ফিরেছে। অতিথিদের জন্য ছিল মদের ছড়াছড়ি। স্থানীয় একটি মদ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান বিশেষ ধরনের মদ তৈরি করে লেখকদের জন্য পাঠিয়েছিলেন। মূল লক্ষ্য অবশ্য ছিলেন সমরেশদা। একটি মদ নাকি মাংস থেকে তৈরি। মাংস থেকে যে মদ তৈরি হতে পারে এমন কথা আমরা কেউ কখনও শুনিনি। সমরেশদার মতো সুরারসিকও এমন কথা জানতেন না। ভীষণ কড়া ছিল সেই মদ। সমরেশদা ছাড়া সেই মদ কেউই বেশি মাত্রায় গলায় ঢালতে পারেননি। আমি, সমরেশদা, সিরাজ এক ঘরে ছিলাম।

সমরেশদার ইচ্ছে ছিল সারা রাত ধরে সেই বোতলটি শেষ করবেন। কিন্তু পারেন নি। আমি বোতলটি সরিয়ে দিয়েছিলাম। অত্যধিক স্নেহ করতেন বলে সমরেশদা আমাকে কখনওই কিছু বলতে পারতেন না।

পরের দিন সকালে অবস্থা কাহিল। কিন্তু আশ্চর্য, সবচেয়ে বেশি যিনি মদ্য সেবন করেছেন সকালে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তৈরি। স্নান সারা হয়ে গেছে। সকালে যে তাঁকে মুসাবনি যেতে হবে এটা তিনি একদম ভোলেননি। প্রত্যেকে বিলম্ব করলেও সমরেশদার বিলম্ব হয়নি। মুসাবনি ঘুরে দুপুরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে ঘাটশিলার অনুষ্ঠানে যাবার কথা। মুসাবনিতে যিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁদের পীড়াপীড়িতে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়। সেখান চলছিল বিয়ারের অধিবেশন। আমার ভয় হচ্ছিল সমরেশদা আজ ডুবিয়ে দেবেন। কিছুই বলতে পারবেন না। কিন্তু পরে আমি বুঝেছিলাম, অত কাছে থেকেও সমরেশদাকে তখনও আমি পুরোমাত্রায় বুঝতে পারিনি।

দুপুরে ফিরতে এত দেরি হয়ে গিয়েছিল যে বিশ্রামের কোনও অবসর ছিল না। এবারও দেখলাম সমরেশদা সবচেয়ে আগে তৈরি। কোরা ধুতি, তসরের পাঞ্জাবি পরেছিলেন সমরেশদা। কি অসাধারণ সুন্দর লাগছে তাঁকে। তাঁকে কি সাধে বলা হত সাহিত্য জগতের উত্তমকুমার। সমরেশদার তাড়াতে আমরা সঠিক সময় ঘাটশিলা পৌঁছলাম। আমাদের অতিথিশালাটি ছিল ঘাটশিলারই কাছে মৌভাণ্ডারে। আমরা পৌঁছে দেখি লোকে লোকারণ্য। নানা স্তরের মানুষ ছিলেন। এমনকি আদিবাসীর সংখ্যাও খুব কম ছিল না। অন্যান্য অতিথিদের ভাষণের পর শেষ ভাষণ দিয়েছিলেন সমরেশদা। বিষয় ছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য। সমরেশদার সেদিনের সেই ভাষণ শুনে সকলেই স্তম্ভিত। এমন ভেতর থেকে তিনি কথা বলছিলেন যে অনুভব করা যাচ্ছিল প্রতিটি শব্দই বিশ্বাসে গাঁথা। প্রায় এক ঘণ্টা বলেছিলেন সমরেশদা। বক্তৃতার শেষে সকলেই হা-হুতাশ করেছিলাম এমন বক্তব্য ধরে রাখা গেল না। জানি না আমার অজান্তে সমরেশদার এমন কত ভাষণ হারিয়ে গেছে।

সমরেশদা যখন টুনি বৌদিকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধলেন তখন আমাকে জড়িয়ে পড়তে হল। আমি তখন থাকি কাঁকুলিয়া রোডে। সমরেশদা টুনি বৌদিকে নিয়ে এসে উঠেছেন ১৮ নম্বর বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের সি. পি. এম. সাংসদ জ্যোতির্ময় বসুর অতিথি নিবাসে। ওখানে উঠবার পরের দিনই শংকর চট্টোপাধ্যায় আমাকে ডেকে জানাল, সমরেশদা তোকে দেখা করতে বলেছেন। শংকর সেই সময় সমরেশদাকে বেশ সাহায্য করেছিল। আমি একতলার একটি ঘরে সমরেশদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে টুনি বৌদিকে প্রথম দেখলাম। সমরেশদাকে বেশ অপরাধী অপরাধী লাগছিল। বুঝতে পেরেছিলেন আমি এ ব্যাপারটা কিছুতেই মানব না। প্রথমদিকে সত্যিই আমি মানতে পারিনি। টুনিবৌদি গৌরীদির আপন ছোট বোন। কিন্তু পরবর্তীকালে টুনিবৌদির সঙ্গে আমার খুবই মধুর সম্পর্ক হয়। এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেই সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

সমরেশদার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না সমরেশদাকে আমার কি বলা উচিত। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হচ্ছিল, এমন ঘটনা মানতেও পারছি না, আবার সমরেশদাকে ত্যাগও করতে পারছি না। সমরেশদা অনেকক্ষণ আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। আমি চুপচাপ তাঁর কথা শুনে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোনও উত্তর দিইনি।

কিন্তু সেই সমরেশদা গৌরীদির মৃত্যুর পর একেবারে ভেঙে পড়লেন। আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে একটি পৃথক চিঠি লিখে আমাকে অনুরোধ জানালেন আমি যেন গৌরীদির কাজে অতি অবশ্য যোগ দিই। গিয়েছিলাম নৈহাটিতে গৌরীদির সেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে। মনে পড়ে, সেদিন টুনিবৌদি আমাকে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে বারবার বলছিলেন যে, গৌরীদি নাকি তাঁর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। গৌরীদি নাকি শেষ সময়ে বলেছিলেন, তোর প্রতি আমার কোনও ক্ষোভ নেই, তুই ওই মানুষটাকে ভালভাবে দেখিস। সত্য-মিথ্যা না জানলেও টুনিবৌদির কথাকে আমি আজও অবিশ্বাস করি না। সমরেশদা যে টুনিবৌদিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তার মূলে ছিলেন গৌরীদি নিজে। তাঁর সহযোগিতা না থাকলে টুনিবৌদিকে নিয়ে সমরেশদা কখনওই পৃথক সংসার পাততে পারতেন না। সেদিন গৌরীদির সেই শ্রাদ্ধবাসরে সমরেশদাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল একেবারে একজন ভেঙে যাওয়া মানুষ, ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা ও পাপবোধে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন। ইচ্ছে করে সমরেশদার সঙ্গে অনেকটা সময় আমি কাটিয়ে এসেছিলাম।

সমরেশদার আগের চার ছেলে-মেয়ে দেবকুমার, নবকুমার, বুলবুল, মৌসুমী আর শেষের একটি মাত্র ছেলে। এই ছোট ছেলের পড়াশুনা নিয়ে সমরেশদা খুবই বিব্রত ছিলেন। আমি তাকে জ্যোতিভূষণ চাকীর কাছে পড়বার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। ছেলেমেয়ের মধ্যে বুলবুল ও দেবকুমারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বেশি। তবে ওরা সবাই সমরেশদার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জানে।

সমরেশদা যখন রামকিংকরের জীবন নিয়ে 'দেখি নাই ফিরে' লিখছেন, তখন প্রায়ই আমাকে রামকিংকরের জীবনকথা বলতেন। তথ্য সংগ্রহ করে তিনি যে পুরো মাত্রায় তৃপ্ত হচ্ছেন না সেকথা প্রায়ই বলতেন। রামকিংকরের জীবনের অনেক কথা আমি তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। সমরেশদার খুবই ইচ্ছা ছিল রামকিংকরের জীবন নিয়ে তিনি একটি মহৎ উপন্যাস লিখে যাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শেষ করতে পারেননি। তবু খণ্ডিত যে অংশ আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশ করেছে গভীর যত্ন সহকারে, তা পড়েই পাঠকেরা মুগ্ধ।

শেষদিকে সমরেশদা প্রায়ই আমাকে তাঁর উপলব্ধির কথা বলতেন। সাহিত্য জগতে বাণিজ্যের রমরমা তাঁকে পীড়িত করছিল। প্রথম জীবনের মূল রাজনৈতিক বিশ্বাস তাঁর

যে উধাও হয়ে যায়নি সেকথা আমাকে বারবার বলতেন। অনেক পার্টি কর্মীর সঙ্গে তখন তাঁর যোগাযোগও ছিল।

সমরেশদার মতো বন্ধুবৎসল ব্যক্তি আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। আমাকে যে তিনি বন্ধু না ছোট ভাই কি ভাবতেন তা আমি আজও জানি না। কিন্তু তাঁকে তো আমি পরম আত্মীয় বলেই মানতাম। আমাদের বাড়ির ছোটখাটো অনুষ্ঠানে যেমন তিনি এসেছেন আমিও তেমনি তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। ফলে সকলেই সকলের পরিচিত।

দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সম্পর্ক এত সংক্ষেপে বোধহয় বলা যায় না। তাছাড়া সব কথা তো আর মনে থাকে না। আমারও তো বয়স হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে ততটুকুই বললাম।

সমরেশদা সশরীরে আমার কাছে আজ আর নেই। কিন্তু তিনি আমার জীবনের মাঝে জড়িয়ে আছেন। শেষ বারের মতো চোখ না বোজা পর্যন্ত আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করবে একটি মুখ—সে মুখ আর কারোর নয়, বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ সমরেশ বসুর।

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ

দেখতে দেখতে কত বছর কেটে গেল! সময় এত দ্রুতগামী! সময় যত এগিয়ে যায় ততই ছোট হয়ে আসে জীবন। আর তখনই মনে হয় তারাশঙ্করের কবিয়ালের সেই প্রশ্ন—জীবন এত ছোট ক্যানে!

আমি যখনকার কথা বলতে বসেছি সেটা ১৯৭১ সাল। দেশের সাধারণ নির্বাচনে পট পরিবর্তন হয়েছে। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে আন্দোলন সার্থক হয়েছে। কেন্দ্রে মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে পাঁচমিশেলি জনতা সরকার। আমি যে পার্টির সদস্য সেই সি. পি. আই. বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই আমার প্রথম বিদেশ যাওয়ার কথা মার্চ মাসে। ভেবেছিলাম, রাজনীতির এই পট পরিবর্তনে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে বোধহয় ছিঁড়ল না এবং আমার বিদেশযাত্রা বোধহয় স্থগিত হয়ে গেল!

স্থগিত হয়ে গেল ঠিকই তবে মাত্র একমাসের জন্য। রাজনীতির পট পরিবর্তনের জন্য নয়—অন্য কারণে। যাওয়ার কথা ছিল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও আমার। আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের স্থায়ী অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে। গন্তব্যস্থল মস্কো।

যেদিন আমরা মস্কোর পথে রওনা হব সেদিনই দুপুরে খবর এল আমাদের যাত্রা স্থগিত। অবশ্য সঙ্গে একটি আশার বাণী শোনানো হল—একমাস পরে আমাদের যাত্রা পাকা। সেই মতোই এপ্রিল মাসের গোড়ায় সুভাষদার সঙ্গে আমি মস্কোর পথে রওনা হলাম। এর আগে সেভাবে প্লেনে ওঠার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। বিদেশ যাত্রা তো দূরে থাক। সুভাষদার অবশ্য নিয়মিত মস্কো যাতায়াত আছে। তিনি তখন আন্তর্জাতিক আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের একজন কর্মকর্তা। মনে আছে, তেহেরানে একবার থেমে আমরা মস্কো পৌঁছলাম। বিমানবন্দরে আমাদের নিতে এসেছিলেন রুশ লেখক সংঘের অন্যতম কর্মকর্তা মরিয়ম সালগানিক। মস্কোয় তখন প্রচণ্ড ঠান্ডা। আমার সকল গরম পোশাকই ধার করা। তবে পোশাকগুলি যে শীত থেকে রক্ষা করতে পারে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। একটু ঢিলেঢালা এই যা। তাতে ক্ষতি কি! কে আর ওখানে আমায় দেখছে।

আমি যাচ্ছি রুশ লেখক সংঘের আমন্ত্রণে। খরচখরচা সব তাদেরই। মনে আছে, মাত্র সাত ডলার পকেটে করে আমি মস্কো রওনা হয়েছিলাম। মরিয়ম আমাদের রুশ লেখক সংঘের দপ্তরে নিয়ে গেল। ছোট্ট-খাট্টো চেহারা মরিয়মের। ঘন ঘন সিগারেট খায়। আমাদের দেশের চারমিনার সিগারেটের খুব ভক্ত। সুভাষদা তার জন্য কয়েক প্যাকেট চারমিনার সিগারেট নিয়ে গিয়েছিলেন। সুভাষদা তার বাংলা নাম দিয়েছিলেন মীরা। আমি অবশ্য মরিয়ম বলেই ডাকতাম। মরিয়ম কলকাতার সঙ্গে পরিচিত। দু'বার সে কলকাতা ঘুরে গিয়েছে। মরিয়ম ছিল খুবই বিদুষী। খ্যাতনামা অনেক ব্যক্তির কাছে সে

দোভাষীর কাজ করেছে। সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ রাষ্ট্রপতি হিসাবে যখন সোভিয়েত ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন তাঁর দোভাষী ছিল অল্পবয়সী মরিয়ম।

লেখক সঙ্ঘের দপ্তরে মরিয়মের কাছ থেকে জানতে পারলাম, যে দু-একদিনের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা ভাষার লেখক প্রতিনিধিরা এসে পড়বেন। সেই তালিকা থেকেই জানতে পারলাম প্রতিনিধিদের মধ্যে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাসিত বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অ্যালেক্স লাগুমা আর ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ। শুধু সামনাসামনি ফয়েজকে দেখব তা নয়, তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন আমার জীবন কাটবে এ-কথা ভেবে মনে মনে শিহরিত হয়ে উঠলাম।

আমাদের অধিবেশন ছিল মস্কো থেকে অনেক দূরে আজারবাইজানের রাজধানী বাকু শহরে। ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীরে পনেরো তলার বিশাল হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। আর এমনই আমার সৌভাগ্য যে আমার আর ফয়েজের ঘর হল পাশাপাশি। আমার একপাশে ফয়েজ আর অন্য পাশে আমাদের দুই দোভাষী নাতাসা ও লুৎফা। আমার দোভাষী নাতাসা, ফয়েজের লুৎফা। দুজনে এক ঘরে আছে। গভীর বন্ধুত্ব দুজনের। দুজনেই যেমন সুন্দরী তেমন বিদুষী। নাতাসার চেহারায় ইউরোপের ছাপ, আর লুৎফার চেহারায় ছাপ এশিয়ার। লুৎফার নাকটা একটু চ্যাপটা, কিন্তু নাতাসার খাড়া নাক।

ফয়েজকে আমি প্রথম দেখলাম মস্কোর সবচেয়ে বড় হোটেল 'হোটেল রাশিয়া'য়। এত বড় হোটেল আমার কল্পনার বাইরে। একটি শহর বলা যেতে পারে। একদিকে থাকলে আর এক দিক খুঁজে পাওয়া কঠিন। হারিয়ে যাওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা। সকল প্রতিনিধিরা ওই হোটেলেই ছিলেন। সুভাষদা ছিলেন ছয় তলায় আর আমি ছিলাম নয় তলায়। বিশাল একটি স্যুট আমাকে দেওয়া হয়েছিল। গ্রাম্য ছেলে, জীবনে গ্র্যান্ড হোটেল দেখেছি মাত্র একবার। তার অবস্থা এখানে যে কী করুণ হতে পারে সে-কথা যে কেউ বুঝতে পারবেন। 'হোটেল রাশিয়া' ছিল ক্রেমলিনের মুখোমুখি। আমার ঘরের পর্দা সরিয়ে দিলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত ক্রেমলিন। একান্ত নির্জনে আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক্রেমলিনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সে এক স্বপ্ন।

মস্কোতে ফয়েজকে দেখলেও সেভাবে আমার সঙ্গে আলাপ হয়নি। শুধু সৌজন্য সাক্ষাৎকার হয়েছে। সুভাষদা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ফয়েজের চেহারা স্থূলকায়, শরীরের সঙ্গে মেপে বিশাল মুখ, রং টকটকে ফরসা, উজ্জ্বল চোখ। চোখের দিকে তাকালেই প্রতিভাকে চেনা যায়। ফয়েজের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে মস্কো থেকে বাকুর প্লেনে। আমি, ফয়েজ, নাতাসা ও লুৎফা সামনে পিছনে ও পাশাপাশি বসেছিলাম। ফয়েজ ওদের সঙ্গে সমানে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছিল। ফয়েজ যে খুব রসিক সে কথা বুঝতে পারছিলাম। আমার আর ফয়েজের কথা বলার মাঝে দোভাষীর প্রয়োজন

ছিল না। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। ঘুচে গেল বয়সের ব্যবধান। ফয়েজ আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়। কিন্তু চালচলন একেবারে তাজা যুবকের মতো। ফয়েজ যে একজন পুরোমাত্রার প্রেমিকপুরুষ তা তার কথাবার্তাতেই বোঝা যায়। আগেই তার লেখা অনেক গজল শুনেছি। ছত্রে ছত্রে সেখানে প্রেম আর প্রেম। ভারতে এমন কোনও বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা নেই যাঁরা ফয়েজের গান করেননি। ফয়েজের কবিতা তো উর্দুজগতের মুখে মুখে। শুধু উর্দু কেন, ভারতের অন্য ভাষাতেও ফয়েজ খুবই জনপ্রিয়। তার অসংখ্য কবিতা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষাতে তাঁর অনুবাদ কেন যে এত কম জানি না। ফয়েজ আমার পাশে বসে বাংলা সাহিত্যের খুঁটিনাটি খবর নিচ্ছিল। বলছিল, কলকাতায় সে কখনও আসেনি। বাংলা সাহিত্যের প্রতি ফয়েজের গভীর শ্রদ্ধা। অনেকের লেখা সে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের সে অন্ধ ভক্ত। শান্তিনিকেতনে আসতে পারেনি বলে তার মনের মাঝে একটা দুঃখ আছে। ফয়েজ পাকিস্তানের নাগরিক। পাক-ভারত সম্পর্ক তো খুব মধুর নয়। ওখানকার লেখকদের অহরহ এখানে আসা সম্ভব নয়। আমি ফয়েজের মুখ থেকে পুরানো দিনের কত কথা শুনেছিলাম। অনেক কথাই আমার জানা ছিল না। ভারতে থাকতেই ফয়েজ ছিল সুভাষদার মতো অতি অল্প বয়সে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। কবি হিসাবে তখনও তার ভারতজোড়া খ্যাতি। পাকিস্তানের সে তখন এক নম্বরের কবি। আমার সঙ্গে এইসব সিরিয়াস কথা বলতে বলতেই ফয়েজ নাতাসা ও লুৎফার পেছনে লাগছিল। নাতাসা তবু একটু লাজুক, কিন্তু লুৎফা খুবই সপ্রতিভ। ফয়েজের ঠাট্টাকে অসাধারণ রসবোধে লুৎফা নিখুঁতভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছিল।

এর মাঝে নাতাসা বলে উঠল, লুৎফা কিন্তু কবিতা লেখে।

লুৎফা কিছু জবাব দেওয়ার আগেই ফয়েজ বলে বসল, ঠিক কথা। আমার প্রেমে পড়ার পর থেকে ও কবিতা লেখে। এমন কথা বলাতে আমারই চোখমুখ লাল হয়ে উঠল।

আশ্চর্য লুৎফা একটুও চটল না। উল্টে জবাব দিল, প্রেম নিবেদন ফয়েজ ঠিকমতো করে যাচ্ছে ঠিকই, তবে আমি এখনও গ্রহণ করে উঠতে পারিনি। ফয়েজকে দেখার আগে থেকেই অবশ্য আমার কবিতা লেখার অভ্যেস। আমার প্রতি ফয়েজের প্রেম হয়তো কবিতাকে কিছুটা শানিত করেছে। আমার দিক থেকে প্রেমের উদয় হলে জানি না সেগুলি কি রূপ নেবে।

লুৎফার জবাবে আমি এবং নাতাসা হো হো করে হেসে উঠলাম। লুৎফার জবাব দেওয়ার ঢঙটাও ছিল ফয়েজের মতো মজায় ভরা। ফয়েজও দমবার পাত্র নয়। সে মুখে মুখে বানিয়ে চার লাইনের শায়েরি শুনয়ে দিল। এমন প্রেম ঢালা শায়েরি শুনে লুৎফা চুপ।

বেশ মজা করতে করতে আমরা বাকু পৌঁছলাম। আমার পরম প্রাপ্তি হল ফয়েজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আর এই অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। আমার জীবনের সঞ্চয়ে প্লেনযাত্রার এই মুহূর্তটি তোলা থাকল। বিমানবন্দরে আমাদের দোভাষীর হাতে আমাদের থাকা-খাওয়ার কার্ড ধরিয়ে দেওয়া হল। আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন আজারবাইজান লেখক সংঘের সভাপতি ও সম্পাদক। একটু বিশ্রাম নেওয়ার পর আমরা চারজন একই গাড়িতে হোটেলের দিকে রওনা হলাম।

আগেই বলেছি পাশাপাশি ঘর ছিল আমার আর ফয়েজের। সুভাষদার থেকে আমি কিছুটা ছিটকে গিয়েছি। সুভাষদার জীবন কাটছে অন্যদের সঙ্গে। ফয়েজ ছাড়াও আমার খুব বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে দুজন তরুণ জাপানি লেখকদের সঙ্গে। তাদের নাম আজ আর মনে পড়ছে না। মনে আছে নীচে খাবার টেবিলে আড্ডা দেবার সময় তারা বারবার আজকের পরিবেশ সমস্যার কথা তুলে ধরছিল। পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে তখন আমি আদৌ সচেতন ছিলাম না। আমি কেন আমার দেশও ছিল না। আমি বারবার বলবার চেষ্টা করছিলাম আমাদের মতো দারিদ্র দেশে মূল সমস্যা পরিবেশ নয়—খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। জাপানি লেখকেরা আমার সঙ্গে একদম একমত ছিলেন না। একমত হওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ তাঁরা হিরোশিমা-নাগাসাকির দেশের মানুষ! আজ বুঝতে পারি সেদিন কি নির্বোধই না ছিলাম। আজ পরিবেশকে বাদ দিয়ে কোনও কথা ভাবতে পারি না। আজও পরিবেশের কথা উঠলে আমার চোখের সামনে জাপানের সেই তরুণ লেখকদের মুখ ভেসে ওঠে।

আমাদের খাবার টেবিলে ছিল জাপানি লেখকরা ছাড়া নাতাসা, লুৎফা ও তাদের আরও তিনজন বান্ধবী। কিছু পরে ফয়েজ আমাদের টেবিলে এসে বসল। ফয়েজ আগে ছিল একটু দূরে, সুভাষদা ও লাশুমাদের টেবিলে। ফয়েজ আসতেই আসর জমে উঠল। নাতাসাদের এক বান্ধবী আমাকে চেপে ধরল তাদের সকলের হাত আমাকে দেখে দিতে হবে। আমি তাজ্জব! এ আবার কি ধরনের আবদার। হাত দেখার বিন্দু বিসর্গও আমি জানি না। নিজের হাতের রেখাই চিনি না তো অপরের রেখা! তাছাড়া এসব বিষয়ে আমার কোনও বিশ্বাসই নেই। ওদেরও যে গভীর বিশ্বাস এমন কথা আমার মনে হল না। কিছুটা কৌতূহল, কিছুটা মজা বোধহয়। আশ্চর্যের বিষয় জাপানি তরুণ লেখকেরা তাদের তো মদত দিচ্ছিলই এমন কী ফয়েজও তাতিয়ে তুলছিল লুৎফাদের। সবাই তাদের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল আমার দিকে। এতগুলো তরুণীর কোমল হাত স্পর্শ করবার সুবর্ণ সুযোগ এলেও তাকে গ্রহণ করবার সাধ বা সাধ্য আমার ছিল না। নিজেকে বঞ্চিত করা ছাড়া আর কি উপায় আমার থাকতে পারে!

কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে একজন জাপানি লেখক মেয়েদের হাত দেখা শুরু করল। সে এক একটি ভবিষ্যৎবাণী করে আর টেবিলে হাসির রোল ওঠে। পরে সে

আমাকে বলেছিল জ্যোতিষের সে কিছুই জানে না। এতগুলি তরুণীর হাতের স্পর্শ কি কেউ ছাড়তে পারে! আমি বোকা তাই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু সে ছাড়বে কেন! জাপানি বুদ্ধি আর কাকে বলে!

পরের দিন আমাদের অধিবেশন এই হোটেলেই। বিকেলটা আমরা বাকু শহরে ঘুরেই কাটিয়ে দিলাম। আমরা চারজন ছাড়াও ছিলেন সেই দুইজন জাপানি লেখক এবং শহরের একজন গাইড। বাকু শহরের যতই আমরা ভিতরে ঢুকছিলাম ততই আমার কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। আমাদের বাঙালিদের সঙ্গে বিশেষ মিল না থাকলেও পশ্চিমি মুসলমান পরিবারের সঙ্গে বেশ মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম। আমি যখন কিছুকাল পার্ক সার্কাসের বাসিন্দা ছিলাম তখন অনেক উর্দু ভাষাভাষী মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ছিল। তাদের অনেকের বাড়িতেই আমি দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ খেয়েছি। তাদের বাড়িতে যে সব বাসনপত্র ব্যবহার করতে দেখেছি সেই জাতীয় বাসনপত্রই ব্যবহৃত হয় এখানেও। এই কারণেই আমার বার বার চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

দু-একদিন পরে এখানকার কাঁচা বাজার আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদেরই অনেক ফল, তরিতরকারি ওখানে ঢেলে বিক্রি হচ্ছে। বাজার দেখতে দেখতে আমি এমন চমকিত হয়ে গিয়েছিলাম যে অন্যদের থেকে নিজেকে কখন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি তার কোনও খেয়ালই ছিল না। এই বিচ্ছিন্নতা যখন আবিষ্কার করলাম তখন সত্যিই বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। গাইডেরা আমাকে উদ্ধার না করলে কপালে গভীর দুঃখ ছিল। বাজারের আপেল, আঙুর, আখরোট দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কি অসাধারণ তাজা সব ফল, যেন কথা বলছে।

পরের দিন সকালে শুরু হল আমাদের অধিবেশন। গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান। সুভাষদা নিজে কর্মকর্তা। তাই নিজে বসেছেন কর্মকর্তাদের আসনে। আর আমি প্রতিনিধিদের সঙ্গে। ফয়েজ আমার থেকে সামান্য দূরে মাঝামাঝি জায়গায়। ফয়েজের পাশে দোভাষী হিসেবে লুৎফা আর আমার পাশে নাতাসা। রুশ ভাষায় বক্তৃতা হলে নাতাসা আমায় তর্জমা করে দিচ্ছে। এরপর ফয়েজ বলতে উঠল। আমাদের সকল সমস্যাই সে তার বক্তব্যে তুলে ধরল। অসাধারণ মিষ্টি তার বাচনভঙ্গি। গুরুগম্ভীর বিষয়কেও সে পেশ করল হাসি হাসি মুখে, রসের মোড়কে মুড়ে। ফয়েজের সেদিনের ভাষণ সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। মাঝে মাঝে সে তার বক্তব্য পেশ করার সময় ব্যবহার করছিল স্ব-রচিত শায়েরি। যার মূল্য পৃথকভাবে অমূল্য।

ফয়েজের পরে আমাকে বলতে ডাকা হল। কোথায় ফয়েজ আরে কোথায় আমি। হিমালয়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ফয়েজ, আর সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র আমি।

এই সময় আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আর সেই বুদ্ধিতেই বাজিমাত।

আমি শুরু করলাম—ফয়েজ আমার একটা বিশাল ক্ষতি করে দিল। আমাদের উপমহাদেশের এত বড় মাপের একজন কবির কাছ থেকে এমন ক্ষতি আমি আশা করিনি। এখানে যে সব কথা বলব বলে মনে মনে আমি এতদিন তৈরি হয়েছি, আমার মনের সেই সব কথা ফয়েজ গোপনে চুরি করে নিয়ে আগেই বলে দিয়েছে। আমি এই অধিবেশনে ফয়েজকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করছি। আমার আর কোনও কথা বলার নেই। আমার সব কথা ফয়েজই বলে দিয়েছে।

সমস্ত হল ঘর হাততালিতে ফেটে পড়ল। দেখলাম দূর থেকে সুভাষদা আমাকে তারিফ করছেন। ফয়েজ দৌড়ে এসে বুকের মাঝে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি ভাবতে পারিনি সত্যিই এমন ধরনের কথা আমি বলতে পারব। এইটিই বোধহয় আমার জীবনের সেরা বক্তৃতা। সত্যিই ফয়েজের বক্তব্যের পর আমার আর কিছুই বলার ছিল না। আমাদের উপমহাদেশের সব সমস্যাই ফয়েজ স্পষ্ট করে দিয়েছে। তার সেই বক্তৃতা যদি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হত তাহলে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের একটি মূল্যবান দলিল হয়ে থাকত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাকুর সেই অধিবেশনে হারিয়ে গিয়েছে ফয়েজের বক্তব্য। লেখক সংঘের মুখপত্র 'লোটাস' পত্রিকায় ফয়েজের যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তা অতি সংক্ষিপ্ত।

'লোটাস' ছিল আফ্রো-এশীয় সাহিত্য জগতের উচ্চমানের একটি পত্রিকা। শুধু আফ্রো-এশীয় দেশ নয়, উন্নত দেশের লেখকদের লেখাও প্রকাশিত হত এই পত্রিকায়। কায়রো থেকে প্রকাশিত হত লোটাস। পুরনো কিছু কপি এখনও আমার কাছে আছে। ফয়েজের অনেক কবিতার অনুবাদ লোটাস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

পরের দিন অনেক জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রকাশ্য অধিবেশন। সেখানে আমি কিছু বলিনি। সুভাষদা ও ফয়েজ তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। এখানে ফয়েজের বক্তব্য ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। এই বক্তব্যটুকুই বোধহয় লোটাস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মনে আছে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গোপনে পালিয়ে আসা এক তরুণ লেখক সেখানকার মুক্তি যুদ্ধের লেখকদের অংশগ্রহণের কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন। তরুণ লেখকটি তাঁর বক্তব্যের শেষে বলেছিলেন, আমি জানি না তোমাদের সঙ্গে আর আমার দেখা হবে কিনা। কিন্তু আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি এই ভেবে যে সারা পৃথিবীর লেখকদের কাছে আমি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি। জানি না এই মুক্তিযোদ্ধা তরুণ লেখকের জীবনের পরিণতি কি হল।

বাকু শহরে আমরা আরও চার-পাঁচ দিন ছিলাম। বাকু তেলের জন্য বিখ্যাত। সমুদ্র খনন করে তেল তোলা হয়। সেই সব ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখানো হয়েছিল। তারপর আমরা ফিরবার আগের দিন ওখানে একটি সিনেমা হলের উপরে আজারবাইজান লেখক

সংঘের পক্ষ থেকে আমাদের বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। সেখানে অনেক তরুণ ছেলেমেয়ে উপস্থিত ছিল। বেশ কয়েকজন তরুণ-তরুণী আমি ভারতীয় জেনে আমাকে ঘিরে ধরল। আমাকে স্পর্শ করতে লাগল। রাজ কাপুরের দেশের মানুষ আমি। আমাকে স্পর্শ করে রাজ কাপুরের প্রতি তাদের ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে লাগল। এইসব তরুণ-তরুণীরা রাজ কাপুরের অসাধারণ ভক্ত। রাজ কাপুর এখানে এত জনপ্রিয় বাকু না এলে সে কথা কি আমি বুঝতে পারতাম! সুভাষদা মঞ্চে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমাকে সামনে পেয়েছে। তাই আমি আক্রান্ত।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমি, ফয়েজ, নাতাসা ও লুৎফা গল্প করেছিলাম। সুভাষদা একবার ওপরে উঠে আমাদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে গেলেন। রাতের আড্ডার পর আমি ঘরে ফিরে কাচ ঢাকা দেওয়ালের পর্দা সরিয়ে দিলাম। আমার চোখের সামনে ক্যাস্পিয়ান সাগর, সেই সাগরের দিকেই ঝুঁকে পড়া একটি মূর্তি হাত বাড়িয়ে ভবিষ্যতের পথ বোধহয় নির্দেশ করে দিচ্ছে। ক্যাস্পিয়ান সাগরের ওপারে তুরস্ক। চোখে দেখা যায় না। সেদিন নিজেকে আমার আশ্চর্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত মনে হয়েছিল। কি ভাগ্যবান আমি! কোথায় কলকাতা, কোথায় বাকু। প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য উপভোগ করা কজনের আর ভাগ্যে ঘটে। আর ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের এমন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য বা ক'জন আর লাভ করতে পারে!

পরের দিন আমরা রওনা হলাম মস্কোর পথে। মস্কো পৌঁছবার পর সকলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সুভাষদা ফিরে যাবেন কলকাতায়, আমি জার্মানি-ইংল্যান্ড ঘুরে আবার মস্কো ফিরে আসব। ফিরে আসবার পরও আরও কয়েকদিন মস্কো থাকবার ব্যবস্থা করেছে মরিয়ম। ফয়েজ ফিরে যাবে পাকিস্তানে।

দুপুরের দিকে আমরা মস্কো পৌঁছলাম। যেখানে ছিলাম সেখানে থাকবার ব্যবস্থা হল। আমি আমার পুরানো লোভনীয় ঘরটি ফিরে পেলাম। সকল প্রতিনিধিই আমরা 'হোটেল রাশিয়া'তেই থেকে গেলাম। সেদিন বিশেষ আর কারও সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। বিকেলের দিকে নাতাসা এল। আমাকে নিয়ে ক্রেমলিন ঘুরিয়ে আনল। রাতে সুভাষদার সঙ্গে দেখা, ঠিক হল পরদিন সকালে আমরা লেখক সংঘের দপ্তরে যাব। মরিময় খবর পাঠিয়েছে। ফয়েজও নাকি থাকবে সেখানে।

পরদিন আমি আর সুভাষদা লেখক সংঘে পৌঁছে দেখি ফয়েজ বসে আছেন। আমাদের সঙ্গে নাতাসা ছিল। লুৎফা সকালটা ছুটি নিয়েছে। বিকেলে ফয়েজের কাছে আসবে। ফয়েজ আমাকে জানালেন, যে লুৎফা ঠিক করে গিয়েছে আমাকে আর ফয়েজকে নিয়ে সে আর নাতাসা মস্কো ঘোরাবে। আমি খুব খুশি, কদিন হল তো এখানে এসেছি ক্রেমলিন ছাড়া মস্কোর তো কিছুই দেখলাম না। যদিও মনে মনে আমি

জানতাম জার্মানি-ইংল্যান্ড ঘুরে মস্কো ফিরে এলে আমি সব কিছু দেখতে পারব। কিন্তু এমন সঙ্গী তো আর পাব না।

মরিয়ম এসে আমাদের মাঝে বসল। প্রস্তাব দিল, আজকের দুপুরের খাওয়া আমরা একসঙ্গে সারব। সেই খাওয়া হবে লেখক সংঘের ক্লাবে। কিছুক্ষণ গল্প-গুজব চলল। সে বাকু যায়নি তাই অধিবেশনের খবরাখবর নিচ্ছিল। যদিও সব খবর তার কাছে লিখিতভাবে আগেই পেশ করা হয়েছে। কে বা কারা পেশ করেছেন, আমি ঠিক জানতাম না। আমি কেন কারোরই জানবার কথা নয়। সেদিনই সন্ধ্যায় নাতাসা-লুৎফার মুখ থেকে যে কথা শুনলাম তাতে আমি ও ফয়েজ দুজনেই অবাক। দোভাষী হিসাবে আমাদের সঙ্গে সারাদিন কাটাবার পর পরদিন সকালে তাদের একটি লিখিত রিপোর্ট দিতে হয় মরিয়মকে। সেই রিপোর্টে থাকে সোভিয়েত আসার পর আমাদের মন্তব্য, আমাদের ভাবনা, আমাদের মানসিকতা, এমনকি দোভাষীর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত আচরণও সেখানে লিপিবদ্ধ থাকে। বুঝতে পারলাম কে.জি.বি আর কাকে বলে!

বেশ কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করবার পর আমি, সুভাষদা, ফয়েজ, নাতাসা আর মরিয়ম লেখক সংঘের ক্লাবে গেলাম। ক্লাবে ঢুকে আমরা অবাক! এ তো আমাদের কলকাতা কফি হাউসের বৃহৎ সংস্করণ। টেবিলে টেবিলে জটলা, সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার, সকলেই প্রায় উচ্চৈঃস্বরে গল্প করছে, কার কথা কে শুনছে, কে জানে! একটা খালি টেবিল বেছে মরিয়ম আমাদের সকলকে বসাল।

এখানে যাঁরা আড্ডা দিচ্ছে তাদের মধ্যে প্রবীণ থেকে নবীন সকল বয়সের মানুষেরাই আছেন। মরিয়মের কাছ থেকে জানলাম, উপস্থিত সকলেই লেখক সংঘের সদস্য। বিশেষ কেউ এখানে আসেন না। এলেও আসেন অতিথি হিসাবে। আমরা যেমন মরিয়মের অতিথি হিসাবে এসেছি।

টেবিল ঘিরে আমরা পাঁচজন বসেছি। আমাব বাঁ পাশে নাতাসা, ডানপাশে ফয়েজ, তারপর মরিয়ম এবং সবশেষে সুভাষদা। হঠাৎ দেখলাম কার ডাকে মরিয়ম উঠে গেল। একটু পরেই মরিয়মের সঙ্গে আমাদের মাঝে এসে বসলেন প্রায় ছ'ফুট লম্বা এক ভদ্রলোক। বয়সে আমার চেয়ে কিছুটা বড় মনে হল। মুখটা কেমন চেনা চেনা, কোথাও দেখেছি মনে হয়। কিন্তু কি করে দেখব, একজন রুশিকে দেখবার সুযোগ কোথায়! তবু চেনা মুখ কেন মনে হচ্ছে মনে মনে ভাবতে লাগলাম। এমন সময় মরিয়ম আমাদের ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নাতাসার পাশে চেয়ার টেনে বসেছিলেন ভদ্রলোক। আগেই লক্ষ করেছিলাম তার পোশাক-আশাক, চলাফেরার মাঝে কেমন যেন একটা খোলামেলা ভাব। পরিচয় শুনে আমরা সকলেই অবাক! সুভাষদা, ফয়েজ এর আগে অনেকবার মস্কো এসেছেন কিন্তু কখনই ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়নি। এমন কী মস্কোবাসী নাতাসার সঙ্গেও পরিচয় এই প্রথম। ভদ্রলোক হলেন বিশ্বখ্যাত রুশকবি ইয়েভতুশেঙ্কো। আমার মনে হল আমি যেন স্বপ্ন দেখছি।

ইয়েভতুশেঙ্কোর পাশাপাশি বসে কথা বলতে পারব এ আমার স্বপ্নেরও বাইরে। সুভাষদা, ফয়েজকেও দেখলাম কিছুটা উত্তেজিত। ইয়েভতুশেঙ্কোর সঙ্গে প্রথম আলাপের সুযোগে তাঁরাও মুগ্ধ। ইয়েভতুশেঙ্কোর চরিত্রের মাঝে লক্ষ করলাম একটা অস্থিরতা। এমন হাত-পা নেড়ে তিনি কথা বলছিলেন যাকে নাটকীয় বললেও কম বলা হবে। ইয়েভতুশেঙ্কোর নাম আমাদের সকলের কাছে পরিচিত। অনেকবার তাঁর ছবি দেখেছি। সেই কারণে প্রথম দর্শনেই আমার চেনা চেনা মনে হয়েছিল। ইয়েভতুশেঙ্কো যেন একাই একশো। অনর্গল কথা বলছেন। অন্য কাউকেই প্রায় কথা বলতে দিচ্ছেন না। এই সময় মরিয়ম একটি চার্মিনার সিগারেট ইয়েভতুশেঙ্কোর দিকে এগিয়ে দিল। ইয়েভতুশেঙ্কো সিগারেটে একটা টান মেরেই বলে উঠলেন, এই কারণেই ভারতকে আমি এত ভালবাসি। আমরা সবাই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম। আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল, আমাদের দেশকে ভালবাসার কারণ শুধু এই চার্মিনার, আর কিছু নয়।

ইয়েভতুশেঙ্কো দমবার পাত্র নন। বলে উঠলেন, তা কেন, তোমাদের চার্মিনার একটা প্রতীক। যারা চার্মিনার বানায় তারা এই চার্মিনারের মতোই সাচ্চা। তোমরা কী আমাদের মতো ম্যাড়ম্যাড়ে সিগারেট বানাও। আমাদের যেমন রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেভ, তেমনি আমাদের সিগারেট। তারপর মরিয়মের দিকে তাকিয়ে, কি মরিয়ম রাগ করলে নাকি, তোমাদের ব্রেজনেভকে আমি কখনই ভাল বলতে পারব না।

মরিয়ম বুদ্ধিমতি, বুঝতে পারল এই প্রসঙ্গ বাড়িয়ে লাভ নেই, কি বলতে কি যে বলে বসবে ইয়েভতুশেঙ্কো কে জানে!

বাইরের জগতে ইয়েভতুশেঙ্কো বিদ্রোহী কবি হিসাবে পরিচিত। কিছুদিন আগে তিনি ইউরোপ-আমেরিকা মাতিয়ে এসেছেন। সেই সময় আমাদের দেশেও কয়েকদিনের জন্য তাঁর আসবার কথা ছিল। আমরা জেনেছিলাম, ইয়েভতুশেঙ্কো দু'দিনের জন্য কলকাতায় আসবেন। কিন্তু না। আসেননি। দিল্লিতে একদিন থেকে তিনি মস্কোতে ফিরে গিয়েছিলেন। সংবাদপত্রে দেখেছিলাম তাঁর শরীর ভাল নেই।

আর এখানে দেখছি তাজা ইয়েভতুশেঙ্কোকে। টগবগ করে ফুটছেন। ইয়েভতুশেঙ্কোর চালচলনের সঙ্গে আমাদের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বেশ মিল আছে। দু'জনই অসম্ভব আবেগপ্রবণ। দুজনেই পানাসক্ত। আমি ইয়েভতুশেঙ্কোকে সে কথা বলেও বসলাম।

ইয়েভতুশেঙ্কো হো হো করে হেসে উঠে বললেন, এই তো দেখছ, তোমাদের দেশের কবির সঙ্গে আমার কেমন মিল। তারপর মরিয়মের দিকে তাকিয়ে বললেন, একবার এখানে নিয়ে এসো ওই কবিকে। দুজনে রাতের পর রাত বসে ভদকা খাব আর কবিতা পড়ব।

সুভাষদা, ফয়েজ কেউই কোনও কথা বলছিলেন না। অবাক হয়ে ইয়েভতুশেঙ্কোর কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছিলেন। এই সময় ইয়েভতুশেঙ্কো উঠে দাঁড়িয়ে একটি মেয়েকে

আমাদের টেবিলে ডাকলেন। তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন—এর নামও নাতাসা। উঠতি তরুণ কবি। তারপর দুই নাতাসাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলে উঠলেন, আমাদের একটি রুশ প্রবাদ আছে—একই নামে দুজন তরুণী যদি একসঙ্গে মিলিত হয়, তাহলে সে সময়টা হবে খুব শুভ। আমাদের আর কোনও ভাবনা নেই। দুই নাতাসা যখন একসঙ্গে মিলেছে তখন আমাদের এ আসর যে শুভ আসর হবে তাতে সন্দেহ কিছু নেই। দুই নাতাসাই দেখলাম লজ্জায় গুটিয়ে গেছে।

ইয়েভতুশেঙ্কো কথার মাঝে মাঝে ব্রেজনেভকে আক্রমণ করছিলেন। ব্রেজনেভ তখন সোভিয়েতের প্রেসিডেন্ট ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম-সম্পাদক। সোভিয়েত লেখকদের যে এমন স্বাধীনতা আছে তা আমার জানা ছিল না। চিরকাল শুনে আসছি সোভিয়েত লেখকদের কোনও স্বাধীনতা নেই। কিন্তু এখানে তো দেখছি অন্যরকম! মত প্রকাশের তো পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। অবশ্য জানি না, প্রকাশ্য সভায় বা লেখালেখিতে সেই স্বাধীনতা আছে কিনা।

এইসব কথা বলতে বলতে ইয়েভতুশেঙ্কো হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের কথা তুললেন। বললেন, রুশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের যা অনুবাদ হয়েছে তা বেশির ভাগটাই তাঁর পড়া। তাঁর মনের মাঝে একটা দুঃখ আছে, তিনি রবীন্দ্রনাথের মূল লেখা পড়তে পারছেন না।

সুভাষদা তাঁকে বাংলা শিখবার কথা বললেন। সুভাষদা জানালেন, রুশিরা অনেকেই তো এখন বাংলা শিখছেন। অনেক বাঙালিও খুব ভাল রুশ ভাষা জানে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অনেক বাংলা লেখা মূল ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে।

ইয়েভতুশেঙ্কো সে কথায় কান দিলেন না। উল্টে বলে বসলেন, আমাকে তো তাহলে ভাষাতত্ত্ববিদ হতে হবে। তখন কি আর আমি কবি থাকতে পারব?

ফয়েজ কোনও কথা বলছিলেন না। মন দিয়ে ইয়েভতুশেঙ্কোর কথা শুনছিলেন।

এই সময় ইয়েভতুশেঙ্কো তাঁর ব্যাগ থেকে একটি বই বার করলেন। বইটি আমার দিকে দেখিয়ে বললেন, ব্রেজনেভের নির্দেশে আমার কবিতার বইটি সামান্য কিছু কপি ছাপা হয়েছে, যাতে বেশি সংখ্যাক পাঠকের কাছে পৌঁছতে না পারে। এই কথা বলে ইয়েভতুশেঙ্কো বইয়ের শেষ পাতাটি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি রুশ ভাষা জানি না, কিন্তু আন্তর্জাতিক সংখ্যাটা তো চিনি। দেখলাম মুদ্রণ সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার কপি। ইয়েভতুশেঙ্কোর মতে এই সংখ্যাটাই সামান্য। আমাদের মতো অনুন্নত দেশ দূরে থাক, কোনও উন্নত দেশেও এমন সংখ্যায় কবিতার বই ছাপা হতে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। সুভাষদা ও ফয়েজ—বাংলা ও উর্দু সাহিত্যে দুজন প্রথম সারির কবিও বিস্মিত।

মরিয়মও স্বীকার করল, হ্যাঁ, সংখ্যাটা খুবই কম। ইয়েভতুশেঙ্কোর বইয়ের চাহিদা আরও অনেক বেশি। মরিয়ম আশ্বস্ত করল, নিশ্চয়ই বইটি পুনরায় ছাপা হচ্ছে।

আর এই কথাতেই খেপে গেলেন ইয়েভতুশেঙ্কো। আক্রমণাত্মকভাবে বলে উঠলেন, একেবারে বাজে কথা। কখনও ছাপা হবে না। ওরা আমাকে চেপে দিতে চায়। যেহেতু আমি আমার কবিতায় সত্যি কথা বলি।

বুঝতে পারলাম, বাইরের জগতে ইয়েভতুশেঙ্কোর যে বিদ্রোহী কবি হিসাবে স্বীকৃতি আছে সে কথা একশো ভাগ সত্যি। ইয়েভতুশেঙ্কোর ক্ষোভকে উস্কে দেওয়ার জন্যে আমি বলে বসলাম, তাহলে তোমার এ দেশকে তুমি ভালবাস না?

ইয়েভতুশেঙ্কো রাগে এবার উঠে দাঁড়ালেন। গলা চড়িয়ে বলতে লাগলে— ব্রেজনেভের চেয়ে অনেক বেশি আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমার দেশ যদি কোনওভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে আমি অস্ত্র হাতে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে সেই আক্রমণকে রুখব। এই কথা বলে ইয়েভতুশেঙ্কো একটা কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

অসাধারণ আবৃত্তি! অভাবনীয় বাচনভঙ্গি। শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখে। দেখতে দেখতে আমাদের চারপাশে ভিড় জমে গেল। আবৃত্তির শেষে সবাই তাঁকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। দেখলাম মরিয়মও উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। আমরাও উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দেওয়া শুরু করলাম। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল এই হাততালি। অনুভব করতে পারলাম ইয়েভতুশেঙ্কোর জনপ্রিয়তা। তিনি যখন ইউরোপ-আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন তখন তাঁর কবিতা-পাঠ সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। এই সংবাদ আমি কাগজে পড়েছিলাম। আর সেই কবিতা-পাঠ আজ আমার নিজের কানে শোনার সুযোগ হল। ভাবতে বিস্ময় জাগে, কি ভাগ্যবান আমি!

প্রায় ঘণ্টাখানেক তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মদ্যপানের কোনো বিরতি ছিল না। কিন্তু বেসামাল হতে দেখলাম না। টুকিটাকি কথার পর আমরা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

পরে ভেবে দেখেছি তিনি সেদিন যে ব্রেজনেভের সমালোচনা করেছিলেন তার মধ্যে কত বেশি সত্যতা ছিল। ব্রেজনেভ সে সময় বেশ অসুস্থ, কিছু দিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তারপর আসেন গর্বাচেভ। আর তাঁর আমলেই সোভিয়েতের অবলুপ্তি ঘটে। ইউরোপের সব দেশ থেকে বিলীন হয়ে যায় সমাজতন্ত্র। সে বড় বেদনামাখা ইতিহাস। সেদিন সুভাষদা, ফয়েজ, আমি কেউ কি কখনও ভাবতে পেরেছিলাম যে এমন পতন ঘটবে সোভিয়েতের! ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই ঘুণ ধরে গিয়েছিল। ঠিক জানি না। রাজনীতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি আমি নই।

তারপর কেউ আর বেশিদিন মস্কো থাকিনি। প্রত্যেকের হাতেই ফেরার টিকিট ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার ব্যাপারটা ছিল স্বতন্ত্র। আমি যেহেতু পশ্চিমি জগতে যাব তাই আমার জার্মানির টিকিট নিজেই কাটতে হয়েছিল। আমি টাকা পাব কোথায়!

আমায় রুবল জোগাড় করে দিয়েছিল নাতাসা। তার জন্য ফয়েজ আমাকে বেশ ঠাট্টা করেছিল। ফয়েজ যাই বলুক, নাতাসা ব্যবস্থা না করলে আমার ভাই ও বন্ধুদের কাছে যাওয়া হত না। আমার ছোটভাই প্রণব বসু থাকত জার্মানির ভোপাটাল শহরে। আর আমার দুই বন্ধু বদিন-কৃষ্ণা থাকত লন্ডনে। আমি জানতাম, ওদের কাছে পৌঁছতে পারলে আমার টাকার অভাব হবে না। দুই পকেট ডলারে ভর্তি হয়ে যাবে। হয়েও ছিল। পশ্চিমি দেশ ঘুরে আমি আবার যখন মস্কো ফিরে এলাম সত্যিই আমি ধনী। পশ্চিমি দেশ থেকে নাতাসা ও লুৎফার জন্য নিয়ে এসেছিলাম সিগারেট, লিপস্টিক আর কিছু ইংরেজি বই। সোভিয়েতে ইংরেজি বইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। সব বই অবাধে আসতে দেওয়া হত না। মস্কো বিমানবন্দরে বইগুলি নিয়ে তাই অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সোভিয়েতের এই দিকটা আমার খুব খারাপ লেগেছিল। বইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা কিছুতেই মানা যায় না।

আমি যখন মস্কো ফিরলাম তখন সুভাষদা, ফয়েজ সবাই দেশে ফিরে গেছেন। লুৎফার কাছে ফয়েজ আমার জন্য একটি উপহার রেখে গেছেন। তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ বইয়ের একটি কপি। আমাকে উৎসর্গ করে নিজের হাতে লেখা। এর চেয়ে বড় উপহার আর কি হতে পারে! মস্কোতে আমি একা একা আর বেশিদিন ছিলাম না। লুৎফা আমাকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। সে কাজ করত মস্কো রেডিওয়। সে আমাকে দুটি ভাষণের ব্যবস্থা করে বেশ কিছু রুবল পাইয়ে দিয়েছিল। নাতাসার দেনা শোধ করেও আমার কাছে কিছু রুবল উদ্বৃত্ত ছিল।

সুভাষদা ফিরে যাওয়ার আগে মস্কো শহরে বসে আমি আর সুভাষদা একটা পরিকল্পনা করেছিলাম। আমরা স্থির করেছিলাম, ফয়েজকে একবার কলকাতায় নিয়ে আসতে হবে। ফয়েজের কাছে সে প্রস্তাব করাতে সে এককথায় রাজি। ঠিক হয়েছিল, আমি দেশে ফিরলে আমরা একসঙ্গে বসে দিনক্ষণ স্থির করব।

আমি দেশে ফিরবার পর থেকে সর্বভারতীয় মুশায়েরার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। দিনক্ষণ স্থির করে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানালাম। আলি সর্দার জাফরি, কাইফি আজমি ও আরও অনেককে আমন্ত্রণ জানালাম। ফয়েজ তো ছিলই। আমাদের মনে মনে ভয় ছিল পাকিস্তান সরকার ফয়েজকে কলকাতায় আসবার অনুমতি দেবেন কিনা। কিন্তু ভয় অমূলক। ফয়েজকে কোনওভাবে আটকানো হয়নি। এই মুশায়েরার অনুষ্ঠান আমরা করেছিলাম রবীন্দ্রসদনে। অতিথিরা সবাই ছিলেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। তাঁরা সকলেই ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মাননীয় অতিথি। সকল ব্যয়ভার রাজ্য সরকারই বহন করেছিল। রবীন্দ্রসদনও আমরা পেয়েছিলাম বিনামূল্যে। আমাদের এইসব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সুভাষদা আর আমি গিয়ে জ্যোতিবাবুকে যা যা প্রস্তাব করেছি তিনি সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু মেনে

নিয়েছেন। জ্যোতিবাবু খুব খুশি হয়েছিলেন, আমরা ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে আনতে সক্ষম হচ্ছি বলে।

ফয়েজ কলকাতায় এলে তাঁর দেখভালের দায়িত্ব নেন বর্তমান শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন ও তখনকার ডাকসাইটে পুলিশকর্তা আয়ান রশিদ। রশিদ নিজেও ছিলেন বিখ্যাত উর্দু কবি। মনে আছে, রবীন্দ্রসদনে তিল ধারণের স্থান ছিল না। ফয়েজকে দেখবার জন্য সবাই উদগ্রীব। এই প্রথম কলকাতা সফরে এসেছেন ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ। একটু উন্মাদনা তো হবেই। ফয়েজও খুব আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতার ওপর কবিতা লিখে তিনি মুশায়েরায় পাঠ করেছিলেন।

ফয়েজ বেশিদিন কলকাতায় থাকতে পারেন নি। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁকে কলকাতা ছাড়তে হয়। তবু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে উর্দু ভাষাভাষী জগৎ থেকে বিশাল সম্বর্ধনা জানানো হয়। ফিরে যাওয়ার আগে ফয়েজ আমাকে বলেছিলেন, তোমাদের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। তোমাদের জন্যই আমার কলকাতা দর্শন সম্ভব হল। আবার দেখা হলে তোমার আর সুভাষের প্রতি আমার ঋণ সুদে-আসলে পুষিয়ে দেব।

না, আর দেখা হয়নি। ফয়েজের সঙ্গে এটিই ছিল আমার শেষ দেখা। দেখা না হলেও ফয়েজের ছাপ আমার জীবনে ভীষণভাবে থেকে গেল। ফয়েজের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ আমার হয়নি। সুযোগও ঘটেনি। কিছুকালের মধ্যেই ফয়েজ এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। সুভাষদা এই দুঃসংবাদ আমাকে জানিয়েছিলেন। এই সংবাদে আমি এমন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলাম যে নিজেকে সামাল দিতে কয়েকদিন সময় লেগে গিয়েছিল।

ফয়েজ নেই। সুভাষদাও আর নেই। ভীষ্ম সাহনিও আজ আর নেই। আমি একা টিকে আছি। তবে আমারও মৃত্যুপরোয়ানা জারি হয়ে গিয়েছে। কতদিন এঁদের স্মৃতি বুকে বেঁধে এই সুন্দর পৃথিবীতে আছি জানি না।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

কেন জানি না যত দিন যাচ্ছে আমি যেন অতীতের মাঝে ডুবে যাচ্ছি। অতীত আমাকে টানছে। অতীতকে কেন অতীত বলে মনে হচ্ছে না। অনেক বছর আগে দিনগুলিকে আমি ছেড়ে এসেছি। বন্ধ করে নয়, খোলা চোখেই আমি দিনগুলিকে দেখতে পাই। আর সেইসব দিনে আমার জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে বাংলা শিশু সাহিত্যের অন্যতম রূপকার খগেন্দ্রনাথ মিত্রর সঙ্গে। ভাবতেই পারি না কয়েক বছর আগে খগেনদার শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। দমদমে খগেনদার বাড়ির কাছে শতবর্ষের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে খগেনদার সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলাম। সেখানে দাবি উঠেছিল আমি আরও কথা বলি। সময় না থাকায় আমি বেশি কথা বলিনি। আজ বলছি।

খগেন্দ্রনাথ মিত্রর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৫২ সালে। 'আগামী' পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর। পত্রিকা প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই খগেনদা 'আগামী'তে লেখা শুরু করেন। আর যতদিন 'আগামী' পত্রিকা বেঁচে ছিল ততদিন খগেনদার লেখা থেকে আমি বঞ্চিত হইনি।

খগেনদার ছিল অসাধারণ তারুণ্য। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বয়স খগেনদাকে স্পর্শ করতে পারেনি। খগেনদা ছিলেন প্রায় ছ'ফুট লম্বা। আশি বছর বয়সেও খগেনদার মেরুদণ্ড বাঁকা হতে দেখিনি। খগেনদার পরনে থাকত কোঁচা খোলা ধুতি ও সাদা ঢোলা পাঞ্জাবি। এই পোশাক ছাড়া অন্য কোনও পোশাকে খগেনদাকে কখনও দেখিনি।

খগেনদা তখন থাকতেন কেশব সেন স্ট্রিটে। খগেনদার বাড়িতে আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। ১৯৫৪ সালে 'আগামী' পটুয়াটোলা লেনে চলে আসবার পর খগেনদা প্রায় প্রতিদিন আমাদের কার্যালয়ে আসতেন এবং দীর্ঘসময় কাটিয়ে যেতেন। আমি দাদা বললে কি হয়, খগেনদা আমাকে নিজের ছেলের মতো দেখতেন। আজও খগেনদার ছেলেরা আমাকে নিজের বড়ভাই হিসেবে দেখে।

খগেনদা যখনই কোনও সাহিত্য সভায় যেতেন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেনই। এমন কী যেবার মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে শিশু সাহিত্য শাখার সভাপতি হলেন সেখানেও আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং একই ঘরে নিজের কাছে রেখেছিলেন। মনে আছে ঢাকুরিয়ায় একবার কবি সুনির্মল বসুর জন্মদিন পালিত হয়েছিল। সেই সভায় খগেনদা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুনির্মল বসু যে মজার কবিতাটি পড়েছিলেন সেটি তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে আমি 'আগামী'তে প্রকাশ করেছিলাম। খগেনদা খুবই খুশি হয়েছিলেন। সেই সম্বর্ধনা সভায় প্রমথনাথ বিশি থেকে শুরু করে প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

খগেনদা ছিলেন সর্বক্ষণের লেখক। অন্য কোনও জীবিকা তাঁর ছিল না। শুধুমাত্র

শিশু সাহিত্য রচনা করে তখনকার সংসার চালানো ছিল প্রায় অসম্ভব। খগেনদার অবশ্য ভাগ্য ভাল, বউদি ছিলেন একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

ছোটদের লেখা ছাড়াও খগেনদাকে প্রকাশনার নানা কাজে জড়িত থাকতে দেখেছি। 'চলন্তিকা' সংকলন করবার সময় রাজশেখর বসুর সহায়ক হিসাবে খগেনদা অনেকদিন কাজ করেছিলেন। খগেনদার ভাষা ও ব্যাকরণ জ্ঞান ছিল অসাধারণ। আমি যখনকার কথা বলছি তখন খগেনদার অমর সৃষ্টি 'ভোম্বল সর্দার'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আমার চোখের সামনে খগেনদা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড শেষ করলেন। চারখণ্ডে সমাপ্ত 'ভোম্বল সর্দার' বাংলার শিশু সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ।

ভোম্বল সর্দার যখন রুশ ভাষায় অনূদিত হয় তখন আমার কিঞ্চিত ভূমিকা ছিল। সময়টা মনে হয় পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। ন্যাশনাল বুক এজেন্সির তখন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন সুনীল বসু, যিনি 'কাটুদা' নামেই বেশি পরিচিত। 'ভোম্বল সর্দার' যে রুশ ভাষায় প্রকাশিত হতে চলেছে আমাকে ডেকে কাটুদাই প্রথম সেই খবর দেন। খগেনদাকে খবরটি জানাতে বলেন। খগেনদার বাড়ি গিয়ে আমি খবরটি জানাই। খগেনদাকে এমন খুশি হতে আমি কখনও দেখিনি। মুহূর্তের মধ্যে খগেনদা কেমন যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। উচ্ছলতা চাপতে পারছিলেন না। নিজে মিষ্টি কিনে এনে আমাকে খাওয়ালেন। এমন সুখবরের আমি বাহক।

ভোম্বল সর্দার শুধু রুশ ভাষায় নয় সোভিয়েতের অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল। তবে এই অনুবাদের জন্য খগেনদা কোনো সম্মান-দক্ষিণা পাচ্ছিলেন না। খগেনদা আমাকে চেপে ধরলেন, আমি গিয়ে ধরলাম কাটুদাকে। রুশ দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কপি রাইট আইনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে দেশের লেখকদের বই অনুবাদ করতে যেমন কোনও অনুমতির প্রয়োজন হত না, রুশ দেশও বিনা অনুমতিতে এবং বিনা সম্মান দক্ষিণায় যে-কোনো ভাষার যে কোনো বই অনুবাদ করে দিত। ভোম্বল সর্দারের ক্ষেত্রে একই রকম ঘটনা ঘটেছে। ন্যাশনাল বুক এজেন্সির সঙ্গে রুশ দেশের বইয়ের ব্যবসা ছিল। সেখানকার কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে কাটুদার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। কাটুদার চেষ্টায় খগেনদা শেষ পর্যন্ত কিছু টাকা পেলেন। টাকাটা এল ন্যাশনাল বুক এজেন্সির মাধ্যমে। কাটুদা আমাকে ডেকে সংবাদটি জানালেন। যতদূর মনে পড়ছে খগেনদা তখনকার দিনে এককালীন চোদ্দ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। খগেনদা তখন দমদম নাগেরবাজারে দেবীনিবাস রোডে বাড়ি করছেন। টাকাটা খগেনদার খুবই কাজে লেগেছিল। খগেনদার মুখ থেকেই সেই কথা শোনা। শুনেছি, খগেনদার স্বপ্নের সেই বাড়ি এখন আর নেই। সেই বাড়ি ভেঙে ছেলেরা ফ্ল্যাট বাড়ি বানিয়েছে।

খগেনদা শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। ভোম্বল সর্দার ছাড়াও 'বাংলার ডাকাত' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। বিশ্বের সেরা গ্রন্থগুলিকে খগেনদা সংক্ষেপে ছোটদের জন্যে ভাষান্তর

করেছেন। ছোটদের জন্য লেখা খগেনদার গল্পের সংখ্যা যে ঠিক কত তার সঠিক হিসেব এখনও বোধহয় হয়নি। খগেনদার উপর কেউ গবেষণা করছে সে কথাও শুনিনি। দীর্ঘকাল অবহেলায় অপ্রকাশিত থাকবার পর খগেনদার দ্বিতীয় পুত্র মুকুলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইদানীং অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছে। সেদিন হঠাৎ একটি বই হাতে আসতে দেখি আমাকে উৎসর্গ করা। খগেনদা যে আমাকে উৎসর্গ করেছেন একথা আমি জানতাম না।

আমার প্রথম বইয়ের প্রকাশক স্থির করে দিয়েছিলেন খগেনদা। মৌলিক নয়, অনুবাদ গ্রন্থ। আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্যিক হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর ছোটদের জন্য লেখা একটি উপন্যাস আমি অনুবাদ করেছিলাম। বোধহয় ১৯৫৪ সালে। বইটি আমাকে কাটুদা দিয়েছিলেন এবং অনুবাদ করতে বলেছিলেন। হাওয়ার্ড ফাস্টের অনুমতিও আনিয়ে দিয়েছিলেন কাটুদা। আমি বাংলা ভাষায় তাঁর ছোটদের লেখা অনুবাদ করছি জানতে পেরে হাওয়ার্ড ফাস্ট নিজে থেকে তাঁর দ্বিতীয় ছোটদের উপন্যাস আমাকে পাঠিয়ে দেন এবং বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। চিঠিতে একথাও জানিয়ে দেন কোনোরকম রয়্যালটি তাঁকে দিতে হবে না, সব কিছুই আমার প্রাপ্য। আমি দ্রুত সে বইটি অনুবাদ করি। প্রথম বইটির নাম 'টনির স্বপ্ন', আর দ্বিতীয়টি 'বন্য শিকারি'।

'টনির স্বপ্ন' প্রথম প্রকাশিত হয় সাহিত্যায়ন থেকে। খগেনদাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। খগেনদার 'পাথরের ফুল' ও 'টনির স্বপ্ন' একই দিনে প্রকাশিত হল। প্রকাশক সুনীলবাবু আমার হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিলেন। এই আমার প্রথম লিখে টাকা পাওয়া। সে ব্যবস্থাও করে দিলেন খগেনদা। খগেনদার উৎসাহে 'বন্য শিকারি' প্রকাশিত হল সঞ্চারী প্রকাশনী থেকে। দুটি প্রকাশনীরই আজ আর কোনও অস্তিত্ব নেই।

এখনকার মতো তখন সেরকম বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা ছিল না। লেখকেরা লিখে হয় টাকা পেতেন না, নয়তো পেতেন যৎসামান্য। তবু লেখকদের মধ্যে অসাধারণ নিষ্ঠা ছিল। খগেনদার মাঝে আমি সেই নিষ্ঠা লক্ষ করেছি।

খগেনদা এই সময় গবেষণার কাজ শুরু করেন। খগেনদার চিরকালের ইচ্ছা তিনি বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাস লিখবেন। খগেনদা নিয়মিত গ্রন্থাগারে যাওয়া শুরু করলেন। নতুন নতুন তথ্য পেলে আমাকে এসে বলতেন। তারপর শেষ করলেন বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ 'শতাব্দীর শিশু সাহিত্য'। অনেক অজানা তথ্য ও হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে এসে পড়ল। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি থেকে বৃহদাকারে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে খগেনদা 'আগামী'-কে অতি উচ্চাসন দিয়েছিলেন। অন্য পত্র-পত্রিকার তুলনায় 'আগামী'-র জন্য খরচ করেছিলেন অনেক বেশি পৃষ্ঠা। প্রথম মুদ্রণ দ্রুত শেষ হয়ে গেলেও দীর্ঘকাল দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত

হয়নি। জীবদ্দশাতে খগেনদা দ্বিতীয় মুদ্রণ দেখে যেতে পারেন নি। কিছুকাল আগে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি 'শতাব্দীর শিশু সাহিত্য'-র দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করেছে। বাংলা আকাদেমির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থ রচনার জন্য কোনো সম্মান খগেনদা পাননি। পরবর্তীকালে বাংলা শিশু সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে যাঁরা ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন তাঁদের সকলেরই ভিত্তিভূমি খগেনদার এই গ্রন্থ।

খগেনদা মার্কসবাদে বিশ্বাস করতেন। পার্টি সদস্য না হলেও তিনি ছিলেন পার্টির ঘনিষ্ঠ সমর্থক। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে খগেনদাকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখেছি। বামপন্থী আন্দোলনের বাইরে খগেনদা কখনও যাননি।

তবে খগেনদার মনের মাঝে একটা ক্ষোভ ছিল। খগেনদা মনে করতেন বামপন্থীরাও তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেন না। এ বিষয়ে তিনি প্রায়ই আমার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। এই ক্ষোভ প্রশমিত করবার জন্যে একবার আমি বলি, ঠিক আছে আপনাকে ভালভাবে সম্বর্ধনা জানাবো। সুনির্মল বসুর সম্বর্ধনা দেখবার পর থেকেই খগেনদার মনের কোণে এমন একটি ইচ্ছা যে উঁকিঝুঁকি মারছে তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি রাতারাতি 'খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্বর্ধনা কমিটি' গঠন করে ফেললাম। সভাপতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর সম্পাদক আমি। নারায়ণবাবু আমার খুব কাছের মানুষ—তাঁকে যা বলতাম তিনি তাতেই রাজি হয়ে যেতেন। কিন্তু কমিটি গঠন এক কথা আর আয়োজন অন্য কথা। বেশ কিছুকাল কেটে গেলেও আমি সম্বর্ধনার আয়োজন করে উঠতে পারছিলাম না। খগেনদা খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন। এমন সময় আমার কাছে সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল। নবগ্রামের 'মহাদেশ পরিষদ' ছিল বিশাল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। বার্ষিক অনুষ্ঠান করবার জন্য তারা রঙমহল থিয়েটার হল ভাড়া নিয়েছিল। আমার ছাপাখানা থেকে তাদের স্মারকপত্র ছাপা হচ্ছিল। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি বললাম, তোমরা তো বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'সিরাজউদ্দৌল্লা' নাটক করছ। তার আগে এক কাজ করো, খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে সম্বর্ধনা জানিয়ে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করো। তোমাদের খুব নাম হবে। অন্য সব ব্যবস্থা তোমরা করো। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আমি করব। 'মহাদেশ পরিষদ' এককথায় রাজি। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমাদের কোনও খরচখরচা নেই। লোক জড়ো করতে হবে না। অথচ ভর্তি হলে খগেনদাকে সম্বর্ধনা জানানো যাবে। নাটকের জন্য মহাদেশ পরিষদ যে হল ভর্তি করে দেবে একথা আমি জানতাম। 'মহাদেশ পরিষদের' সম্পাদক জ্ঞান চৌধুরীকে শুধু বলেছিলাম তুমি বেশ কিছু মেয়ে জোগাড় করে শাঁখ বাজিয়ে খগেনদার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কোরো। আমি যা চেয়েছিলাম জ্ঞান তার চেয়ে আরও অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করেছিল। কপাল কাকে বলে! আমার বন্ধু যশোদা সাহা এই সময়ে রাস্তায় একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে নিয়ে আসে। আমরা ব্যাগ খুলে দেখি

তাতে বেশ কিছু টাকা। আর ভাবনা কি! সম্বর্ধনার অর্থের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। আমার ওখানে তখন সাহিত্যিক শিল্পীদের জমাটি আড্ডা। সম্বর্ধনার বয়ান রচনা করল কবি সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্ত হাতে লিখে একটি শোভন-সুন্দর মানপত্র তৈরি করল। তাতেও কুড়িয়ে পাওয়া সব টাকা খরচ হল না। তখন আমরা খগেনদাকে উপহার দেওয়ার জন্য ভাল কলম কিনলাম। আর অবশিষ্ট টাকা থাকল আমাদের ট্যাক্সি ভাড়ার জন্য। খগেনদার সম্বর্ধনার সব ব্যবস্থা পাকা। 'মহাদেশ পরিষদের' স্মারক পত্রিকার প্রচ্ছদে খগেনদার সংবর্ধনার কথা বড় অক্ষরে ছাপা ছিল আর ভিতরে ছিল খগেনদার একটি জীবনী। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়েছিলেন 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দবাবু আর খগেনদাকে নিয়ে আমরা যখন হলে ঢুকছি তখন প্রায় শ'খানেক কিশোরী বা সদ্য যুবতী লালপাড় শাড়ি পরে শাঁখ বাজাচ্ছে আর ফুল ছড়াচ্ছে। জ্ঞানের ব্যবস্থাপনায় আমরা চমকে গিয়েছিলাম। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হলেও খুব সুন্দর হয়েছিল। বিবেকানন্দবাবু খগেনদা সম্পর্কে অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি আমার বক্তব্যে এমন একটা ভাব রেখেছিলাম যে খগেনদার সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যেই এই নাটক হচ্ছে। সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে খগেনদা বা আমরা যেসব লেখক বা প্রকাশককে বলেছিলাম তাঁরাও কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করেছিলেন। একমাত্র আমরা কতিপয় ব্যক্তিই জানতাম রহস্য কোথায়। পরের দিন 'বসুমতী' পত্রিকায় অনুষ্ঠানের বিশাল ছবি এবং রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। খগেনদা খুশি, তাঁর প্রিয়জন খুশি, 'মহাদেশ পরিষদ' খুশি, আর আমার চেয়ে খুশি কে আর হতে পারে! এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা কি আমি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম!

খগেনদা খুশি হয়ে আমাদের সকলকে তাঁর দেবীনিবাস রোডের বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। বাড়ির সকলকেই দেখলাম আমার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা। এমন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান তাঁরা কল্পনা করতে পারেননি। খগেনদা বললেন, এমন কাণ্ড যে তুমি ঘটাবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। আমি চুপ করে থাকলাম। কি আর বলব! কাণ্ড কি আর আমি ঘটিয়েছি। কাণ্ড ঘটিয়েছে আমার আর খগেনদার ভাগ্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে পরবর্তীকালে এই ঘটনার কথা বলাতে তিনি হেসে বলেছিলেন, 'খগেনবাবু রহস্যের কথা জানেন না তো!' আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম জানবার কোনও সুযোগ নেই। জানি না এতদিন পরে এই কাহিনি বলে ঠিক করলাম কিনা। মনে হল, ঘটনাটা যখন সত্যি তখন বলে দেওয়াই ভাল। আমার পাপ কিছুটা অন্তত কমবে। তাছাড়া খগেনদাকে সম্মান জানানোর মধ্যে আমার তো কোনও ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। আমার কপালে একটা সুযোগ এসেছিল আমি ব্যবহার করেছিলাম।

ইতিমধ্যে ষাটের দশকের গোড়ায় 'আগামী' পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল নানা কারণে। কিন্তু 'আগামী'র উদ্দেশ্যে তৈরি ছাপাখানাটি থেকে গেল। আমার কাছে

খগেনদার যাতায়াতও কিছুটা কমে গেল। তবে সপ্তাহে দু-তিনদিন খগেনদা আসতেন। নানা বিষয়ে আলোচনা হত।

ইতিমধ্যে ১৯৬২ সালে ঘটে গেল চীন-ভারত সংঘর্ষ। কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর শুরু হল তীব্র মতভেদ। সমর্থকেরাও সেই বিরোধ থেকে দূরে থাকলেন না। কমিউনিস্টদের উপর তখন শুরু হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তীব্র আক্রমণ। আগেই বলেছি আমার ছাপাখানা সেই আক্রমণ থেকে মুক্তি পায়নি। আমার ওখানে অনেকের আসা যাওয়া কমে গেলেও খগেনদা কিন্তু আগের মতনই নিয়মিত আসতেন। তখন আমাদের দুজনের আলোচনার বিষয়বস্তু একমাত্র চীন-ভারত সংঘর্ষ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তখন আমি খুব দ্বিধাগ্রস্ত, কোন পথ যে সঠিক বুঝতে পারছি না। খগেনদার অবস্থান ছিল স্পষ্ট। খগেনদা ছিলেন পূর্ণভাবে চীনের পক্ষে। চীন যে ভারত আক্রমণ করেছে বা করতে পারে একথা খগেনদা বিশ্বাস করতে পারতেন না। এই সময়েই রাজনৈতিক কারণে খগেনদার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কিছুটা চিড় ধরে। আমি 'কালান্তর' পত্রিকা প্রকাশে সম্মত হওয়ায় খগেনদা দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন। আমার কাছে আসা বন্ধ করেন। পথের মাঝে আমাকে দেখতে পেয়ে অভিভাবকের মতো প্রচণ্ড বকাবকি করেন।

এই সময়ে খগেনদার জীবনেও ঘটে এক মহাবিপর্যয়। আকস্মিকভাবে বউদির মৃত্যু ঘটে। খগেনদা একেবারে একা হয়ে পড়েন। এই বিয়োগব্যথা সহ্য করা ছিল খগেনদার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমি দেখা করতে গেলে কোনও কথা না বলে দীর্ঘ সময় খগেনদা চুপচাপ বসেছিলেন। আমিও কোনও কথা বলতে পারছিলাম না। বিশেষ কথা না বলে বিষণ্ণ মুখে আমি ফিরে আসি। তারপর খগেনদা কেমন যেন পরিবর্তিত মানুষ হয়ে গেলেন। প্রায় প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে গেলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই খগেনদা চীন-ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তখন অবশ্য নকশাল আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই সমিতিতে নকশালদের প্রাধান্য ছিল। খগেনদার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হলে বুঝতে পারতাম নকশালদের প্রতি খগেনদার গভীর দুর্বলতা। ভাবত সরকারের তিনি তীব্র বিরোধী।

এমন সময়ে খগেনদাকে তাঁর 'সুমন্ত্র' উপন্যাসের জন্য শিশু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই পুরস্কার প্রদান করতেন ভারত সরকার। ছোটখাটো অনেক পুরস্কার পেলেও খগেনদা বড় পুরস্কার কখনো পাননি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে খগেনদার খুব খুশি হবার কথা ছিল, কিন্তু হল তার বিপরীত। সবাইকে অবাক করে খগেনদা ভারত সরকারের এই পুরস্কার নিতে অস্বীকার করলেন। খগেনদার এমন সিদ্ধান্তে আমি চমকে উঠেছিলাম। খগেনদার কাছে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছিলাম। আমি যাওয়াতে খুশি হয়ে খগেনদা বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

ধীরে ধীরে খগেনদার শরীর ভেঙে পড়ছিল। বইপাড়ায় যাতায়াত অনেক কমে গেছে। খগেনদার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎও হয় খুব কম। যতটুকু দেখা-সাক্ষাৎ হয় তার থেকে বুঝতে পারি আমার প্রতি তাঁর স্নেহ এতটুকু কমেনি। আমার রাজনৈতিক মতামত নিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ একথা ঠিক, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে আমার প্রতি টান তাঁর এতটুকুও কমেনি।

তারপর একদিন সব শেষ। হঠাৎ দুপুরে টেলিফোন পেলাম খগেনদা আর নেই। আমাকে নিমতলা শ্মশানে যেতে বলা হল। এই দুঃসংবাদে আমি কেমন যেন পাথর হয়ে গেলাম। তিরিশ বছরের সম্পর্কের সমাপ্তি। আমার পা চলছিল না। মন একদম চাইছিল না শ্মশানে ওইভাবে খগেনদাকে দেখি। তবু গেলাম। আমি যখন পৌঁছলাম তখন সব শেষ। খগেনদার নিথর নিস্পন্দ দেহ দেখবার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি। খগেনদা তখন ছবিতে পরিণত হয়েছেন। দেওয়ালে টাঙানো চন্দন-শোভিত ছবি। খগেনদার মতো একে একে আমরা সবাই একদিন ছবিতে পরিণত হব। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি ভেঙে যাওয়া মনে বাড়ি ফিরে এলাম। আমার কাছে খগেনদার যে ছবি থাকল সে ছবি অন্যের চেয়ে একেবারে পৃথক। সে ছবি আঁকা আছে আমার বুকের মাঝে। সেই ছবি বহন করে আজও আমি পথ চলেছি। আমার কাছে খগেনদা ছিলেন, আছেন, যতদিন বাঁচব ততদিন থাকবেন।

চিন্মোহন সেহানবীশ

মানুষ পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার পরিবেশই মানুষ সৃষ্টি করে। জীবনের পথে যেতে যেতে এই সত্যটুকু আমি উপলব্ধি করেছি। কখনও সখনও জীবনে এমন সান্নিধ্য জোটে যা আমাদের অনেক বেশি মার্জিত, অনেক বেশি পরিশীলিত করে তোলে। চিন্মোহন সেহানবীশের সান্নিধ্য আমার জীবনে একটি বিরল পাওনা।

চিন্মোহন সেহানবীশকে আমরা সবাই চিনুদা বলে ডাকতাম। চিনুদাকে আমি প্রথম দেখি ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে প্রগতি লেখক সংঘের কার্যালয়ে। মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা, গায়ে পাঞ্জাবির আধা হাত গোটানো। বেশির ভাগ সময়েই খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবি। প্রগতি লেখক সংঘের সেই রমরমা দিন তখন আর নেই। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হবার পর সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। পার্টি আইনি হবার পর প্রগতি লেখক সংঘকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা চলছিল এবং তার পুরোভাগে ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ। আমি তখন প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছি। পুনরায় নিয়মিত সাহিত্য বৈঠক শুরু হয়েছে। প্রগতি লেখকেরা অনেকেই আসছেন। নিয়মিত যোগ দিচ্ছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বিজন ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, চিন্মোহন সেহানবীশ এবং আরও অনেকে। আমার কাজ হল চিনুদাকে সাহায্য করা। আর সেই সাহায্য থেকেই ঘনিষ্ঠতা, যে ঘনিষ্ঠতা চিনুদার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। ৪৬ নম্বরকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রচেষ্টা অবশ্য বিশেষ সফল হয়নি। ৪৬ নম্বরে শুধু প্রগতি লেখক সংঘ নয়, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির কার্যালয় ছিল। মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও পরবর্তীকালে বিধায়ক মনোরঞ্জন বড়াল ৪৬ নম্বরেই বাস করতেন। ৪৬ নম্বরের প্রতি চিনুদার ছিল গভীর দুর্বলতা। ৪৬ নম্বর নামে একটি নিবন্ধে তিনি এই আস্তানাটির বিশদ বর্ণনা করে গেছেন। সেই নিবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি কত লেখক, কত শিল্পী, কত গুণীজনের আনাগোনা ছিল সেখানে। কত দেশি-বিদেশি গুণীজনের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে ৪৬ নম্বর। ওই পথ দিয়ে যাবার সময় নিজের অজান্তে এখনও দৃষ্টি চলে যায় ওই ঐতিহাসিক বাড়িটির দিকে।

আমি যখনকার কথা বলছি তখন চিনুদারা থাকতেন উত্তর কলকাতার খান্না সিনেমার কাছে আপার সার্কুলার রোডে। চিনুদা ও তাঁর অসাধারণ রূপসী ও বিদুষী স্ত্রী উমা সেহানবীশকে নিয়ে দু'জনের সংসার। শিক্ষাব্রতী হিসাবে উমাদির অবদান সর্বজন স্বীকৃত। উমাদি কলকাতার বিখ্যাত স্কুল পাঠভবনের প্রতিষ্ঠাতা।

চিনুদাদের আপার সার্কুলার রোডের বাসায় আমি অসংখ্যবার গিয়েছি। স্বামী-স্ত্রীর এমন সুমিষ্ট ব্যবহার, এমন আতিথেয়তা কেউ ভুলতে পারে না।

প্রগতি সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনে আমরা চিরকাল চিনুদার নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিয়েছি। মতভেদ হয়নি তা নয়, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কে চিড় কখনও ধরেনি।

লক্ষ করেছি বাইরের জগতেও চিনুদার বিশেষ স্বীকৃতি ছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মকথায় চিনুদার ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছেন—কমিউনিস্টদের আক্রমণ করলেও।

প্রগতি লেখক সংঘকে পুরানো স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে রামমোহন লাইব্রেরি হলে একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ ও বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ননী ভৌমিক। সম্মেলন তখন খুব সার্থক হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। প্রগতি লেখক সংঘকে পুনরুজ্জীবিত করতে আমরা সক্ষম হলাম না। প্রগতি শব্দটি নিয়েই তখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিতর্কও শুরু হয়ে গিয়েছে। বিতর্কে আমি চিনুদার পাশে সবসময় ছিলাম। যাইহোক প্রগতি লেখক সংঘের মৃত্যু বোধহয় তখনই ঘটল। অনেক পরে সত্তরের দশকে সংঘকে পুনরুজ্জীবিত করবার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রগতি লেখক সংঘের অস্তিত্ব এখনও আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সে মৃত। এত উজ্জ্বল ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও একটি লেখক সংগঠনের এমন করুণ পরিণতি সত্যিই বিস্ময় জাগায়।

প্রগতি সাহিত্য সংঘ উঠে গেলেও সাহিত্য আন্দোলন কিন্তু থেমে যায়নি। আর সেই সাহিত্য আন্দোলনের পুরোভাগে সবসময় ছিলেন চিনুদা।

পার্টির নেতৃত্বে লেখকদের প্রতিনিধি হিসাবে চিনুদা সবসময়ই ছিলেন—অবিভক্ত পার্টিতে এবং পার্টি ভাগ হওয়ার পরে। পার্টি বেআইনি হওয়ার সময় চিনুদাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘকাল তাঁকে কারাবাস করতে হয়। জেলে একবার নিরস্ত্র, নিরাপরাধ বন্দিদের ওপর নির্মমভাবে লাঠিচার্জ হয়। চিনুদা গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁর পিঠে যে লাঠির নৃশংস আঘাত লেগেছিল সেই আঘাতের যন্ত্রণা তাঁকে সারা জীবন বহন করতে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোনও যন্ত্রণাই চিনুদাকে তাঁর দায়িত্ব থেকে কখনও দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। কলকাতায় এবং দিল্লিতে কত সভা, সমিতি ও সম্মেলনে চিনুদার সঙ্গে যোগ দিয়েছি তার সব হিসেব আজ আর মনে করতে পারি না।

পার্টির পক্ষ থেকে 'আগামী' পত্রিকার সঙ্গে চিনুদার কিছুকাল যে সম্পর্ক ছিল সে কথা আগেই বলেছি। নানাভাবে চিনুদা তখন আমাদের সাহায্য করেছেন। চিনুদার চেষ্টায় আর্থিক সাহায্য দিয়ে যারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ে স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ও তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া আচার্যের নাম। সুপ্রিয়া আচার্য ছিলেন বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রর দিদি। সুচিত্রাদির আর এক দিদি ছিলেন উমা সেহানবীশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

পার্টির প্রতি চিনুদার ছিল অসাধারণ আনুগত্য। পার্টির সিদ্ধান্ত থেকে কখনও সরে যেতে দেখিনি। আমাদের অনেকের মধ্যেই অনেক ঢিলেঢালা ভাব ছিল। পার্টি নেতৃত্ব লেখক ফ্রন্টে এইসব ঢিলেমিকে প্রশ্রয় দিতেন। কখনই হস্তক্ষেপ করতেন না। চিনুদার মাঝে ঢিলেমি একদম ছিল না। চিনুদা মাঝে মাঝে বিরক্তও হতেন, কিন্তু সেই বিরক্তির প্রকাশ ছিল একেবারে খাঁটি ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে। আমরা বুঝতে পারলেও বাইরের লোক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বুঝতে পারত না। চিনুদা নিজেও ছিলেন ব্রাহ্ম। উমাদিদের পরিবারও ব্রাহ্ম পরিবার। চিনুদাদের পরিবারের বন্ধন ছিল খুব নিবিড়। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ ছিলেন চিনুদার আপন পিসতুতো ভাই। চিনুদার সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং স্নেহলাভে আমি ধন্য হয়েছি।

ষাটের দশকের গোড়ায় চিনুদা-উমাদি উত্তর কলকাতা ছেড়ে দক্ষিশ কলকাতায় চলে আসেন। আমি দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা, তাই চিনুদার কাছে যাতায়াতের সুবিধা। দক্ষিণ কলকাতায় চিনুদার বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন দিলীপ বসু। দিলীপ বসু আজীবন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। দীর্ঘকাল বিলেতে ছিলেন। গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এবং ভারততত্ত্ববিদ আর.পি.দত্ত ছিলেন দিলীপবাবুর খুবই ঘনিষ্ঠ। আর পি. দত্তের লেখা 'ইন্ডিয়া টুডে' বা 'আজকের ভারত' ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে আজও অপরিহার্য। বিলেত থেকে ফিরে দিলীপবাবু পার্টির শিক্ষা ও শান্তি ফ্রন্টের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। দিলীপবাবুরা এপার বাংলার বনেদি পরিবার। চন্দননগরের বসু। কলকাতায় তাঁরা অসংখ্য বাড়ির মালিক। কিছু পিতৃকুল, কিছু মাতৃকুল থেকে পাওয়া। এমনি একটি চারতলা বাড়ি হল ১৯ নম্বর ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোড। তার সামনের দিকে একতলায় চিনুদাদের দিলীপবাবু বাস করবার ব্যবস্থা করে দিলেন—নামমাত্র ভাড়ায়। কিছুদিনের মধ্যে আমাকেও ওই বাড়িতে বাস করবার ব্যবস্থা দিলীপবাবু করে দিয়েছিলেন। সে কথা পরে বলছি। উত্তর কলকাতার আস্তানার তুলনায় দক্ষিণ কলকাতার এই আস্তানা ছিল অনেক বেশি প্রশস্ত। চিনুদার অসংখ্য বই ও পত্র-পত্রিকা খুবই দুষ্প্রাপ্য। চিনুদার খুব সুবিধা হল।

চিনুদার বাড়িতে বসত জমাটি আড্ডা। রাজনীতি থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি সবই সেই আড্ডার বিষয়বস্তু। রাজনীতিক থেকে সাহিত্যিক সকলেই সেই আড্ডায় যোগ দিতেন। বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে বয়ঃকনিষ্ঠ সকলের জন্যই অবারিত দ্বার। আড্ডার যে কোনও নিয়মিত দিন বা সময় ছিল তা নয়। তবে ছুটির দিন এবং সকালের দিকে আড্ডাটা জমত বেশি। এই আড্ডার মধ্যে থেকে কত রকমের রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কার্যকলাপের জন্ম হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অনেক গোপন সিদ্ধান্ত এই বাড়ি থেকে গৃহীত হয়েছে। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ঐতিহাসিক সেই ঘটনা। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট

মন্ত্রীসভার পতন ঘটালেন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পিছন থেকে ছুরির আঘাতে। তদানীন্তন রাজ্যপাল ধরমবীর ছিলেন এই কুচক্রান্তের সক্রিয় সহায়ক। বিধানসভার অধ্যক্ষ তখন বিজয়কুমার ব্যানার্জী। তিনি বিধানসভার চাবি পকেটে পুরে বিধানসভা বন্ধ করে যে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিলেন সে কথা অনেকেরই জানা।

তার নেপথ্য কাহিনিটি আমি এখানে বলছি। ঐতিহাসিক এই রায়ের বয়ান রচনা করেছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী কুমারমঙ্গলম। কুমারমঙ্গলম পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রীসভায় দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রী হয়েছিলেন ও মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। পরদিন বিধানসভায় বিজয় ব্যানার্জী যে বয়ান পাঠ করবেন তার মহড়া শুরু হয়েছিল চিনুদার বাড়িতে আগের দিন সন্ধ্যায়। খুবই গোপনে। আমরা চারজন ছাড়া এই গোপনীয়তার কথা কেউ জানত না। চারজন হলাম চিনুদা-উমাদি, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত আর আমি। মনে আছে আমি আর নিরঞ্জনবাবু বালিশ গুঁজে গুঁজে জানলার ফাঁকগুলি বন্ধ করেছিলাম, যাতে বাইরে কোনওরকম শব্দ না যায়। বিজয় ব্যানার্জীর বার বার পড়তে ভুল হচ্ছিল। তাঁর কথা বলার ঢং ও অঙ্গভঙ্গি লক্ষ করে পাশের ঘর থেকে হাসি চাপা আমাদের খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। উমাদি ঠোঁটে আঙুল তুলে বার বার আমাদের সাবধান করছিলেন। অল্পক্ষণেই মহড়া শেষ। একে একে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের গাড়ি রাখা ছিল অনেক দূরে। পরের দিন বিধানসভায় বিজয় ব্যানার্জীর নিখুঁত অভিনয় আমাদের চমকে দিয়েছিল। গত রাতের জড়তার বিন্দুমাত্র লেশ সেখানে ছিল না।

সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনে চিনুদার ভূমিকার কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার একটি মাত্র উদাহরণ আমি এখানে দিলাম।

১৯৭০ সালে জানুয়ারি মাসে সংসার পেতে আমি ১৯ নম্বর ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোডে বাস করতে আসি। চিনুদার মতো নামমাত্র ভাড়ায় দিলীপ বসু আমাকে আস্তানাটি দিয়েছিলেন। চিনুদা থাকতেন সামনের দিকের একতলায়। আমি থাকতাম পিছনের তিনতলায়। সামনের তিনতলায় কিছুকাল ছিলেন সুচিত্রা মিত্র। চারতলায় শান্তিনিকেতনের ক্ষিতীশ রায়। আর পিছনের একতলায় অনেকদিন ছিলেন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন। ভবানীবাবু অবশ্য খাওয়া-দাওয়া করতেন চিনুদার কাছেই। আমি শরৎ ব্যানার্জী রোডে চলে আসার পর চিনুদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আরও ঘনীভূত হয়। প্রতিদিনই তখন চিনুদার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে। সকালে নীচে নেমে চিনুদার বাড়িতে চা খাওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। বেশিরভাগ দিনই আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিতেন বটুকদা, অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। বটুকদা এক অসাধারণ চরিত্র। তিনি তখন দিল্লি ছেড়ে চলে এসেছেন। কমলা গার্লস স্কুল ও পাঠভবনে গানের শিক্ষক। আমার দিদি গীতা ঘোষ তখন কমলা গার্লসের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তাঁরই চেষ্টায় কমলা

গার্লসে বটুকদার চাকরিটি হয়। বটুকদার কবিতা 'মধুবংশীর গলি'-র কথা আজ অনেকেই জানেন না। শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে 'মধুববংশীর গলি'-র আবৃত্তি যাঁরা শোনেননি তাঁদের জীবন অসার্থক বলে মনে হয়। বটুকদার সৃষ্ট 'নবজীবনের গান' চল্লিশের দশকে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সত্যজিৎ রায় ছিলেন বটুকদার অসাধারণ ভক্ত, কবি বিষ্ণু দে তাঁর প্রিয়তম বন্ধু। বিষ্ণুবাবুর মুখ থেকে শোনা একটি গল্পের কথা বলি। বিষ্ণুবাবু, সমর সেন আরও দু-একজন বটুকদাকে নিয়ে একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আধুনিক তরুণ কবি হিসেবে বিষ্ণুবাবু-সমরবাবুরা তখন খুবই পরিচিত এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। শান্তিনিকেতনে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথ খুব হাসি-খুশি মেজাজে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। সকলের কুশল সংবাদ জানবার পর বটুকদাকে চিনতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ বটুকদার পরিচয় জানতে চাইলেন। বটুকদা পাবনার বিখ্যাত জমিদার বংশের ছেলে এবং বটুকদার পরিবারকে কবি ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন। বটুকদার পরিচয় জেনে রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশি হলেন। বটুকদার কবিতা রবীন্দ্রনাথের আগে পড়া হয়নি। তাই বটুকদাকে কবিতা পাঠাতে বললেন। বেশ খোলামেলা খুশির আবহাওয়ায় আলোচনা চলছে। এর মধ্যে কে একজন কবির স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রবীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, 'আমার স্বাস্থ্য এই বয়সে আর কী ভাল থাকবে! বয়স হয়েছে দিন গুণছি, এখন যেতে পারলেই হয়!'

বটুকদা কিছু না বুঝে দুম করে বলে উঠলেন, তা তো ঠিক, তা তো ঠিক।

সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে গেলেন। আর একটিও কথা বললেন না। সোজা উঠে পড়লেন। যাওয়ার সময় গম্ভীরভাবে বলে গেলেন, 'তোমরা এবার এস।'

বাইরে বেরিয়ে সবাই বটুকদাকে এই মারে তো সেই মারে। বটুকদা বুঝতেই পারছেন না কি অন্যায় করেছেন। কবির অত রাগের কারণটাই বা কি!

বিষ্ণুবাবু বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্পটি করতেন। বটুকদাকে আমরা চেপে ধরলে বটুকদা জবাব দিতেন, এসব বিষ্ণুর বানানো গল্প।

চিনুদা ছিলেন বটুকদার অকৃত্রিম বন্ধু। বটুকদাকে নিয়ে নানারকম চুটকি চিনুদাও ছাড়তেন। চিনুদা নিজেই ছিলেন চুটকির রাজা। আমি একবার 'আগামী'র শারদীয় সংখ্যায় চিনুদাকে দিয়ে একটি মজাদার চুটকি লিখিয়েছিলাম। চিনুদা অবশ্য গোড়ায় লিখে দিয়েছিলেন এই হাসির গল্পটি তাঁর বন্ধু বিখ্যাত উর্দু কবি পারভেজ শাহিদির কাছ থেকে পাওয়া।

চিনুদার কথা বলতে গিয়ে বটুকদার আরও কথা মনে পড়ছে। বটুকদা কিছুকাল হাজারিবাগের বোকারো থার্মাল স্টেশনে শিক্ষকতা করেছিলেন। আমার দাদা ছিলেন সেখানকার ইঞ্জিনিয়ার। আমি একবার মাসখানেক বোকারোয় গিয়েছিলাম। প্রতি রবিবার সকালে বটুকদা আমাকে নিয়ে সেখানে পাহাড়ে উঠে যেতেন। সঙ্গে থাকত একটা

দূরবীন। বটুকদা অসাধারণ পাখি চিনতেন। চোখে দূরবীন লাগিয়ে আমাকে পাখি চেনাতেন। চিনুদার মুখ থেকেও শুনেছি সত্যজিৎ রায় তাঁর কাঞ্চনজঙঘা ছবিতে যে পাখি দেখার দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন তা নাকি বটুকদাকে দেখেই—সত্য-মিথ্যা আমি জানি না। বটুকদার চরিত্রের সঙ্গে অদ্ভুত মিল বটুকদার মৃত্যুর। হায়দরাবাদ থেকে কলকাতায় আসবার সময় ট্রেনে ঘুমন্ত অবস্থায় বটুকদার মৃত্যু ঘটে। বটুকদার পরিচয় জানতে পেরে হাওড়া রেল পুলিশ থেকে সুভাষদাকে খবর পাঠায়। সুভাষদা ডেকে পাঠান আমাকে। আমরা সারা রাত বরফের বিছানায় বটুকদাকে শুইয়ে রেখেছিলাম। পরম নিশ্চিন্তে বটুকদা যেন ঘুমোচ্ছিলেন। মনে আছে সকাল থেকেই দলে দলে লেখক শিল্পীরা সমবেত হয়েছিলেন। তারপর কাচের গাড়িতে বটুকদাকে সামনে রেখে আমরা বটুকদা রচিত সেই বিখ্যাত গান 'এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার' গাইতে গাইতে বটুকদাকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পৌঁছে দিয়েছিলাম। তারপর বটুকদা মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন।

শ্মশান থেকে ফিরে সেদিন চিনুদার বাড়িতে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলাম। আমরা বেশ কয়েকজন ছিলাম কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছিলাম না। কারুর উপস্থিতি উপলব্ধি করছিলাম না। এতগুলো মানুষ, তবু ঘরের মাঝে অসীম শূন্যতা। সবাইয়ের মনের মাঝে বোধহয় একটি অনুভূতিই জাগ্রত ছিল। বটুকদা এখন সীমা থেকে অসীমে।

চিনুদার ছিল অসাধারণ স্থৈর্য ও ধৈর্য। বাইরের আচরণে শোকের কোনও চিহ্ন লক্ষ করা যেত না। কিন্তু চিনুদাকে আমি দীর্ঘকাল কাছ থেকে দেখেছি। ভিতরে ভিতরে যে চিনুদা ভাঙছেন তা আমি বুঝতে পারতাম। মনের এ ভাঙন শুরু হয়েছিল দেবব্রত বিশ্বাস বা জর্জদার মৃত্যুর পর থেকে। জর্জদা ছিলেন চিনুদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একসঙ্গে গণনাট্য আন্দোলন করেছেন। জর্জদার সঙ্গে আমারও খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। জর্জদা চাকরি করতেন হিন্দুস্থান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এ জর্জদার অফিসে আমি মাঝে মাঝে সময় কাটাতে যেতাম। জর্জদার এক সহকর্মী সুনীল ভট্টাচার্য ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু। জর্জদা খুব পান খেতেন। সঙ্গে সব সময় থাকত খুদে সাইজের একটা হামানদিস্তা। ওই হামানদিস্তায় পান ছেঁচে নিয়ে জর্জদা খেতেন। জর্জদার যানবাহন ছিল মোটর সাইকেল। ট্রাঙ্গুলার পার্ক থেকে মোটর সাইকেলে চেপে জর্জদা অফিসে আসতেন। ধুতি ও গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরিহিত রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম প্রবাদপুরুষকে কলকাতার নাগরিকরা অনেকেই এ অবস্থায় দেখেছেন।

চিনুদার মুখ থেকে আমি যেমন জর্জদার অনেক গল্প শুনেছি জর্জদার মুখ থেকেও শুনেছি চিনুদার গল্প। কি গভীর মনের টান ছিল দু'জনের!

জর্জদা রান্না করতে খুব ভালবাসতেন। যেখানে বসবার জায়গা সেখানে উনুনে রান্নার নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত। জর্জদার হাতের কত রকম রান্না যে খেয়েছি!

কখনও চিনুদার সঙ্গে, কখনও একা। আমাদের শরৎ ব্যানার্জীর আস্তানা থেকে জর্জদার বাসস্থান ছিল হাঁটা পথ। শেষের দিকে জর্জদা তাঁর ক্যাসেট ও রেকর্ড সংগ্রহ করছিলেন। একদিন সকালের দিকে আমি গেলে জর্জদা বললেন, আমি আমার কাজের একটা জাদুঘর বানাচ্ছি। আমার সব কিছুর সংগ্রহ সেখানে থাকবে। আমি চোখে দেখিনি এমন পুরানো রেকর্ড জর্জদা আমাকে দেখালেন। সব শেষে বললেন, চিনুকে আসতে বোলো। ওর সঙ্গে এ-ব্যাপারে আমার কথা বলার আছে। জর্জদার মৃত্যু ঘটে আকস্মিক। সেই জাদুঘরের যে কি পরিণতি হল আজও আমি জানি না।

জর্জদার মৃত্যুর খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে চিনুদা আমাকে ডেকে পাঠালেন। নীচে নেমে দেখলাম চিনুদার থমথমে মুখ। অনুভব করতে পারছিলাম প্রিয় বন্ধুর বিয়োগ ব্যথায় চিনুদার মনের ভেতরটা তোলপাড় হচ্ছে। কত স্মৃতির ঢেউ সেখানে এসে আছড়ে পড়ছে। হাঁটতে হাঁটতে চিনুদা আর আমি যখন জর্জদার বাসায় পৌঁছলাম তখন সেখানে দেখি বেশ ভিড় জমে গেছে। যাওয়ার পথে চিনুদা শুধু একবারই জর্জদার কথা বলেছিলেন, জর্জ সারা জীবন প্রচণ্ড হাঁপানি নিয়ে অসাধারণ সব গান গেয়ে গেল। কেউ জানতেও পারল না ধীরে ধীরে ওর ফুসফুসটা নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেই হাঁপানিতেই জর্জ চলে গেল।

আমি কোনও উত্তর দিইনি। কি উত্তর আমার দেওয়ার থাকতে পারে! কলকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের সর্বস্তরের মানুষ জর্জদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিলেন। চিনুদাকে দেখতে পেয়ে কয়েকজন তাঁকে মরদেহের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। চিনুদা-জর্জদার গভীর বন্ধুত্বের কথা অনেকেই জানত।

জর্জদার মৃত্যুর মতো চিনুদাকে আর একবার স্তম্ভিত করে দিল তাঁর আর এক প্রিয় বন্ধু বিজন ভট্টাচার্যর আকস্মিক প্রয়াণ। বিজন ভট্টাচার্য নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। স্বভাবে চিনুদা আর বিজনদা বিপরীত মেরুর মানুষ। চিনুদা কথা বলতেন আস্তে আস্তে অনুচ্চস্বরে। আর বিজনদা হৈ হৈ রৈ রৈ করে সব সময় কথা বলতেন। কথা বলবার সময় বিজনদা যেন অভিনয় করে দেখাচ্ছেন। অভিনয় ছিল বিজনদার রক্তে। কথা বলতে বলতে বিজনদা মাঝে মাঝে কলকাতার বনেদি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করতেন। চিনুদার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠত। মাঝে মাঝে বলে উঠতেন, বিজন তুমি থামবে? চিনুদার থামানোর চেষ্টায় বিজনদার উৎসাহ যেত দ্বিগুণ বেড়ে। কতবার আমি সামনে থাকায় বিজনদার উৎসাহে থাপ্পড় খেতে হয়েছে।

মনে পড়ে, বিজনদা যখন তাঁর 'দেবী গর্জন' নাটক শেষ করলেন তখন চিনুদার উদ্যোগে সি. পি. আই-এর প্রাদেশিক কার্যালয় বউবাজার স্ট্রিটে নাটকটি পড়বার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিজনদা চেয়েছিলেন ভবানী সেন নাটকটি শুনুক। ভবানীবাবু সমস্ত কাজ ফেলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই নাট্যপাঠ শুনেছিলেন। বিজনদা যখন অভিনয় করে করে অসাধারণ এই নাটকটি পাঠ করছিলেন তখন মনে হচ্ছিল দর্শক আসনে বসে

আমরা একক অভিনয় দেখছি। বিজনদার মুখে নাট্যপাঠ শোনা জীবনে এক বিরল প্রাপ্তি।

বিজনদা তখন একা, তাঁর কিশোর পুত্র আজকের বিখ্যাত সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্যকে নিয়ে পদ্মপুকুরে থাকতেন। আমি যখনকার কথা বলছি বিখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে বিজনদার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মহাশ্বেতাদি তখন থাকতেন আমাদের বাসার কাছাকাছি লেকমার্কেট অঞ্চলে। চিনুদার বাড়িতে বিজনদা যেমন আসতেন মহাশ্বেতাদিরও তেমনি যাতায়াত ছিল। মহাশ্বেতাদি তখন প্রচণ্ড সিগারেট খেতেন। চিনুদার ভীষণ অপছন্দ ছিল মেয়েদের এই সিগারেট খাওয়া। কতদিন আমার কাছে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন! মহাশ্বেতাদির চরিত্র অনেকটা বিজনদার মতো জীবনে ভরপুর।

এই সময় একটি ঘটনা বিজনদা চিনুদা এবং আমাকে খুব আঘাত দিয়েছিল। তখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। বিজনদার খুবই পরিচিত। চিনুদা-উমাদির সঙ্গে তো আরও ঘনিষ্ঠতা। ঘটনাটি যে কেন ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা আজও আমি পাই না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রসদনে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তখন প্রচার উপদেষ্টা ছিলেন অধীর চক্রবর্তী। অধীরদা যে আমার কত কাছের মানুষ সে কথা তো আমি আগেই বলেছি। অধীরদা আমাকে রাইটার্সে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এই স্মরণসভার সব দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। সরকারের দিক থেকে থাকবেন উপ-অধিকর্তা মনোজিৎ বসু। মনোজিৎবাবু নিজেও লেখক। অধীরদার কথা ফেলবার সাহস আমার ছিল না। মনের মাঝে অবশ্য একটু কিন্তু ভাব ছিল। সরকারি অনুষ্ঠানে কেমন যেন একটু আমলা আমলা গন্ধ থাকে। আমার চেষ্টা ছিল সেই গন্ধটাকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে স্মরণসভাটিকে যেন স্মরণীয় করে রাখা যায়। সরকারি এই অনুষ্ঠানের আগে বটুকদার ভক্তদের উদ্যোগে মুক্তাঙ্গনে একটি সার্থক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধীরদার সামনে বসে বক্তাদের একটি নামের তালিকা তৈরি হয়েছিল। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন। আমি এঁদের সকলের সঙ্গে কথা বলেছি। সকলেই বটুকদার ঘনিষ্ঠ। এককথায় রাজি। কিন্তু রাইটার্সে স্মরণসভার আমন্ত্রণপত্র আনতে গিয়ে আমি হতবাক। বক্তাদের মধ্যে বিজনদার নাম নেই। আমি অধীরদার কাছে ছুটে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার? অধীরদা বুঝতে পারছিলেন আমি খুবই বিক্ষুব্ধ। একটুখানি সময় নিয়ে অধীরদা আস্তে আস্তে বললেন, বিজনদার নামে সরকারের দিক থেকে একটু আপত্তি আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

অধীরদা জবাব দিলেন, বিজনদা ম্যাক্সমুলার ভবনে নাটক করেছেন। এটা কেউ খুব ভাল চোখে দেখছে না। এখানেই সরকারের আপত্তি।

আমি বললাম, সরকার না পার্টি?

অধীরদা হেসে বললেন, তা তুমি যা ভাবো।

আমি অধীরদাকে বললাম, আমি বিজনদাকে এ কথা বলব কি করে?

অধীরদা বললেন, তুমি আমন্ত্রণপত্রগুলি নিয়ে যাও। যাকে যাকে দিতে চাও দিয়ে দাও। আমি দেখছি কীভাবে বিজনদাকে বলা যায়।

অধীরদাকে বলতে হয়নি। আমি চিনুদার সঙ্গে কথা বলে বিজনদাকে নিজে গিয়েই বলে এসেছিলাম। আমার মুখ থেকে বামফ্রন্ট সরকারের আপত্তির কথা শুনে বিজনদা চমকে উঠেছিলেন। আজীবন বামপন্থী বামফ্রন্ট সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁকেও সরকার শত্রু ভাবছে, তাহলে মিত্র কে? বিস্ময় কাটিয়ে বিজনদা বললেন, আজই আমি জ্যোতিবাবুকে ফোন করব। তাঁর স্পষ্ট মতামত জানতে চাইব। ম্যাক্সমুলার ভবনে বিশেষ আমন্ত্রণে নাটক করা কোনও বামপন্থীর পক্ষে কি অপরাধ?

বিজনদা এমন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যে ঘরের মাঝে পায়চারি করতে করতে বার বার বলছিলেন 'আমি ভাবতেই পারি না!'

আমি চুপচাপ ছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম 'নবান্ন'-র স্রষ্টার এ কী পরিণতি!

রবীন্দ্রসদনে যথারীতি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমার মন ভেঙে গিয়েছিল। সমস্ত উৎসাহ নিমেষের মধ্যে উবে গিয়েছিল। তেমন প্রাণবন্ত ছিল না এই স্মরণসভা। এর চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত ছিল মুক্তাঙ্গনের সেই বেসরকারি স্মরণসভা।

বটুকদা চলে যাওয়ার পরে বিজনদা আর খুব বেশিদিন এই পৃথিবীতে থাকেননি। আকস্মিকভাবে কাউকে বুঝতে না দিয়ে বিজনদা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বিস্ময়ের কথা বিজনদার মৃত্যুর পরও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। কয়েক মাসের ব্যবধানে অচ্ছুৎ বিজন ভট্টাচার্য হয়ে গেলেন বামপন্থীদের শ্রদ্ধেয় নাট্যব্যক্তিত্ব। প্রহসন আর কাকে বলে!

পরপর তিনজন প্রিয়তম বন্ধুর বিয়োগে চিনুদা কেমন যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। সময় ও সুযোগ পেলে চিনুদা এই তিন বন্ধুর নানারকম কাহিনি বলতেন। এইসব গল্প বলার মধ্যে দিয়ে তিনি বোধহয় তাঁদের অস্তিত্ব অনুভব করতেন। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে চিনুদা হারালেন তাঁর তিনজন প্রিয়তম বন্ধু ও দীর্ঘকালের সাথীকে, আর আমরা হারালাম বাংলা সংস্কৃতি জগতের তিন দিকপাল—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, দেবব্রত বিশ্বাস ও বিজন ভট্টাচার্যকে।

লক্ষ করছিলাম, ধীরে ধীরে চিনুদা নিজেকে কেমন গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন।

চিনুদার পেছনে অনেকদিন ধরেই আমরা লেগেছিলাম যাতে চিনুদা এবার কলম ধরেন। সুভাষদা আর আমি তো দিনরাত চিনুদাকে খোঁচাতাম। চিনুদা ছিলেন একজন অসাধারণ গবেষক। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসেবেও তাঁর একটা পরিচিতি ছিল—যদিও তিনি লিখেছেন অত্যন্ত কম। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য বিশ্বভারতী প্রকাশনার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিনবিহারী সেনকে অহরহ চিনুদার কাছে আসতে দেখেছি।

শেষপর্যন্ত চিনুদা সত্যি সত্যিই লেখার কাজে হাত দিলেন। তার প্রথম ফসল হল 'রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী'। গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে চিনুদাকে আমি সব রকম সাহায্য করেছিলাম। আমার ছাপাখানা থেকে বইটি মুদ্রিত হয়েছিল। প্রকাশ করেছিল মনীষা গ্রন্থালয়। চিনুদার হাতে লেখা আমাকে উপহার দেওয়া সে-বই আজও আমার কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। দুঃখের বিষয় বইটি আজ আর পাওয়া যায় না।

চিনুদার পরবর্তী গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ।' এই বইটি লিখবার সময় চিনুদা প্রায়ই আমাকে পড়ে শোনাতেন। এমন সব নতুন নতুন তথ্য যা কখনই জানতাম না। দেশে-বিদেশে বিপ্লবীরা কি চোখে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি তারই সব অজানা কাহিনি। বিশ্বভারতী থেকে চিনুদার পরবর্তী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও টুকরো-টাকরা লেখা নিয়ে প্রকাশিত হল '৪৬ নম্বর।'

পরের দিকে সংগঠনের কাজ থেকে চিনুদা নিজেকে কিছুটা সরিয়ে নিয়েছিলেন। আমি ও সুভাষদা খুব খুশি হয়েছিলাম। এই সময় চিনুদা সংকলন করেন 'মুক্তিযুদ্ধে ভারত।' বিপ্লবীদের অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ছবি সংগ্রহ করেন চিনুদা। মৌলালি যুব কেন্দ্রে প্রথম একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। চিনুদা ঠিক করেছিলেন, তারপর গ্রন্থাকারে সব কিছু প্রকাশিত হবে। বইটি প্রথম প্রকাশ করবার কথা ছিল মনীষা গ্রন্থালয়ের। বেশ খরচসাপেক্ষ এই প্রকাশনা। মনীষা গ্রন্থালয়ের তখন দায়িত্বে ছিলেন কলকাতা পৌরসংস্থার উপ-মহানাগরিক মণি সান্যাল। মণিদা রাজ্য সরকারের কাছে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আর্থিক সহায়তা চেয়ে চিঠি পাঠান। তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বুদ্ধদেববাবু স্থির করেন রাজ্য সরকারই গ্রন্থটি প্রকাশ করবে এবং গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলীও গঠন করা হবে। চিনুদা আমাকে ডেকে সংবাদটি জানান। আমি ভীষণ অখুশি হই। চিনুদাকে সে কথা জানাই। কঠোর পরিশ্রম করে চিনুদা সব কিছু করলেন অথচ তাঁর নামের সঙ্গে এতগুলি নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। চিনুদাকে আমি বলেছিলাম আপনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন। উমাদি আমাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু অসাধারণ ভদ্রমানুষ চিনুদার পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব ছিল না। রাজ্য সরকার যে নিজস্ব উদ্যোগে প্রকাশ করছে তাতেই চিনুদা খুশি। ভিড়ের মাঝে তাঁর নাম থাকুক বা না থাকুক তাতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই।

এই হলেন চিনুদা। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমনতর সাগর-আসমান তফাত।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বৃহদাকারের 'মুক্তিযুদ্ধে ভারত' প্রকাশিত হল। যা ভেবেছিলাম তাই। নামের ভিড়ে চিনুদা প্রায় হারিয়ে গেছেন। ভাবলাম, যাঁদের নাম ওখানে ছাপা আছে তাঁদের কি বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ হল না। তাঁরা কি জানতেন না এই গ্রন্থে তাঁদের কারও কোনও অবদান নেই। অবদান একটি মাত্র মানুষের এবং তিনি হলেন চিন্মোহন সেহানবীশ।

চিনুদা ধীরে ধীরে কেমন অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। প্রতিদিন নীচে নেমে আমি চিনুদার সঙ্গে গল্প করতাম। একদিন না যেতে পারলে চিনুদা ডেকে পাঠাতেন। চিনুদার দিল্লি যাবার কথা ছিল কিন্তু যেতে পারলেন না। দিল্লিতে অনেকদিন থেকে চিনুদা গবেষণার কাজ করছিলেন। সি.পি.আই-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় অজয় ভবনের গ্রন্থাগারটি চিনুদার নিজের হাতে সাজানো। আমি নিজের চোখে সেই গ্রন্থাগার দেখে এসেছি। অসংখ্য মূল্যবান দলিল আছে সেই গ্রন্থাগারে। শুনেছি সেই গ্রন্থাগারের এখন নাকি খুব দৈন্যদশা।

চিনুদা একদিন খুব সকালে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি এলে চিনুদা তাঁর পরিকল্পনার কথা আমাকে জানালেন। বললেন, তিনি স্থির করেছেন তাঁর সংগ্রহে যে অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ আছে সব কিছু জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করবেন। চিনুদা আমার মতামত জানতে চাইলেন। চিনুদার সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানিয়েছিলাম। সত্যিই উমাদির পক্ষে এই সংগ্রহ রক্ষা করা সম্ভব নয়। একবার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি এখনই এসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কেন?' এই প্রথম চিনুদার চোখের কোণায় মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণা লক্ষ করলাম। ধরা গলায় চিনুদা বলেছিলেন, বুঝতে পারছি আমি আর বেশি দিন নেই।

আমি চুপচাপ। ভেতর থেকে একটা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। নিজের অজান্তে আমারও চোখ ভিজে গেল।

সত্যিই চিনুদা বেশিদিন থাকেননি। চিনুদা যেদিন চলে গেলেন সেদিন আমি ভাবতেই পারিনি এমন ঘটনা ঘটবে। প্রতিদিন সকালে চিনুদাকে দেখে যাই। কি কারণে সেদিন দেখা করতে পারলাম না। একই বাড়িতে তো থাকি নীচে আর ওপরে। প্রতিদিন দেখা না করার কোনও মানে হয় না।

বিকেলের দিকে ফোন এল—এখনই বাড়ি চলে আসতে হবে। চিনুদা খুবই অসুস্থ। আমি যেন দেরি না করি। আমি একটুও দেরি করিনি। যেমন অবস্থায় ছিলাম তেমন অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলাম। তবু আমার কপাল! প্রথমে ট্যাক্সি মেলে না, তারপর

যানজট। কলেজ স্ট্রিট থেকে লেকের কাছে আসতে লেগে গেল এক ঘণ্টারও বেশি সময়। ট্যাক্সি ছেড়ে আমি দৌড়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে গেলাম। শোয়ার ঘরে খাটের ওপর চিনুদা পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। আমি কল্পনাও করতে পারিনি চিনুদার সেই দেহ নিথর, স্পন্দনহীন। খাটের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিবেশিনী প্রার্থনা ঘোষ। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল। তিনিই আমাকে জানালেন কিছুক্ষণ আগে চিনুদা তাঁর প্রিয় পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পাশের ঘরে উমাদি। উমাদির পাশে আমার কন্যা পিয়ালী। তার হাতে উমাদির হাত ধরা।

ছেলেবেলা থেকেই আমার কন্যা পিয়ালী বা রুম্পা চিনুদা-উমাদির কাছেই মানুষ হয়েছে। উমাদি তাকে হাত ধরে পাঠভবনে নিয়ে গিয়েছেন, পড়াশুনো সব নিজেই দেখেছেন, আমি কোনও খোঁজ খবরই রাখিনি। চিনুদার অতি প্রিয় হল রুম্পা। চিনুদা তাকে নিয়ে কত গল্প না অন্যের কাছে করেছেন। চিনুদাদের কাছে রুম্পার অনেক মজার মজার ঘটনা আছে। রুম্পা ছেলেবেলায় কবি বিষ্ণু দে-কে 'বিষ্ণু' বলে ডাকত। চিনুদাদের বাড়িতে যে কোনও নিমন্ত্রিতই আসুন না কেন রুম্পার উপস্থিতি সেখানে থাকবেই। রুম্পা ছেলেবেলায় ওমলেট খেতে খুব ভালবাসত। উমাদি প্লেটে একটা ওমলেট সাজিয়ে রুম্পাকে বসিয়ে দিতেন। একবার উমাদিদের বাড়িতে কয়েকজন নিমন্ত্রিত আসার আগে উমাদি রুম্পাকে ওমলেট ধরিয়ে বলে দিয়েছিলেন, 'তুমি ওদের কাছে কোনও কিছু চেয়ো না।' বাধ্য মেয়ের মতো রুম্পা মাথা নেড়েছিল। নিমন্ত্রিতরা খাবার টেবিলে বসলে রুম্পা প্রথমেই তাদের জানিয়ে দিল, তোমরা আমাকে কোনও খাবার দিও না। উমাপিসি তোমাদের কাছ থেকে কোনও খাবার নিতে বারণ করেছে। নিমন্ত্রিতরা হেসে কুটিকুটি। লজ্জায় উমাদির চোখ মুখ লাল। চিনুদা অবশ্য রুম্পার কাণ্ডকারখানা উপভোগ করেছিলেন।

আর একবার চিনুদাদের এক আত্মীয় দেখা করতে এলে রুম্পা যথারীতি উপস্থিত হয়। আত্মীয়ের স্ত্রী ফিলিপিনের। উমাদি জানতেন মেয়েটি মিনি স্কার্ট পরে, তাই রুম্পাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে মেয়েটি আসলে তার ছোট জামা দেখে তুমি কিছু বোলো না। রুম্পা যথারীতি সম্মতিসূচক মাথা নেড়েছিল। তারপর অতিথিরা যখন এলেন তখন মেয়েটি রুম্পাকে কাছে টেনে নিল। চিনুদা লক্ষ করেছিলেন, রুম্পা অবাক হয়ে তার পোশাক দেখছে। বুঝতে পারছিলেন কিছু একটা অঘটন ঘটতে চলেছে। রুম্পা মেয়েটির পাশে গিয়ে বাবু হয়ে বসল। জামা সরিয়ে নিজেরও হাঁটু বার করল। তারপর নিজের হাঁটু ও মেয়েটির হাঁটুতে থাবা মেরে আগডুম বাগডুম খেলা শুরু করে দিল। মেয়েটি হেসে কুটিকুটি। কিছুই সে বুঝতে পারছিল না। তার স্বামী অবশ্য খুব উপভোগ করছিল। স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়েছিল তুমি এ বাড়িতে মিনি স্কার্ট পরে আর কখনও এসো না। তোমার খোলা হাঁটু পেলে রুম্পা কিন্তু একইরকম খেলা খেলবে। উমাদির কপালে হাত, কি আর বলবেন!

আর একদিনের ঘটনা। চিনুদা কি একটা কাজে উপরে আমার কাছে এসেছিলেন। আমার ছোট বোন তখন আমার কাছে থাকত। সে ছিল সাঁইবাবার ভক্ত। চিনুদা যখন উপরে এলেন তখন আমার ছোট বোন নীচুস্বরে সাঁইবাবার ভজন গাইছিল। আমরা লক্ষ করলাম রুম্পা বাবু হয়ে দুলে দুলে বিড়বিড় করে কি যেন গাইছে। চিনুদাই রুম্পার ভজন আবিষ্কার করলেন। আমার বোনের তালে তাল দিয়ে রুম্পা গেয়ে চলেছে—'বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাও বাপুরে...'। রুম্পার এই ভজনের কথা চিনুদা সারা কলকাতা শহরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সাঁই বাবার উদ্দেশে নিবেদিত এমন ভজন কেউ কখনও শোনেনি। তারপর থেকে চিনুদার বাড়িতে যে-ই আসে সে-ই রুম্পার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

রুম্পার কাজ ছিল ছুটির দিনে সকালে পিছনে দাঁড়িয়ে চিনুদার চুল আঁচড়ে দেওয়া। নড়াচড়া করলে চিনুদাকে বকুনি খেতে হত। সুবোধ বালকের মতো চিনুদা চেয়ারে বসে থাকতেন। আর পিছনে দাঁড়িয়ে রুম্পা খুশিমতন চিরুনি চালিয়ে যেত। চিনুদা বলতেন, রুম্পা চুল না আঁচড়ালে তিনি কিছুতেই লেখায় মন দিতে পারতেন না। এসব রুম্পার ছেলেবেলার কাহিনি। চিনুদা যখন চলে গেলেন তখন রুম্পা বেশ বড় হয়েছে, মাধ্যমিক পাস করেছে। তাই উমাদিকে আজ সে সান্ত্বনা দিচ্ছে। উমাদি তার হাতে হাত রেখে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করছেন।

ধীরে ধীরে ভিড় জমতে শুরু করল। রাজনীতি-সাহিত্য-শিল্প জগতের মানুষেরা সমবেত হলেন। সত্যজিৎ রায় প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত।

চিনুদা তাঁর মরণোত্তর দেহ দান করে গিয়েছিলেন। কিন্তু উমাদি সেই দেহদানে সম্মত হলেন না। তিনি জানিয়ে দিলেন চিনুদার মরদহ প্রথাগতভাবে দাহ হোক এটিই তাঁর ইচ্ছা। উমাদির ইচ্ছামতো আমরা চিনুদাকে নিয়ে গেলাম কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। তারপর সব শেষ। শুধু শূন্যতা। চুপচাপ ফিরে এলাম। চিনুদার ঘরে ঢুকতে আর ইচ্ছা করল না। সোজা উঠে গেলাম তিনতলায় নিজের আস্তানায়। কোনও কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। রুম্পা নীচে উমাদির কাছে। আমি জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অন্ধকার আকাশে চিকমিক করে জ্বলছে অসংখ্য তারা। মনে হল, ওই তারামণ্ডলীতে চিনুদা বোধহয় একটি তারা হয়ে মিলিয়ে গেলেন।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে আমি ছিলাম সাহিত্য আন্দোলনের কর্মী। ছাত্র আন্দোলন থেকে সোজাসুজি চলে আসি সাহিত্য জগতে। কলকাতায় তখন শান্তি আন্দোলন সবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনি যুগে ১৯৪৯ সালে দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে যে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে জমায়েত ছিল অনেক কম। পুলিশি আক্রমণের সম্ভাবনাও ছিল। সত্যি কথা বলতে কি সেই সম্মেলন মানুষের মাঝে কোনো দাগ কাটতে পারেনি।

কিন্তু পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় নতুন রূপে আমরা শান্তি আন্দোলনকে দেখতে পেলাম। সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে শান্তি আন্দোলনের যেহেতু গভীর সম্পর্ক ছিল তাই পরোক্ষভাবে আমি শান্তি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি। কলকাতার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগই সম্পর্কিত হয়ে পড়েন শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে। প্রথম সারির নেতৃত্বে যাঁদের আমি দেখেছি তাঁদের মধ্যে ড. মেঘনাদ সাহা, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম সবচেয়ে আগে মনে পড়ে। সাংবাদিক হিসেবে তখন দুটি নামকেই আমরা জানতাম, এক. সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার আর দুই. বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এখন যে সব সাংবাদিককে আমরা চোখের সামনে দেখি তাঁদের সঙ্গে প্রবাদপ্রতিম এই দুই সাংবাদিকের কোনো মিলই আমি খুঁজে পাই না। আজ দৈনিক পত্রিকার 'সম্পাদকীয়' কোনোরকম সাড়া জাগাতে পারে না। এমনকি কোনো কোনো সাংবাদিক-বন্ধুর মুখ থেকে শুনতে পাই দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগটি রাখবার আর কোনো প্রয়োজন নেই। অহেতুক স্থানের অপব্যবহার। আমরা যারা পুরোনো দিনের লোক তারা অবশ্য অন্য কথা জানি। সম্পাদকীয় বিভাগটিই যে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলে, তাকে সঠিক পথের নিশানা দেয় এই সত্যটুকুকে চিরকাল জেনে এসেছি। গান্ধী হত্যায় সোমনাথ লাহিড়ীর সম্পাদকীয়, এক পয়সার ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ থেকে শুরু করে খাদ্য আন্দোলনে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় আমরা আজও ভুলতে পারি না। সেইসব সম্পাদকীয়র একটি পৃথক ভাষা ছিল, শব্দ ব্যবহারের অসাধারণ নিপুণতা ছিল। মানুষের আবেগকে জাগ্রত করবার এক অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। এমন অনেক সম্পাদকীয় আজও আমার কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। কোনো অবসর মুহূর্তে যদি সেই সম্পাদকীয়গুলি নেড়েচেড়ে দেখি তাহলে নিজের অজান্তে বয়স পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে যায়, পরিণত হই এক তাজা যুবকে।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে আমি কেবলমাত্র সাংবাদিক হিসাবে দেখিনি, সাংবাদিক হিসেবে তো তিনি ছিলেন আমাদের প্রজন্মের নমস্য। বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমরনীতি প্রসঙ্গে এমন অসাধারণ জ্ঞান আর কোনো সাংবাদিকের মধ্যে ছিল না।

'যুগান্তর' পত্রিকার পাতায় পাতায় আছে তাঁর সেই সুগভীর জ্ঞানের ফসল। সারা পৃথিবী ছিল যেন তাঁর হাতের মুঠোয়। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও তার পরিণতি সম্পর্কে অমন গভীর জ্ঞান সাংবাদিক কেন কোনো কালের ইতিহাসবিদের ছিল কিনা সন্দেহ। সে প্রমাণ তিনি রেখে গিয়েছেন দুই খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থে। যুদ্ধের চার দশক কেটে যাওয়ার পরেও সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ আজও সর্বত্র বঙ্গভাষী পাঠকের কাছে অতীব মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। শুধু এপার বাংলা বা ত্রিপুরায় নয় এমনকি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশেও।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেক সভাসমিতি ও সম্মেলনে যোগ দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর অসংখ্য বক্তৃতা এখনও আমার কানে বাজে। মানুষকে জাগ্রত করবার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর বক্তৃতায়। অত্যন্ত দুরূহ বিষয়কে তিনি সাধারণের বোধগম্য করে তুলতে পারতেন। তাঁর বক্তৃতার শেষে সমাবেশে বিরাজ করত সুগভীর গাম্ভীর্য। দেশে-বিদেশে শান্তি সম্মেলনে তিনি অসংখ্যবার যোগদান করেছেন। সেই সব সম্মেলন থেকে ফিরে শান্তির সেই বাণী কখনও বক্তৃতায় কখনও লেখনিতে তিনি তুলে ধরেছেন। আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রধান আকর্ষণই ছিল তাঁর প্রবন্ধ। বিবেকানন্দবাবুর ভাষায় একটি পৃথক মাধুর্য ছিল। সে ভাষা শুধু সাংবাদিকের ভাষা নয়, তার সঙ্গে মিলিত থাকত সাহিত্যের ভাষা। প্রথম জীবনে বিবেকানন্দবাবু কবিতা লিখেছেন। সেই কবিতার অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল দেশপ্রেম আর শ্রমজীবী মানুষ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শতাব্দীর সূর্য' ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

বিবেকানন্দবাবুর সঙ্গে বেশ কয়েকবার কাছাকাছি কথা বলবার আমার সুযোগ হয়েছে। বিদেশি দূতাবাসে বেশ কিছু সমাবেশে তাঁর সঙ্গে একত্রে যোগদান করেছি। তখন যেন অন্য বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি। এমন বৈঠকি আড্ডা, এমন নিপুণ রসিকতা মনে রাখবার মতো। তাঁর কথা বলবার এক ভিন্ন জাতের ঢং ছিল, সে ঢং তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। এইসব বৈঠকি ঢং আজ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

বিবেকানন্দবাবু অতি বড় মাপের মানুষ হলেও তাঁর মধ্যে কোনো অহংকার আমি কখনও লক্ষ করিনি। 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় মুদ্রণের সময় আমি যখন তাঁকে জুকভ প্রমুখ কয়েকজনের নতুন গ্রন্থের উল্লেখ করি তখন তিনি পরম আগ্রহে সেই গ্রন্থগুলি আমাকে সংগ্রহ করে দিতে বলেন। শারীরিক অবস্থা তাঁর তখন আর খুব একটা ভাল নয়। বাইরে বেরোন খুবই কম। উল্লেখিত বইগুলি তাঁর হাতে পৌঁছনোর পর তিনি দ্বিতীয় মুদ্রণে বেশ কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করেন। 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস'-এ প্রথম মুদ্রণের সঙ্গে দ্বিতীয় মুদ্রণের কিছুটা তফাত আছে। গ্রন্থটির প্রকাশক হিসেবে নতুন প্রজন্মের পাঠকের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আগ্রহ বঝবার চেষ্টা করেছি।

প্রত্যেকের বক্তব্য থেকে একটি সত্যই বেরিয়ে এসেছে—তা হল এই বৃহৎ গ্রন্থ শুধুমাত্র তথ্যসমৃদ্ধ নয়, অতীব সুখপাঠ্য। শুরু করলে শেষ না করে পারা যায় না। এর চেয়ে বড় পুরস্কার একজন লেখকের ভাগ্যে আর কী হতে পারে! 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস' কোনো পুরস্কারেই সম্মানিত হয়নি। কেন তা আমি জানি না। যাঁরা পুরস্কার প্রদান করে নিজেদের ধন্য মনে করেন, আমার মনে হয় এ তাঁদেরই লজ্জা। এত কাল ধরে যে গ্রন্থটি পাঠকের কাছে এখনও অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে তা যদি বিচারকদের চোখ এড়িয়ে যায় তা হলে বিচারকদের যোগ্যতা ও সততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা কি খুব অন্যায় হবে? অবশ্য আমার মতে 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস'-এর ললাটে পুরস্কারের জয়টিকার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। পাঠকের পুরস্কারে এই মহাগ্রন্থ বারবার পুরস্কৃত।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন দশক ধরে বামপন্থীদের শাসন চলছে। এটি নিশ্চয়ই গৌরবের। যত ত্রুটিই থাক বামপন্থীদের শাসন পশ্চিমবঙ্গকে মহিমান্বিত করেছে। কিন্তু এ-শাসন প্রতিষ্ঠায় যাঁদের অবদান নতমস্তকে স্বীকার করা উচিত তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। আজকের বামপন্থী কর্মী বা নেতৃবৃন্দ বেশিরভাগই সে খবর রাখেন না। আমি খাদ্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা একজন কর্মী। আমি জানি 'বসুমতী' পত্রিকায় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় কীভাবে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। সেদিন খাদ্য আন্দোলন যদি সার্থক না হত তাহলে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা সম্ভব হত না। কে কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন আমি জানি না, তবে যুক্তফ্রন্টকেই আমি বামফ্রন্টের ভিত্তিভূমি বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দবাবুর সঙ্গে আমার কয়েকবার কথা হয়েছে। তিনি একই অভিমত পোষণ করেন জেনে পরম তৃপ্তি লাভ করেছি।

জীবনের শেষ কয়েক বছর বিবেকানন্দবাবু মৃতপ্রায় ছিলেন। তখন বারবার তাঁর কথা আমার মনে হত। যদি তাঁর কাছ থেকে আমরা সদর্থক সমালোচনা পেতাম তাহলে বামফ্রন্টের কত উপকারই না হত। কিন্তু সে সুযোগ আমাদের হয়নি। বামফ্রন্টের নানারকম সমালোচনা নানাজাতীয় সংবাদপত্রে অহরহ পড়ছি। কিন্তু কোথাও কোনো সততার চিহ্ন লক্ষ করি না। হয় অন্ধ স্তবগান অথবা মিথ্যার সাজানো ডালি। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক আজ কোথায়! আজ অনেক অর্থ, অনেক প্রচার, অশেষ ক্ষমতা—সবই আছে ; নেই শুধু সততা, আন্তরিকতা আর দেশপ্রেম। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হয় সব দৃশ্য দেখবার জন্য বেঁচে না থাকাটাই বোধহয় ভাল ছিল। যেসব সহকর্মী বন্ধুরা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, তারাই বোধহয় ভাগ্যবান।

মণীন্দ্র রায়

কত কীর্তিমানের কাছ থেকে কত কিছু পেলাম! সারাজীবন পেলামই বেশি। দিতে পারলাম আর কতটুকু! দেয়ার যোগ্যতাই আমার নেই, দেব কী করে। পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক থেকেও কোনো সৃষ্টি কী আমি করতে পেরেছি! যোগ্যতা নেই, পারব কী করে! তবু যে গুণীজনের সান্নিধ্য আমি লাভ করেছি তাতেই আমি ধন্য। এই গুণীজনদের একজন হলেন কবি মণীন্দ্র রায়।

কবি মণীন্দ্র রায়কে আমি পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই চিনতাম। তখনও তিনি স্বীকৃত কবি। অসাধারণ নায়কোচিত চেহারা, কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং, সিনেমার পর্দায় খুব মানানসই। সিনেমার পর্দাতে অবশ্য মণীন্দ্র রায়কে দেখা গেছে। এক নয়, একাধিক ছবিতে।

মণীন্দ্র রায়কে আমি চিরকাল 'মণীন্দ্রবাবু' বলে ডেকেছি। অন্য অনেককে 'দাদা' বললেও কেন যে তাঁকে 'দাদা' না বলে 'বাবু' বলে ডেকেছি তা আমি আজও জানি না। আমার সমবয়সী বেশির ভাগ লেখককে অবশ্য তাঁকে 'দাদা' বলে ডাকতে শুনেছি।

মণীন্দ্র রায় ছিলেন অসাধারণ রসিক। শত দুঃখ, শত যন্ত্রণাতেও তিনি তাঁর রসিকতা ত্যাগ করেননি। যখন উত্থানশক্তি রহিত হয়ে শয্যায় শায়িত তখনও তাঁর রসিকতা থেকে বঞ্চিত হইনি। দুঃখকে রসিকতার মধ্য দিয়ে জয় করবার মানুষ শিবরাম চক্রবর্তী ছাড়া তাঁর মতো কাউকে দেখিনি।

মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সম্পর্কের প্রথমদিককার দিনগুলির কথা মনে পড়ে। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে তিনি তখন গভীরভাবে সম্পর্কিত। বেশির ভাগ সভাতে তাঁকে দেখেছি। কখনো কবিতা পড়ছেন, আবার কখনো বা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে তাঁকে প্রথম যুগ থেকে গভীরভাবে সম্পর্কিত থাকতে দেখেছি।

'সাহিত্যপত্র' পত্রিকার সঙ্গেও তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। তখন কবি বিষ্ণু দে'র বাড়িতে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যেত। কবি বিষ্ণু দে'র সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের কর্মী হিসাবে আমি বিষ্ণুবাবুর বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। তাছাড়া আমরা থাকতামও এক পাড়ায়। বিষ্ণু দে থাকতেন লেক মার্কেটের কাছে প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে। বিষ্ণুবাবুর মুখ থেকেও মণীন্দ্রবাবুর জীবনের অনেক কথাই আমি জানতে পেরেছি।

আগেই বলেছি, মণীন্দ্রবাবুর প্রথম স্ত্রী বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। আমি যখন থেকে মণীন্দ্রবাবুকে চিনি তখন তিনি আবার সংসার পেতেছেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হলেন তপতী রায়। তপতী রায়ের সঙ্গে আমার খুব মধুর সম্পর্ক ছিল। তাঁকে আমি নিজের দিদির মতো মনে করতাম। তপতীদি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত সরকারি চাকুরে। অসাধারণ সুন্দরী। নায়িকার মতো চেহারা। তাঁর এক বোন ললিতা চট্টোপাধ্যায় বেশ কিছু সিনেমার নায়িকা হয়েছেন। ইচ্ছে করলে তপতীদিও হতে পারতেন। আমি একবার তপতীদিকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, আমি যদি পরিচালক হতাম তাহলে মণীন্দ্রবাবুকে নায়ক আর আপনাকে নায়িকা করে একটি ছবি বানাতাম। আমি নিশ্চিত হই হই রই রই করে ছবি হিট করে যেত।

তপতীদি হো হো করে হেসে উঠেছিলেন।

একথা অবশ্য তপতীদিকে আমি যখন বলেছিলাম, তখন তপতীদি আর মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী ছিলেন না। তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। যদিও তপতীদি তখন দুই পুত্র-সন্তানের জননী। দুই ছেলে অনিন্দ্য ও অনন্য।

তপতীদি আবার বিয়ে করলেন। মণীন্দ্রবাবুর বিশেষ পরিচিত সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়কে। তপতীদির চেয়ে বয়সে বোধহয় বেশ কিছু ছোট।

সেই সময় মণীন্দ্রবাবুকে নিদারুণ সংগ্রাম করতে দেখেছি। পিতা ও মাতার মিলিত স্নেহে দুই সন্তানকে তিনি কীভাবে মানুষ করেছেন তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দুজনেই কৃতী। তাদের কথা পরে বলছি। তপতীদি প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা আগে বলে নিই।

সংসার জীবনের প্রথম দিকে তপতীদিকে খুবই সংগ্রাম করতে হয়েছে। মণীন্দ্রবাবুব তেমন কোনো রোজগার ছিল না। তিনি ছিলেন কবিতায় নিবেদিত প্রাণ। কবিতাকে বুকে বেঁধেই কাটত তাঁর জীবন। সংসারের দায়-দায়িত্ব সেভাবে ঠিক নিতে পারতেন না। পরে যে দায়-দায়িত্ব তিনি নিতে বাধ্য হলেন, প্রথম যুগে সেই দায়িত্ব নিলে ছাড়াছাড়ি হত কিনা সেটা খুবই সন্দেহের বিষয়। তপতীদি তো তখন আমি বা আমার মতো নিকটজনের কাছে একটি অভিযোগ বারবার করেছেন, যে মণীন্দ্র সংসারের কোনো দায়িত্ব নিতে চায় না। মণীন্দ্রবাবুকে সে কথা বললে, ঠাট্টা রসিকতায় উড়িয়ে দিতেন।

তপতীদি নিজেও ছিলেন লেখিকা। সাহিত্য যে শুধু তার নেশা ছিল তা নয়, সাহিত্য ছিল তার আবেগ। শেষ জীবনে তিনি যখন দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তাঁর এই ভয়াবহ ব্যাধি নিয়ে একটি অসাধারণ গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। এই বইটি ছাড়াও তপতীদির আরও কিছু বই প্রকাশিত হয়েছিল। অসুখের পর তিনি প্রধানত সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নিজেকে মগ্ন রেখেছিলেন। তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে তিনি

নিয়মিত সাহিত্য ও নাটকের আসর বসাতেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে মৃত্যুকে তিনি জয় করেছিলেন অনেক দিন। মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে তপতীদির ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও গভীরভাবে বন্ধুত্ব ছিল শেষ পর্যন্ত। একে অপরকে সবসময় সাহায্য করতেন। মণীন্দ্রবাবু শেষদিন পর্যন্ত আমাকে বলে গেছেন, তপতীর ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না।

তপতীদি ছিলেন খুব উচ্ছল প্রকৃতির মানুষ। খুবই মিশুকে। মানুষকে আপন হিসেবে কাঁছে টেনে নেওয়ার তাঁর এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল। শেষ জীবনে তিনি বারবার আমাকে তাঁর বাড়িতে যেতে বলতেন। আমি গিয়েছি। কিন্তু তপতীদির চাহিদা মতো যেতে পারিনি। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলেও তপতীদির সৌন্দর্য বিশেষভাবে ম্লান হয়নি। যেটুকু হয়েছিল সেটুকু বয়সের ভারে। আক্রান্ত হওয়ার পরেও তপতীদি বেঁচে ছিলেন দীর্ঘ দশ বছর।

শেষের দিকে অনন্য তপতীদির কাছেই থাকত। অনিন্দ্য বিলেত পাড়ি দিয়েছে। কর্মজীবনে সে এখন বিদেশে খুবই প্রতিষ্ঠিত। মণীন্দ্রবাবুর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অনিন্দ্য নিখুঁত ভাবে পিতৃ-কর্তব্য পালন করে গেছে।

অনন্য কবি হিসেবে বেশ নাম করেছিল। বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আমার কাছে কয়েকবার বলেছেন। তার প্রথম কবিতার বইটি আমিই ছাপিয়ে দিয়েছিলাম। ছেলেবেলা থেকেই অনন্য'র হৃদয়ঘটিত একটা অসুখ ছিল। মণীন্দ্রবাবু ও তপতীদি উভয়কে তার জীবন নিয়ে সংশয়-প্রকাশ করতে শুনেছি।

প্রথাগত শিক্ষার দিকে অনন্যর কোনো ঝোঁক ছিল না। ডিগ্রির প্রতি তার ছিল না কোনো মোহ। পড়া ছেড়ে দিয়ে সে কবিতা ও চলচ্চিত্রের দিকে নিজেকে নিয়োগ করতে লাগল। ঋত্বিক ঘটকের সহকারী হিসেবে সে সিনেমার সঙ্গে সম্পর্কিত হল। ঋত্বিক ঘটকের কাছ থেকে সে শুধু চলচ্চিত্র-চর্চা শিখল না, শিখল মদ্যপান ও বিবিধ জাতের নেশা। আর এই নেশাই তার অনিশ্চিত জীবনকে আরও সংক্ষিপ্ত করে তুলল।

ঋত্বিক ঘটককেও আমি চিনতাম পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে। ভেঙে পড়া সেই দিনগুলিতে। ঋত্বিকদার বয়স তখন খুবই কম। নিয়মিত সাহিত্য বৈঠকে তিনি যোগ দিতেন। তাঁর কড়া কড়া মন্তব্যে নামী লেখকেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতেন। ঋত্বিকদার সেদিকে অবশ্য কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। চিনুদাকে কতবার ঋত্বিকদাকে সংযত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখেছি।

ঋত্বিকদা তখন গল্প লিখছেন, গণনাট্য সংঘে অভিনয় ও পরিচালনা করছেন। আবার 'নাগরিক' নামে একটি ছবির পরিচালনাও করছেন। আমরা সে সময় 'ফতোয়া' নামে

একটি পত্রিকা প্রকাশ করি। ঋত্বিকদা বোধহয় আমাদের প্রথম সংখ্যাতেই গল্প লিখেছিলেন। 'ফতোয়া' পত্রিকাতে ঋত্বিকদা 'নাগরিক'-এর একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তাঁর প্রযোজকের ধর্মতলার অফিসে মাস ছয়েক হানা দিয়ে আমি বোধহয় কুড়ি টাকা আদায় করেছিলাম। যেদিন টাকাটা আদায় হয় সেদিন ঋত্বিকদা আমার সঙ্গে গিয়ে বাপান্ত করে গালিগালাজ করেছিলেন। ঋত্বিকদাকে আমি গণনাট্য সংঘের একটি নাটকে নাচতেও দেখেছি।

তারপরে ঋত্বিকদা 'অযান্ত্রিক' তৈরি করে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। ব্যবহারের মধ্যে অবশ্য কোনো পরিবর্তন হল না। তখন তিনি একটা গাড়ি কিনে ফেললেন। আমি সে গাড়িতে চেপেছিও দু-একবার। তারপর ঋত্বিকদার 'কোমলগান্ধার' মুক্তি পেল। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে একইভাবে ঋত্বিকদার নাম উচ্চারিত হতে লাগল। মৃণালদা অর্থাৎ মৃণাল সেনও তখন আলোচনায় উঠে এসেছেন।

ঋত্বিকদা-মৃণালদার চরিত্র একেবারে বিপরীত। ঋত্বিকদা ছিলেন অস্থির, উদ্দাম এবং পরবর্তী কালে শৃঙ্খলাহীন। আর মৃণালদা হলেন শান্ত, ভদ্র এবং বিনয়ী। এখন অবশ্য অহঙ্কার হয়েছে কিনা জানি না। তবে মনে হয়, আমাকে দেখে চিনতে পারেন না। আমি আজও অতি সাধারণ একজন মানুষ, তাই হয়তো তাঁর চোখে পড়ে না।

কিন্তু ঋত্বিকদার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আমি কখনো পাইনি। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার কথা বলছি না, প্রকৃতিস্থ অবস্থাতে ঋত্বিকদা আমাকে কাছে টেনে নেননি এমন ঘটনার কথা মনে পড়ে না।

ঋত্বিকদাদের পরিবারে সকলকেই প্রায় আমি দেখেছি। মহাশ্বেতাদির বাবা অর্থাৎ ঋত্বিকদার বড়ভাই মনীশদার সঙ্গেও দীর্ঘ সময় আড্ডা দিয়েছি। মনীশদার কাছে গেলে বয়সের কোনো ব্যবধান থাকত না।

ঋত্বিকদার শেষ জীবনটা কেন যে নেশার সমুদ্রে ডুবে গেল তা আমি আজও বুঝি না। একসময় ঋত্বিকদার নিদারুণ অর্থাভাব ছিল ঠিকই, কিন্তু অনেক অভাবকে তিনি জয় করেছেন। নিজের জীবনটা কেন যে শেষ করে দিলেন! অমন প্রতিভার কেন যে অকাল মৃত্যু হল!

ঋত্বিকদা শেষের দিকে যখন একেবারে বেপরোয়া তখন প্রায়ই 'সোভিয়েত দেশ' অফিসে আমার বন্ধু কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের কাছে আসতেন। তখন আসা মানেই নেশার জোগানের জন্যে পীড়াপীড়ি। সেখানে ঋত্বিকদার সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঋত্বিকদা কখনো আমার কাছে হাত পাতেননি। স্নেহভাজনের কাছে যে হাতপাতা উচিত নয় নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেও ঋত্বিকদার এ জ্ঞান ছিল টনটনে।

স্টুডেন্টস হলে ঋত্বিকদার একটি সম্বর্ধনা সভার কথা মনে পড়ছে। উদ্যোক্তাদের কী মর্মান্তিক দুরবস্থা। পুরো মত্ত অবস্থায় ঋত্বিকদা সভায় এলেন। দর্শকাসনে মত্ত

হয়ে বসে আছে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শক্তি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আগেই বলেছি শক্তি প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকলে অতীব ভদ্র আর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সম পরিমাণে বেপরোয়া। সেদিন দুই প্রতিভার মিলনে যে অসাধারণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা বোধহয় ইতিহাসে লেখা থাকবে। আজ অবশ্য দু'জনেই এ-পৃথিবীতে নেই।

অনন্য ঋত্বিকদার কাছ থেকে অস্থিরতা পেয়েছিল। অবশ্য বেপরোয়া হত কিনা জানি না। আমার সামনে সে কিছুটা গুটিয়ে যেত। এ. আই ক্লাবে শেষের দিকে সে নিয়মিত আসত। তখন মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। হয়তো কিছুটা লজ্জা পেয়ে প্রথম দিকে আমার থেকে দূরের টেবিলে বসত। আমি অবশ্য একদিন তাকে কাছে ডেকে স্বাভাবিক করে দিলাম। অবশ্য তার শারীরিক কারণে বেশি মদ্যপান করতে নিষেধ করেছিলাম। সামনে কিছু না বললেও সে কিন্তু আমার কথা শোনে নি।

তারপর অতি অল্প বয়সে প্রতিভাময় অনন্য চিরতরে বিদায় নিল। এই সংবাদ শোনার পর আমি মণীন্দ্রবাবুর কাছে বেশ কয়েকদিন যেতে পারিনি। তপতীদির কাছেও যাইনি।

ব্যক্তিগত জীবনে তপতীদির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মণীন্দ্রবাবুকে অর্থ উপার্জনের জন্যে নানারকম চেষ্টা করতে হয়েছিল। সুপ্রিয়দার বাবা সুধীরচন্দ্র সরকারের সহকারী হিসাবে কিছুকাল কাজ করেছিলেন মণীন্দ্র রায়। সুধীরবাবু সংকলিত 'পৌরাণিক অভিধান' খুবই পরিচিত গ্রন্থ। এছাড়াও তখন এম.সি. সরকার থেকে প্রকাশিত 'হিন্দুস্তান ইয়ার বুক' খুবই নামী প্রকাশন ছিল। সুপ্রিয়দার সময়েই অর্থাৎ সুধীরবাবুর মৃত্যুর পর ইয়ার বুকটি অনেক ম্লান হয়ে যায়। ইয়ার বুক প্রকাশের ক্ষেত্রে মণীন্দ্রবাবু অনেক সাহায্য করতেন।

তারপর প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকা। 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর পত্রিকা হলেও সুপ্রিয়দারও আংশিক মালিকানা ছিল। সুপ্রিয়দা ছিলেন তুষারবাবুর খুবই স্নেহভাজন। তুষারবাবুর গ্রন্থের বিপুল সংগ্রহ ছিল। যতদূর জানি তুষারবাবুর সেই গ্রন্থসংগ্রহ কোথাও দান করে যাননি। অসাধারণ সেই সব গ্রন্থের কী পরিণতি হল তা আমি জানি না। হয়তো ফুটপাতেই তারা আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো আমিও তাদের দু'চারখানা সংগ্রহ করে সযত্নে লালন-পালন করছি, জানি না...। তুষারবাবু আমাকে একবার দারুণ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন যখন আমি পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস' প্রকাশ করি। তুষারবাবুর সংগ্রহশালায় এই বইটি ছিল না।

'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকার পুরো সম্পাদকীয় দায়িত্বে থাকলেও সম্পাদক হিসাবে মণীন্দ্রবাবুর নাম ঘোষিত হত না। ঘোষিত সম্পাদক ছিলেন তুষারকান্তি ঘোষ। মালিকরা

যেমন করে থাকেন। 'অমৃত'কে 'দেশ' পত্রিকার বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলবার খুব চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। 'অমৃত' সেই উচ্চতায় উঠতেই পারল না। এই প্রসঙ্গে মণীন্দ্রবাবুকে আমি অনেক দিন বলেছি। মণীন্দ্রবাবু জবাব দিয়েছেন, আমার কিছু করার নেই। মালিকের যা নীতি আমি তাই পালন করছি। কথাটা পুরোমাত্রায় আমি ঠিক স্বীকার করি না। নীতির বাঁধা ছকের মধ্যেও অনেক কিছু করা সম্ভব।

মণীন্দ্রবাবুর বড় গুণ ছিল তরুণ লেখকদের তিনি কাছে টেনে আনতেন। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অনেক সহকর্মীকে দিয়ে তিনি লিখিয়েছেন। অনেককে অনেক সুযোগ তিনি দিয়েছেন। যদি কেউ কিছু করে উঠতে না পারেন তবে সে ব্যর্থতা তাঁদের, মণীন্দ্রবাবুর নয়। আমাকে দিয়েও মণীন্দ্রবাবু লিখিয়েছেন। গদ্য লেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি যদি না পেরে থাকি সে আমার ব্যর্থতা।

অনেক বিখ্যাত লেখা 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস'। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার সময় পত্রিকার বিক্রি সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের সময় মণীন্দ্রবাবু নিজের জীবনের আর একটি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করেন। এবারের পাত্রী প্রতিমা মণীন্দ্রবাবুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। খুবই সুন্দরী। ভাল কবিতা লিখত। এই কবিতা লেখার সূত্রেই মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরিচয় এবং জীবনে জীবন যোগ করা। প্রতিমা শুধু সুন্দরী ছিল না, তার ব্যবহারও ছিল ভারি মিষ্টি। এই বিয়েতে আমি খুব বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল মণীন্দ্রবাবুর দুই ছেলে যখন অনেক বড়, তখন এমন একজন তরুণীকে নিয়ে সংসার পাতা কখনো উচিত নয়। জানি না আমি সঠিক ছিলাম কি না। হয়তো এটা আমার সংস্কার। কিন্তু প্রেমের জোয়ার কি বাধা মানে! এক্ষেত্রেও মানেনি।

প্রতিমা আমাকে 'দাদা' বলে ডাকত, তার চেয়ে বয়সে আমি বেশ বড়। প্রতিমার কবিতার প্রশংসা আমার কাছে অনেক দিন করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একবার হাসতে হাসতে বলেছিলেন, প্রতিমা মণীন্দ্র'র চেয়ে অনেক ভাল কবিতা লেখে।

আমি মণীন্দ্রবাবুকে সে-কথা বলেও দিয়েছিলাম। মণীন্দ্রবাবু হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন, সুভাষ আমার ঘর ভাঙতে চায়। আমার তরুণী ভার্যা দেখে সুভাষের হিংসে হচ্ছে। সমবয়সী এবং সম সময়ের দুই কবির রসবোধ আমি বেশ উপভোগ করেছিলাম।

তপতীদির সঙ্গে থাকবার সময়ে মণীন্দ্রবাবু প্রকাশ করেন কবিতার পত্রিকা 'সীমান্ত'। প্রথমে সম্পাদক ছিলেন মণীন্দ্র রায় ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। পরে নানা সময়ে

নানাজন সম্পাদক হয়েছেন। আমিও কিছু কালের জন্যে এই পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলাম। 'সীমান্ত' এখনও প্রকাশিত হয়। কবি দীপেন রায়ের একান্ত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায়।

মনে পড়ছে মণীন্দ্র রায়ের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার কথা।
মণীন্দ্রবাবু একদিন আমাকে বললেন, যে তাঁর দীর্ঘ কবিতার একটি বই আমাকে ছাপিয়ে দিতেই হবে। বইটির নাম 'মোহিনী আড়াল'। বইটি পুরস্কার পাওয়ার খুবই সম্ভাবনা। আমি তখন নিয়মিত প্রকাশনা ব্যবসা শুরু করিনি—তবে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করে দু'চারটি বই প্রকাশ করেছি। বাণিজ্যিকভাবে নয়, বন্ধু-বান্ধবের বই। মণীন্দ্রবাবুর কথায় সম্মত হয়ে আমি বইটি প্রকাশ করি। কিন্তু কিছুই বিক্রি হয় না।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি। মণীন্দ্রবাবু আমাকে বলেছিলেন, সুনীতিবাবুর সঙ্গে এই প্রসঙ্গে নাকি কথা হয়েছে। কথাটা যে সঠিক আমি বুঝতে পারলাম যখন সাহিত্য আকাদেমি থেকে কয়েক কপি বই আমার কাছে চাওয়া হল। বই পাঠিয়ে আমি নিশ্চিত থাকলাম, 'মোহিনী আড়াল' এবার আকাদেমি পুরস্কার পাচ্ছেই। কিন্তু সে বছর পেল না। অন্য নাম ঘোষিত হল। মণীন্দ্রবাবু তখন আমাকে বললেন, তুমি কিছু চিন্তা কোরো না, সামনের বছর নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবে। এ-বছর নিয়মকানুনে একটু আটকে গেছে।

আমি বললাম, চিন্তার আবার কী আছে? লাভের জন্যে আপনার বই আমি বের করেছি নাকি? আপনি পুরস্কার পেলে আমি খুশি হব, সেই কারণেই বের করেছি। তবে আমি জানি পুরস্কার পেলে সে-বইয়ের অনেক কপি বিক্রি হয়। সেটি আমার উপরি পাওনা।

সত্যি সত্যি পরের বছর মণীন্দ্রবাবু 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার লাভ করলেন তাঁর 'মোহিনী আড়াল' কাব্যগ্রন্থের জন্যে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমারও কপাল খুলল। যে বই মোটেই বিক্রি হত না, যা বিক্রির কথা আমি ভাবিনি সেই 'মোহিনী আড়াল' হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল। পুরস্কারের কী মহিমা!

বেশ চলছিল মণীন্দ্রবাবুর জীবন—দুই ছেলে বড় হয়ে গেছে। একজন বিলেতে, অন্যজন মায়ের কাছে। এমন সময় মণীন্দ্রবাবুর একটি মেয়ের জন্ম হল। মণীন্দ্রবাবুকে খুব চিন্তান্বিত হতে দেখলাম। এত বেশি বয়সে মেয়েকে তিনি মানুষ করবেন কীভাবে! কিন্তু জীবনে কোনো কিছুই আটকায় না। মণীন্দ্রবাবুরও আটকাল না। দেখতে দেখতে মেয়ে বড় হল, পাঠভবনে লেখাপড়া শেষ করে ভালবেসে বিয়েও করল। অত বেশি বয়সে বিয়ে করেও মণীন্দ্রবাবুর জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

মণীন্দ্রবাবু ছিলেন খুব স্নেহপ্রবণ মানুষ। অসীম স্নেহে তিনি সন্তানদের পালন করেছেন। শুধু নিজের সন্তান নয়, কনিষ্ঠরা কেউই তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। আমিও যে তাঁর স্নেহধন্য একথা অকপটে স্বীকার করি।

মণীন্দ্রবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। মণীন্দ্রবাবু যখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী, তখন ভগ্নস্বাস্থ্যেও মঙ্গলাবাবু নিয়মিত তাঁর বাড়ি আসতেন। মণীন্দ্রবাবুর বাড়ি এলেই মঙ্গলাবাবু আমার বাসায় ঘুরে যেতেন। তখন আমরা উভয়ে সামনাসামনি বাস করি।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে আমি সেই পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে চিনি। মণীন্দ্রবাবুর মতো তাঁকেও আমি চিরকাল 'বাবু' বলে এসেছি। কেন যে 'দাদা' বলিনি তা আমি নিজেও জানি না। মণীন্দ্রবাবু সুভাষদা ও মঙ্গলাবাবু তিনজনেই সমবয়সী। এবং তিনজনেই সমসময়ের কবি। দু'জনের তুলনায় সুভাষদার প্রতিষ্ঠা অনেক আগে এবং নামও ছিল অনেক বেশি। আমি লক্ষ করেছি সুভাষদাকে তাঁর বাকি দুই কবিবন্ধু চিরকাল একটু ঈর্ষার চোখে দেখতেন। সুভাষদার সঙ্গে আমার সম্পর্কের গভীরতার জন্যে মাঝে মাঝে ঠেস দিয়ে ঠাট্টাও করতেন। আমি জানতাম এবং মানতাম যে এই তিনজনেই হলেন খুব বড় মাপের কবি। তবে আমার মনে হত সুভাষদা যেন একটু স্বতন্ত্র, তাঁকে ঠিক মাপা যায় না—তিনি যেন মাপের অনেক উপরে।

মঙ্গলাবাবু অনুবাদক হিসেবে দীর্ঘকাল রাশিয়ায় কাটিয়েছেন। আমি মস্কো গেলে মঙ্গলাবাবু আমাকে পরমস্নেহে আদর যত্ন করেছেন। মঙ্গলাবাবুর স্ত্রীর আতিথেয়তা আমি আজও ভুলতে পারি না।

দীর্ঘকাল সোভিয়েত কাটিয়ে মঙ্গলাবাবু দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি আবার কবিতাচর্চায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু আগের সেই স্বাদ আর ফিরে এল না। মঙ্গলাবাবু সেই জাতীয় কবিতা আর লিখতে পারলেন না। তখন আমি মঙ্গলাবাবুর একটি বই প্রকাশ করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কাব্যগ্রন্থটি একেবারেই বিক্রি হয়নি।

মঙ্গলাবাবু ও মণীন্দ্রবাবুর দুজনেই কবিতার বইয়ের কোনো বিক্রি ছিল না। কেন আমি ঠিক জানি না। ভবিষ্যতই সবকিছু বিচার করবে। শেষ জীবনে দু'জনে হতাশ হলেও আমি কিন্তু হতাশ হইনি।

মণীন্দ্রবাবু এবং মঙ্গলাবাবু দু'জনেই ছিলেন খুব রসিক ব্যক্তি। তবে দু'জনের স্বভাব একেবারেই দু'রকমের। মণীন্দ্রবাবু ছিলেন খুব জমাটি ও উচ্ছল। আর মঙ্গলাবাবু ছিলেন ধীর-স্থির মৃদুভাষী। কিন্তু তার মাঝেই রসবোধ ছিল প্রবল।

দুই বন্ধুর মধ্যে মণীন্দ্রবাবু আগে চলে গেলেন। অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে প্রতিমাও

চলে গেল। দু'জনের মৃত্যু সংবাদে আমি ছুটে গিয়েছি। মণীন্দ্রবাবু দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু চলে যাওয়াটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে খুব কষ্টকর হয়েছিল। তার নিস্পন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন কত কথাই না মনে পড়ছিল! এমন বৈঠকি মেজাজের মানুষ বোধহয় আর থাকল না।

শেষকালে মঙ্গলাবাবুও চলে গেলেন।

মঙ্গলাবাবুর স্মরণসভায় কিছু বলতে উঠে আমার নিদারুণ কষ্ট হচ্ছিল। সামনে বসেছিলেন মঙ্গলাবাবুর স্ত্রী। সভাতে তিনিও কিছু কথা বলেছিলেন, আশ্চর্যরকম শান্তভাবে।

একে একে সবাই চলে গেলেন। মণীন্দ্রবাবু, মঙ্গলাবাবু চলে যাওয়া মানলেও প্রতিমা'র চলে যাওয়াটাকে মানব কী করে? তবু মানতে হবে। এটাই জীবন। জীবন যেরকম তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। জীবন না থাকলেও থাকে স্মৃতি। স্মৃতিটুকু বেঁচে থাক।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখতে দেখতে সময় কেমন গড়িয়ে গেল। বহমান সময় কখনও অপেক্ষা করে না। এই পৃথিবী ছেড়ে একদিন না একদিন আমাদের সকলকেই চলে যেতে হবে এই সত্যটুকু সবাই তো জানি। তবু কেন মানতে পারি না। ফলে, এত বিয়োগ-ব্যথা, এত বিয়োগ-যন্ত্রণা। আজ বুঝতে পারছি আমারও চলে যাওয়ার ডাক এসে গেছে। তাই স্মৃতিকে এত আঁকড়ে ধরা। স্মৃতি সততই সুখের।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগের কথা, কী এক আশ্চর্য মিলে সদ্য যৌবনে পা দেওয়া দু'জন মানুষ কাছাকাছি এসেছিল। উনিশশো বাহান্ন সালে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ছোটদের পত্রিকা 'আগামী'। আশ্চর্যজনকভাবে সেই বছরই প্রকাশিত হয় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'আগামী'।

আগেই বলেছি পার্ক সার্কাস লেখক ও শিল্পী সমাজে তখন আমাদের মতো একদল তাজা তরুণের নিয়মিত সাহিত্য আড্ডা চলছে। প্রথমে দীপেন্দ্রনাথ আমাকে একটি ছোট্ট চিঠি লেখে। সেখানে 'আগামী' প্রসঙ্গে এই আশ্চর্য মিলের কথা উল্লেখ করে। এই চিঠি লেখার কয়েকদিনের মধ্যেই দীপেন সশরীরে আমাদের সমাজে চলে আসে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। টুকিটাকি কথা, সাহিত্য ভাবনার আলোচনা এবং শেষকালে নির্ভেজাল আড্ডা। প্রথম সাক্ষাতেই দীপেনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের বীজ রোপিত হল। সেই বন্ধুত্ব দীপেন আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার শেষদিন পর্যন্ত টিকেছিল। দীপেনের প্রথম উপন্যাস 'আগামী' সকল নামী লেখকের প্রশংসা পেয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই দীপেন সাহিত্য জগতে পরিচিত হয়ে ওঠে।

দীপেন ও আমি উভয়ে যে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলাম তা নয়, আমরা দু'জনেই ছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। কিছুদিনের মধ্যেই দু'জনেই হয়ে উঠলাম প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। এমন কোনও আন্দোলনের কথা মনে পড়ে না যেখানে আমি আর দীপেন একসঙ্গে থাকিনি। প্রথমদিকে দীপেন কিছুকাল অবশ্য ছাত্র-আন্দোলন করেছিল। সেখানেও দীপেন সাচ্চা। দীপেনের মতো সাচ্চা কমিউনিস্ট আমি খুব কম দেখেছি। বন্ধু হিসাবে দীপেনকে নিয়ে আমার মনের মাঝে একটা গর্ব লুকোনো আছে।

আমি তখন ছোটদের পত্রিকা নিয়ে মেতে আছি। পটুয়াটোলা লেনে পত্রিকার কার্যালয়। দীপেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একের পর এক ছোটগল্প লিখে আলোড়নের সৃষ্টি করছে, তার সাড়া জাগানো উপন্যাস 'তৃতীয় ভুবন' প্রকাশিত হয়েছে। সেইসময় ছোটগল্পে যেসব তরুণেরা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয় তাদের মধ্যে দীপেন ছাড়াও ছিল, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, মতি নন্দী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আরও কয়েকজন। বরেনও ছিল আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, দেবেশের সঙ্গেও কিছুদিনের মধ্যে

আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মনে পড়ে এরা সকলেই ছিল অমর কথাসাহিত্যিক বিমল করের একনিষ্ঠ ভক্ত।

ছোটগল্প নিয়ে বিমল করের ছিল নানারকম ভাবনা। একদল তরুণ লেখককে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেই ভাবনাকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করছিলেন। 'দেশ' পত্রিকায় ছোটগল্প বিভাগের দায়িত্বেও ছিলেন বিমল কর।

বিমল কর সেই সময় কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে একটি বইয়ের দোকানে নিয়মিত বসতেন। সেখান থেকেই বিমলদা প্রকাশ করেন 'ছোটগল্প নতুন রীতি'। যতদূর মনে পড়ে তাঁর প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল দীপেনের গল্প। একটি গল্প ও আলোচনা নিয়ে একটি সংখ্যা। বিমলদার সেই আড্ডায় আমিও নিয়মিত গিয়েছি।

বিমলদা যেখানে আড্ডা দিতেন তার সামনের দিকে দোতলায় 'পরিচয়' পত্রিকার অফিস। সেখানে তখন দীপেন আর আমি নিয়মিত যেতাম। অবশ্য অনেক আগে ননী ভৌমিক যখন সম্পাদক ছিলেন তখন যাতায়াত ছিল বেশি।

ননী ভৌমিক সম্পাদক থাকাকালীন দীপেন নিয়মিত লিখেছে 'পরিচয়' পত্রিকায়। সত্যি কথা বলতে কী তরুণ লেখকদের মধ্যে তখন থেকেই দীপেনের নাম ছিল বোধহয় এক নম্বরে। ননী ভৌমিকও ছিলেন অসাধারণ লেখক। মস্কো যাত্রাই তাঁর কাল হল। সে সব কথা পরে বলব। তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে দীপেনের ওপর ননীবাবুর বোধহয় কিছুটা প্রভাব আছে। 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে অবশ্য আমার সম্পর্ক ১৯৪৯ সাল থেকে। তখন সম্পাদক ছিলেন সরোজকুমার দত্ত ও গোলাম কুদ্দুস। কমিউনিস্ট পার্টির কট্টর রাজনীতির প্রভাবে সেদিনকার পরিচয়ও ছিল গভীরভাবে কট্টরপন্থী।

যাক যে-কথা বলছিলাম। দীপেন ছিল 'পরিচয়' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। গল্প, রিপোর্টাজ, পুস্তক আলোচনা, সংস্কৃতি সংবাদ ইত্যাদি নানা বিষয়েই লিখত। সেদিন এক তরুণ গবেষক আমার একটি অনুবাদ বইয়ের দীপেন যে সমালোচনা করেছিল সেটির জেরক্স কপি দিয়ে গেল। হাওয়ার্ড ফাস্টের একটি ছোটদের উপন্যাস 'টনির স্বপ্ন' নামে আমি অনুবাদ করেছিলাম। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'আগামী'র শারদীয় সংখ্যায়। তারপর পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। দীপেন আমার অনুবাদকর্মের এমন প্রশংসা করেছিল যে এতদিন পরে পড়েও আমি লজ্জাই পেয়ে গেলাম। বন্ধুত্ব আর কাকে বলে!

পটুয়াটোলা লেনে 'আগামী'-র কার্যালয়ে দীপেন নিয়মিত আসত। এই সময় আমরা দুজনে মিলে মাদ্রাজে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিই। সে বছর শিশু সাহিত্য বিভাগে সভাপতির ভাষণ দেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। খগেনদা, দীপেন আর আমি মাদ্রাজের অতিথিশালায় একই ঘরে ছিলাম। খগেনদার আশ্চর্য তরুণ মন ছিল। আমাদের চেয়ে বয়সে অত বড় হয়েও সমবয়সী বন্ধুর মতো ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতেন। মনে পড়ে সেই

সম্মেলনে কী একটি বিষয়ের উপর আমরা দুজনে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলাম। দীপেন ছিল নেতৃত্বে, আমি ছিলাম তার পিছনে। যতদূর মনে পড়ছে মূল সভাপতির ভাষণের কোনও বক্তব্যে আমাদের ছিল তীব্র আপত্তি। আমাদের দুই তরুণের তুমুল প্রতিবাদ সম্মেলনের আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। অনেক চেষ্টায় উদ্যোক্তারা আমাদের শান্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ ভাবতে অবাক লাগে কেমন বেপরোয়া ছিলাম আমরা। এই ঘটনার পর সকলের কাছেই রাতারাতি আমরা পরিচিত হয়ে গেলাম। পিছন থেকে খগেনদা আমাদের সমর্থনই করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে কবি সিদ্ধেশ্বর সেনও ছিল। সিদ্ধেশ্বর অনেকটা শান্ত প্রকৃতির। তাই আমাদের মতো অতটা বেপরোয়া হতে পারেনি।

মনে আছে সেই সম্মেলনের পর শ্রীমতী কল্যাণী কুমারমঙ্গলম আমাদের তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খুব আদর যত্ন করে খাইয়েছিলেন। তারপর নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে সারা মাদ্রাজ শহর ঘুরিয়েছিলেন। কল্যাণীদি ছিলেন বাঙালি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় ও কমিউনিস্ট নেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাইঝি। কল্যাণীদির স্বামী মোহন কুমারমঙ্গলম ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা ও বিখ্যাত আইনজীবী। দীপেন আমি আর সিদ্ধেশ্বর মিলে মোহন কুমারমঙ্গলম-এর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করেছিলাম। কুমারমঙ্গলম পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রীসভার একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হন। মন্ত্রিত্বে থাকাকালীন মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় মোহনের জীবনাবসান হয়।

সম্মেলনের পর খগেনদা দীপেন মিলে কন্যাকুমারিকা বেড়াতে যান। আমার বিশেষ কাজ থাকায় যেতে পারিনি। দীপেনের পীড়াপীড়িতেও রাজি না হয়ে আমি আর সিদ্ধেশ্বর পুরী হয়ে কলকাতা ফিরে আসি।

দীপেনের সেই দক্ষিণভারত যাত্রা 'দক্ষিণের পাঁচালি' নামে ধারাবাহিকভাবে আমাদের 'আগামী'তে প্রকাশিত হয়।

এইসময় একদিন দীপেন 'আগামী' কার্যালয়ে চিন্ময়ীকে নিয়ে আসে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। চিন্ময়ীও তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। দীর্ঘক্ষণ গল্প গুজব করবার পর দীপেন আর চিন্ময়ী ফিরে যায়। এর কয়েকদিন পরেই দীপেন চিন্ময়ীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা আমাকে জানায়। সেদিন যে আমি কি খুশি হয়েছিলাম সে কথা আজ এতদিন পরেও ঠিক বোঝাতে পারছি না। কিছুকালের মধ্যেই তারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। চিন্ময়ী অসাধারণ এক বিদুষী মহিলা। কম কথা বলে, খুব ধীরে ধীরে। সব সময় মুখের মাঝে হাসি লেগে থাকে। শত দুঃখ ও যন্ত্রণায় চিন্ময়ীকে ভেঙে পড়তে আমি দেখিনি। কর্মজীবনে শিক্ষিকা হিসেবেও চিন্ময়ী সার্থক। ওদের বড় মেয়ে মৃত্তিকা ডাক্তার হয়েছে। ছোট ছেলে মেঘেন্দ্র আর আমার মেয়ে পিয়ালী ছেলেবেলা থেকেই একসঙ্গে পাঠভবনে পড়াশুনো করেছে।

উনিশশো চৌষট্টি সালে পার্টি ভাগ হওয়ার পর আমি আর দীপেন সি.পি.আই-এ থেকে যাই। পার্টি যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল এই যন্ত্রণায় দীপেন কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। সবসময় গুম হয়ে থাকে, কথা বলে না। মুখের সেই মিস্টি হাসি মিলিয়ে গেছে। আমার সঙ্গে দেখাশুনাও কমে যেতে লাগল। মানসিক বিষাদে দীপেন অসুস্থ হয়ে পড়ল। সেই অসুস্থতা কাটাতে তার বেশ সময় লেগেছে। তখন দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছে চিন্ময়ীকে।

সুস্থ হয়ে দীপেন অবশ্য আবার নিজের মাঝে ফিরে এল। আমিও খুঁজে পেলাম আমার প্রিয় পুরানো দিনের সেই দীপেনকে। দীপেন আর আমি আবার সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

তখন থেকে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। আমি আর দীপেন দুজনেই পার্টির সাহিত্য-সংস্কৃতি ফ্রন্টের নেতৃত্বে উপনীত হই। আমাদের সঙ্গে সুভাষদাও নেতৃত্বে ছিলেন। আমরা দুজনে আবার সুভাষদাকে আমাদের অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে মানতাম। আর মানতাম চিন্মোহন সেহানবীশকে।

পার্টি ভাগ হওয়ার কিছুকাল আগেই আমার প্রেস থেকে 'সাপ্তাহিক কালান্তর' প্রকাশিত হয়। প্রেসটি ছিল আমি এবং আমার বন্ধু যশোদা সাহার যৌথ মালিকানায়। অবশ্য পরিচালনার সব দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। যশোদা কখনও আমার উপর কোনও কথা বলত না। যশোদা ছিল পার্টি সদস্য এবং শান্তি আন্দোলনের কর্মী। দীপেন 'কালান্তর' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে 'কালান্তর' যখন দৈনিকে রূপান্তরিত হয়েছে তখনও দীপেন কালান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমার তখন আর সেভাবে সম্পর্ক ছিল না। দীপেন দীর্ঘকাল কালান্তরের রবিবারের বিভাগ সম্পাদনা করেছে। তার সম্পাদনায় বেশ কয়েকটি শারদীয় কালান্তর প্রকাশিত হয়েছে। আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম 'শারদীয় কালান্তর'। কালান্তর পত্রিকায় দীপেন অসংখ্য রিপোর্টাজ লিখেছে। বেশিরভাগ রিপোর্টাজ রাজনৈতিক হলেও সেগুলির সাহিত্য-মূল্য কম নয়। দীপেনের সেইসব অনবদ্য রিপোর্টাজ পার্টির বাইরেও সাহিত্য জগতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সোমনাথ লাহিড়ী জন্মদাতা হলেও রিপোর্টাজের স্রষ্টা হিসাবে আমরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে জানতাম, পরবর্তীকালে ননী ভৌমিক এবং শেষে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপেনের পরে সেই জাতীয় রিপোর্টাজ আর চোখে পড়েনি। যেমন ভাষাশৈলী তেমন গভীরতা। সাধারণকে অসাধারণে পরিণত করার আশ্চর্য দক্ষতা।

কিছুকাল পরে দীপেন 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক হয়। প্রথমদিকে দীপেন ও কবি তরুণ সান্যাল যুগ্মভাবে, পরবর্তীকালে দীপেন এককভাবে। দীপেন আমি ও কবি তরুণ সান্যাল সমবয়সী বন্ধু। পরিচয় ও অন্যান্য সাহিত্য আন্দোলন দেখভাল করবার জন্য পার্টি একটি সাহিত্য শাখা গঠন করেছিল। দীপেন আর তরুণ হল 'পরিচয়' পত্রিকার

সম্পাদক আর আমি হলাম পার্টি শাখার সম্পাদক। বন্ধুত্ব ছাড়াও তাই আমাদের কাজের ছিল নিয়মিত যোগাযোগ। 'পরিচয়' পত্রিকার কাজকর্মে আমরা তিনজন মিলেই নিয়মিত আলোচনা করে দায়িত্ব ভাগ করে নিতাম। আমাদের সঙ্গে থাকতেন কবি ধনঞ্জয় দাস। ধনঞ্জয়কে আমরা কিছুদিন আগে হারিয়েছি। তখন দীপেন নিয়মিত একটা ঠাট্টা করত। বলত, কার বিয়োগপঞ্জি কে লিখবে! দীপেনের সঙ্গে একমত হয়ে আমি আর তরুণও বলে উঠতাম, 'আমাদের সকলের বিয়োগপঞ্জি ধনঞ্জয়ই লিখবে।' ধনঞ্জয় মোটেই রাগত না, মজাটাকে বেশ উপভোগ করত। মনে পড়ে, দীপেনের বিয়োগকথা অন্য অনেকের সঙ্গে ধনঞ্জয়ও লিখেছিল। আমি অক্ষরের পরে একটি অক্ষরও সাজাতে পারিনি। আমাদের মাঝে দীপেনই চলে গিয়েছিল সবচেয়ে আগে। আমরা কেউ কল্পনা করতে পারিনি।

'পরিচয়' পত্রিকার সেইসব দিনগুলি আজও আমাকে উজ্জীবিত করে। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে নিয়মিত লেখক ছিলাম না।

আমি ছাড়া দীপেনের আর একজন প্রিয়তম বন্ধু হল দেবেশ রায়। দেবেশ তখন জলপাইগুড়িতে থাকে, অধ্যাপনা করে, একের পর এক সাড়াজাগানো গল্প লেখে। আর চুটিয়ে পার্টি করে। দেবেশের ওপর দীপেনের গভীর দুর্বলতা ছিল। নিজের ওপরেও সে দেবেশকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করত—সে সংগঠনের ক্ষেত্রেই হোক আর সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রেই হোক। যেহেতু অনেক দূরে থাকত, সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেবেশ বিশেষ মাথা দিতে পারত না। দীপেন আর আমি আলোচনা করে যে সিদ্ধান্তই নিতাম, দেবেশ তাকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিত। স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসবার পর দেবেশ অবশ্য সংগঠন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। প্রগতি লেখক সংঘকে পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে স্টুডেন্টস হলে আমরা যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করি সেই প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হয় দেবেশ রায় ও সৌরি ঘটক।

এত বলবার কথা আছে যে খেই হারিয়ে ফেলছি। দীপেনকে জড়িয়ে আমার জীবনের এত ঘটনা, যে সব কথা বোধহয় গুছিয়ে বলতে পারছি না। শেষপর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা বাদ দিয়ে গিয়েছি। বলতে বলতে এমন দু' একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল—সেইসব কথা এখন বলছি।

এখনকার মতো শৌখিন জীবন তখন নয়। শৌখিন সাহিত্য আন্দোলনও নয়। ভিয়েতনাম কিউবা থেকে শুরু করে যে কোনো বিষয়েই (জাতীয় বা আন্তর্জাতিক)। আমরা আলোড়িত হই, পথে নামি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বললেন—'রাস্তাই আমাদের রাস্তা।' আমাদের মুখে মুখে ঘুরল সুভাষদার এই নতুন শ্লোগান।

আমার আর দীপেনের সেই সময় অন্যতম প্রধান কাজ ছিল লেখকদের স্বাক্ষর-সংগ্রহ। আমরা শম্ভু মিত্রের কাছে গিয়েছি, সত্যজিৎ রায়ের কাছে গিয়েছি, মৃণাল সেনের কাছে গিয়েছি, অন্নদাশংকর রায়ের কাছে গিয়েছি, গোপাল হালদারের কাছে গিয়েছি,

উৎপল দত্ত, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেনের কাছে গিয়েছি। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত কেউই বাদ যাননি। শুধু বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা নয়, বেশির ভাগ লেখকই আমাদের সঙ্গে থাকতেন। মতের কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, গৌরকিশোর ঘোষ আমাদের খুব একটা বিরোধিতা করতেন না। সকল লেখকের সঙ্গেই আমাদের ছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ক। সমবয়সী লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, কবিতা সিংহ প্রমুখ সকলের আমরা স্বাক্ষর নিতাম—যে কোনো বিবৃতিতেই হোক। মনে পড়ছে, শম্ভু মিত্রের বাড়ি গিয়ে একদিন দীপেন আর আমি অনেক সময় কাটিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি দীপেনই থাকত প্রধান ব্যক্তি, আমি তার সহকর্মী। শম্ভুবাবু সেইসময় নাসিরুদ্দিন রোডে থাকতেন না। সেখানে কন্যা শাঁওলী মিত্রকে নিয়ে থাকতেন তৃপ্তি মিত্র। পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর পরে পার্ক স্ট্রিটের ওপর একটি বাড়ির চারতলায় থাকতেন শম্ভু মিত্র। পুরানো দিনের বাড়ি, সিঁড়িগুলি বেশ উঁচু উঁচু। শম্ভুবাবু এই বাড়িতে বেশ কিছুকাল ছিলেন। দীপেন আর আমি গেলে শম্ভুবাবু সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। মেঝের ওপর ফরাস পাতা, ফরাসের ওপর ডানলোপিলোর গদি। গদির ওপর ছড়ানো-ছিটোনো রঙ-বেরঙের বালিশ। দীপেনের ওপর শম্ভুবাবুর ছিল গভীর ভালবাসা। আমার তো মনে হত দীপেনকে বেশ শ্রদ্ধাও করতেন শম্ভুবাবু। দীপেনের সহকর্মী হিসেবে তার প্রসাদ হয়তো আমিও কিছুটা পেতাম।

শম্ভুবাবু সবসময় আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন তা নয়। কখনও-সখনও তিনি স্বাক্ষর করতে সম্মত হননি। স্বাক্ষর করেছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, তবে সভা-সমিতিতে সাধারণত আসতে সম্মত হননি। যেদিনের কথা বলছি সেদিন শম্ভুবাবু গণনাট্য আন্দোলন, নবনাট্য আন্দোলনের প্রসঙ্গ ছাড়াও তাঁর নাট্য ভাবনার কথা আমাদের জানিয়েছিলেন। শম্ভুবাবুর সেই অসাধারণ বাচনভঙ্গি সমস্ত পরিবেশকে পবিত্র করে তুলত। সেই সময় শম্ভুবাবুর সঙ্গে তাঁর হাতেগড়া সংগঠন 'বহুরূপী'র মতভেদ ঘটেছে। সে প্রসঙ্গেও কিছু কিছু কথা বললেন। আমাদের বারবার বোঝাতে চাইলেন, জীবনে একটা সময় আসে যখন সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে হয়। নাট্যসংস্থা, সংসার, সর্বত্র থেকে তাঁর এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন। বুঝতে পারছিলাম, তাঁকে যেন আমরা ভুল না বুঝি সেই কথাটাই তিনি আমাদের বোঝাতে চাইছিলেন। সেদিনের শম্ভুবাবুর সেই কথাগুলি যদি পুরোটা ধরে রাখা যেত তাহলে গবেষকদের কাছে একটি মূল্যবান দলিল থেকে যেত। এতবছর পরে কতটুকু আর আমি বলতে পারি!

আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়টা ছিল সত্তর দশকের মাঝামাঝি। নকশাল আন্দোলনকে তখন গুঁড়িয়ে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। তাজা তাজা তরুণকে লাশে পরিণত করা হয়েছে। অথচ পার্টিগত ভাবে দীপেন আর আমি সেই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে সরকারের সহযোগী। আজ ভাবতে শুধু লজ্জা লাগে তাই নয়, নিজেকে ধিক্কার

দিতে ইচ্ছে করে, কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না। শম্ভুবাবু সেদিন নকশালদের সম্পর্কেও অনেক কথা বলেছিলেন। অথচ নকশালদের সঙ্গে দীপেন আর আমার দুজনেরই খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। আমাদের দুজনকে ওরা কখনই শত্রু হিসাবে ভাবেনি। পার্টির নীতি যাই হোক না কেন নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে দীপেন, সুভাষদা আর আমার গভীর দুর্বলতা ছিল। সুভাষদা তো লিখেছিলেন তাঁর সেই কবিতা 'ছেলে গেছে বনে'।

উনিশশো সাতষট্টি সালে প্রথম ও উনিশশো উনসত্তর-এ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার কথা মনে পড়ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা গঠনের সময় কি অসাধারণ উৎসাহ ছিল আমাদের। দীপেন আর আমি লেখক-শিল্পীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে কত স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলাম! বিশেষভাবে ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতায় এবং তদানীন্তন রাজ্যপাল ধরমবীরের সহযোগিতায় প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার যখন আকস্মিক পতন ঘটল, তখন আমরা সবাই পথে নেমে পড়লাম। মনে আছে সেদিনের আইন-বিরোধী আন্দোলন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অংশগ্রহণ করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে বাড়ির সকলকে লুকিয়ে আমার মা-ও গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। মায়ের এই গ্রেপ্তারের কথা আমি জানতাম না। দীপেনই আমাকে প্রথম খবর দিল।

যে কোনো আন্দোলন দীপেন সব সময় সামনের সারিতে থাকত। কোনোরকম ভয় তার মাঝে দেখিনি। শারীরিক অক্ষমতাকে দীপেন কখনও স্বীকার করেনি। পথসভাতেও তাকে দিনের পর দিন বক্তৃতা করতে দেখেছি। তার সাহস অন্যদের সাহস জোগাত। দীপেনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত না এমন মানুষ আমি খুব কম দেখেছি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে পড়ছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এপারের বাঙালিদের আলোড়িত করে তুলেছিল। পাক-সেনাদের অত্যাচারে হাজার হাজার বাংলা ভাষাভাষী মানুষ প্রতিদিন এবার বাংলায় চলে আসছেন। সীমান্ত এলাকায় খোলা হয়েছে অসংখ্য শরণার্থী শিবির। সেই সব শরণার্থীদের মধ্যে রয়েছেন নামী-অনামী অসংখ্য লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী। তাঁদের পাশে কীভাবে দাঁড়ানো যায় সে কথা দীপেন আর আমি অহরহ আলোচনা করছি। এই সময় দীপেন আমাকে একদিন সকালে নাসিরুদ্দিন রোডে বিখ্যাত আইনজীবী এবং পরবর্তীকালে বিচারক মাসুদ সাহেবের বাড়িতে নিয়ে গেল। শম্ভু মিত্রের বাড়ির ঠিক পাশেই মাসুদ সাহেবের বিশাল বাড়ি। মাসুদ সাহেবের ছোট ভাই মনসুর আর আমি একসঙ্গে অনেকদিন ছাত্র-রাজনীতি করেছি। তখন থেকেই এই বাড়িতে আমার যাতায়াত। তাছাড়া মাসুদ সাহেব ছিলেন প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেই বাড়িতে দীপেন আমাকে অসাধারণ বিনয়ী একটি মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। দীপেনের মুখ থেকে শুনলাম কাল রাতেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরেছেন। তখনই দীপেনের সঙ্গে দেখা ও পরিচয় হয়েছে। আজ দীপেন সকালে

আমাকে নিয়ে এসেছে কিছু কথাবার্তা বলার জন্যে। অসাধারণ বিনয়ী এই মানুষটি হলেন ঢাকার বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানট'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ওহিদুল হক। রবীন্দ্রসংগীতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে তাঁব পরিচিতি। তাঁর স্ত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধের আরেকজন কর্মী হলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সনজিদা খাতুন। ওহিদুল হকের মুখে সবসময় মিষ্টি একটা হাসি লেগে থাকত। কিছুক্ষণ আলোচনার পর দীপেন আর আমি ফিরে আসি।

দীপেন আর বাড়ি ফেরে না। আমার বাসাতেই দুপুরের খাওয়া সেরে নেয়। উদ্দেশ্য একটাই, সময় নষ্ট নয়, আজকেই একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে মিলে আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম। স্থির হয় বাংলাদেশের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের পাশে দাঁড়াবার জন্য আমরা একটি সংগঠন গড়ে তুলব। ওপারের লেখক-শিল্পীদের তখন চরম দুরবস্থা। থাকবার জায়গা নেই, খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। এঁদের মধ্যে অসংখ্য তরুণ-তরুণীও আছে। আমরা দুজনেই জানতাম আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তবু আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম। সেদিনই দীপেন আর আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা সেরে আনন্দবাজারে সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে দেখা করলাম। সন্তোষদা ছিলেন খুব আবেগপ্রবণ মানুষ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিছু কাজ করবার জন্য তিনিও আকুল হয়েছিলেন। আমরা সংগঠন গড়বার স্থির সিদ্ধান্তে এসে গিয়েছি। একদিনের ভাবনাতেই জন্ম নিল একটি সংগঠন। আমি সবসময় সঙ্গে থাকলেও সেই সংগঠনের প্রধান হিসেবে আমি দীপেনকেই চিহ্নিত করব। এই সংগঠনের নাম দেওয়া হল 'বাংলাদেশ লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সহায়ক সমিতি'। শান্তি সংসদের কার্যালয় ১৪৪ নম্বর লেনিন সরণি হল এই সমিতির কার্যালয়। সেখানে বিশাল হলঘরে দিনের পর দিন সভা হয়েছে, গানের মহড়া চলেছে। পশ্চিমবাংলার বেশিরভাগ লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী এই সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়লেন। সমিতির সভাপতি হলেন বিখ্যাত শিশুরোগ চিকিৎসক ডা. মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস, সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর কোষাধ্যক্ষ হলাম আমি।

বাংলাদেশের শিল্পীদের নিয়ে আমরা অনেক অনুষ্ঠান করেছি, অর্থ সংগ্রহ করে তাদের বাঁচবার ব্যবস্থা করেছিলাম। বাংলাদেশের লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যার্থে আমরা রবীন্দ্রসদনে দুই দিনের অনুষ্ঠান করেছি। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সকল খ্যাতনামা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরা আর দ্বিতীয়দিন বাংলাদেশের শিল্পীরা পরিবেশন করেছিলেন 'রূপান্তরের গান'।

দীপেন ও আমি একসঙ্গে মিলে জীবনে যত কাজ করেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার এই কাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করি। ছোট থেকে বড় সকল লেখক-শিল্পী বুদ্ধিজীবীর দীপেনের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা।

আমাকে মূল্য দিতেন না এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু দীপেনকে তাঁরা প্রায়

ঈশ্বরের স্থানে বসিয়েছিলেন। আমাকে বোধহয় মনে করতেন সেই ঈশ্বরের সহযোগী।

দীপেন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে কত বছর হয়ে গেল। মুখে যে যাই বলি না কেন দীপেনের জন্য আমরা কেউ কিছু করিনি। তার প্রিয়তম বন্ধু দেবেশও করেনি, আমিও করিনি। করলে তাঁর সমগ্র রচনাসংগ্রহ অনেক আগেই প্রকাশিত হত। দেবেশের সম্পাদনায় একখণ্ডে থেমে থাকত না। তরুণ লেখক ও সাংবাদিক অনিশ্চয় চক্রবর্তীর উদ্যোগ ও সম্পাদনায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে 'গল্প ও উপন্যাস সংগ্রহ', অন্যান্য রচনাও প্রকাশের মুখে। অনিশ্চয়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। দীপেনকে প্রকৃত অর্থে অনিশ্চয়ই বাঁচিয়ে রাখল। আমরা তার বন্ধুরা নই।

দীপেনের চলে যাওয়াটাও বড় আকস্মিক। সামান্য অসুখ নিয়ে সে পি. জিতে ভর্তি হয়েছিল। সেই সামান্য অসুখ যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে আমাদের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেবে তা ভাবতে পারিনি। পি. জি. হাসপাতাল চত্বরে দীপেনের সুস্থতার কামনায় সারাদিনরাত তার অসংখ্য সহকর্মী-বন্ধু সময় কাটিয়েছিলেন। তবু দীপেনকে আমরা ধরে রাখতে পারিনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোক মিছিলে আমি আর দীপেন ছিলাম পাশাপাশি। আর দীপেনের শোকমিছিলে আমি হয়ে গেলাম একা। কেওড়াতলা শ্মশানে আমি এক কোণায় দাঁড়িয়েছিলাম। কারোর সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। দীপেনের মরদেহের দিকে আমি একবারের জন্যও তাকাইনি, তাকাতে পারিনি।

শিশিরমঞ্চে দীপেনের স্মরণসভার কথা মনে পড়ছে। এতদিন স্মরণসভার আয়োজন করেছি আমি আর দীপেন একসঙ্গে। আর আজ সেই দীপেনেরই স্মরণসভা। আমি আয়োজক নই। হওয়া সম্ভবও নয়। আমিও তো রক্তমাংসে গড়া মানুষ!

আমি বসেছিলাম একেবারে পিছনের আসনে। আমাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে চাইলেও আমি যাইনি বা যেতে পারিনি। কেমন একটা কান্না আমার ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আমি মাথা নীচু করে চুপচাপ বসেছিলাম। কে কি বলেছিলেন আমার স্মরণে নেই। কারণ কোনো বক্তব্য শোনার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। শুধুমাত্র স্মরণে আছে শম্ভু মিত্র দীপেনের 'জটায়ু' গল্পটি সেখানে পাঠ করেছিলেন। পাঠ করবার সময় বারবার তাঁর গলা ধরে আসছিল। জানি না আমার মতো একটা কান্না তাঁরও ভেতরটা তোলপাড় করছিল কিনা! এটা যে দীপেনের স্মরণসভা সেকথা আমার একবারের জন্যও মনে হয়নি। কারণ দীপেন নেই একথা তো আমার মন মানতে পারেনি।

আজ এত বছর পরেও আমার কখনও মনে হয় না দীপেন আর আমি পাশাপাশি নেই। দীপেনের অস্তিত্ব আমি সবসময় অনুভব করি। দীপেন আমার কাছে তখন যেমন ছিল আজও আছে, তার মতো আমারও শূন্যে বিলীন হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে।

পূর্ণেন্দু পত্রী

আমি যখনই আমার দিকে ফিরে তাকাই তখনই আমার চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়ায় পঞ্চাশের দশকের উজ্জ্বল দিনগুলি। সেইসব দিনে আমি যাঁদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম তাঁবা আমার জীবন ভরে আছেন। এমনই একজন হলেন আমার প্রিয়তম বন্ধু পূর্ণেন্দু পত্রী।

পূর্ণেন্দু কলকাতায় আসে পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়। আসবার কিছুদিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে সম্পর্ক এবং গভীরতা। আমরা দু'জনে সমবয়সী। পূর্ণেন্দু হাওড়ার ছেলে। কলকাতায় এসে সে থাকতে শুরু করে শ্রীমানি মার্কেটের দোতলায় তার কাকা নিকুঞ্জ পত্রীর সঙ্গে। নিকুঞ্জ পত্রী তখন সিনেমার পত্রিকা প্রকাশ করেন। সিনেমা জগতে বেশ পরিচিত।

দেশে থাকতেই পূর্ণেন্দু কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। কলকাতায় এসে সেই-ই 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমি তখন বেশ দাপটের সঙ্গে ছোটদের পত্রিকা 'আগামী' প্রকাশ করছি। নিকুঞ্জ পত্রীর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। যতদূর মনে পড়ে 'পরিচয়' পত্রিকার অফিসেই পূর্ণেন্দুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। পূর্ণেন্দু তখন ভাল কবিতা লিখছে। এখানে ওখানে প্রকাশিত হচ্ছে। তখন এমন বাণিজ্যিক যুগ ছিল না। লিটল ম্যাগাজিনের যুগ বলা যেতে পারে। কোনোরকমে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে পত্রিকা প্রকাশ করা ছিল আমাদের নেশা। পূর্ণেন্দুও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। প্রথমে পূর্ণেন্দু গদ্য রচনায় হাত দেয়নি। ওর গদ্য রচনার কথা আমি প্রথম জানতে পারি ওর মুখ থেকে। তখন সিনেমার পত্রিকা 'উল্টোরথে'র খুব নাম-ডাক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর নবীন লেখকদের জন্য উল্টোরথ 'মানিক স্মৃতি পুরস্কার' নামে একটি পুরস্কার ঘোষণা করে। এই সময় পূর্ণেন্দু আকস্মিকভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করে, কি রে, তুই কি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছিস?

আমি জবাব দিই, 'ধুৎ, তোর মাথা খারাপ! আমার সেই যোগ্যতাও নেই, বাসনাও নেই। যা করছি তাতেই আমি খুশি। মনে হচ্ছে, তুই বোধহয় অংশ নিচ্ছিস!'

পূর্ণেন্দু জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি একটি উপন্যাস প্রায় শেষ করে এনেছি। তোকে পড়ানোর খুব ইচ্ছে। কিন্তু জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এগিয়ে আসছে। পড়াবার বোধহয় সুযোগ হবে না।'

পূর্ণেন্দু যথারীতি তার জীবনের প্রথম উপন্যাস সেই প্রতিযোগিতায় জমা দিল। আর আমি আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেলাম, সে দ্বিতীয় পুরস্কারও লাভ করল। তখনকার দিনের নামী লেখকেরা ছিলেন বিচারক। প্রথম পুরস্কার পেল মতি নন্দী, দ্বিতীয় পূর্ণেন্দু পত্রী আর তৃতীয় পুরস্কার লাভ করল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ণেন্দুর উপন্যাসটির নাম

'দাঁড়ের ময়না'। পরবর্তীকালে অন্যতম বিচারক প্রেমেন্দ্র মিত্রর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। প্রেমেনদা তিনজন লেখকেরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন, কাকে প্রথম, কাকে দ্বিতীয় আর কাকে তৃতীয় করব এই বিচার করতে আমাকে হিমশিম খেতে হয়েছে। ঔপন্যাসিক হিসেবে পরবর্তী জীবনে মতি নন্দী ও অতীন খুব নাম করলেও পূর্ণেন্দু শুধু উপন্যাস বা কথা সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেনি। শিল্প সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই সে সফলতার সঙ্গে বিচরণ করেছে।

আমি যখনকার কথা বলছি তখন পূর্ণেন্দুকে খুবই সংগ্রাম করতে হচ্ছে। কিন্তু এই অসচ্ছলতা তার সৃষ্টিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। শিল্পী হিসেবেও নতুন এক পূর্ণেন্দুর আত্মপ্রকাশ ঘটল। প্রচ্ছদ এবং অলঙ্করণে সে আলোড়ন তুলে দিল। সত্যজিৎ রায় তখন প্রচ্ছদ অলঙ্করণের জগত থেকে প্রায় অবসর নিয়েছেন। বাজারে খালেদ চৌধুরী ছাড়া এমন কোনো নতুন ধারার শিল্পী ছিলেন না বলা চলে। পুরানো ধারার শিল্পীরা তখন সবাই ম্রিয়মাণ।

সেই সময় 'আগামী'র একটি শারদীয় সংখ্যায় পূর্ণেন্দু প্রচ্ছদ থেকে অলঙ্করণ সব কাজ একাই করল। শারদীয় সংখ্যাকে আমরা বইয়ের মতো 'বার্ষিক আগামী' হিসেবে প্রকাশ করতাম। পূর্ণেন্দুর সেইসব অলঙ্করণ আজ যখন আমি উল্টেপাল্টে দেখি তখন ভাবি কি অসাধারণ প্রতিভার সে অধিকারী ছিল। অলঙ্করণের কতরকমের বৈচিত্র্য। পূর্ণেন্দু কখনো তার শ্রীমানি মার্কেটের ঘরে কখনো আবার আমাদের পটুয়াটোলা লেনের কার্যালয়ে কাজ করত। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে তার খুবই নামডাক হল। প্রকাশনা ও পত্রিকা জগৎ তার পেছনে দৌড়তে লাগল। স্বাভাবিকভাবে তার জীবনে এসে গেল কিছু সচ্ছলতা।

ইতিমধ্যে সে একটি কাণ্ড করে বসল। একদিন আমাকে বলল, তোকে আমাদের দেশের বাড়িতে যেতে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

পূর্ণেন্দু জবাব দিল, তোদের মতো ভীতু নাকি আমি—বিয়ে করছি।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ওর অতি অল্প বয়স, সেরকম চাল নেই চুলো নেই তার মধ্যে আবার সংসার পেতে বসছে। বুকের পাটা আছে বটে! বিয়ে অবশ্য তার বাড়ি থেকেই দিয়েছিল। কিন্তু সে রাজি না হলে বাড়ি থেকে দেওয়া কি সম্ভব!

অসুস্থ হয়ে পড়ায় পূর্ণেন্দুর বিয়েতে আমি যেতে পারিনি। যারা গিয়েছিল তাদের মুখে শুনেছি যে বিয়েতে তারা খুব আনন্দ করেছিল। শুনে মনটা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে।

ফিরে এসে সে দেখা করেছিল। আমাদের মধ্যে সে-ই প্রথম বিবাহিত ব্যক্তি। রাতারাতি সে বোধহয় অনেকটা জাতে উঠে গেল। কথায় কথায় কথা শোনাতে সে ভুলত না—সাহস আছে তাই দায়িত্ব নিয়েছি।

ঠিকই তো! অস্বীকার করি কি করে! মনে হত, সত্যিই আমরা বোধহয় কাপুরুষ।

কিছুদিনের মধ্যেই তার খুব নামডাক হয়ে গেল। একদিকে প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের কাজ করছে অন্যদিকে চালিয়ে যাচ্ছে সাহিত্যচর্চা। সাহিত্যের নানা পথে সে তখন বিচরণ শুরু করেছে। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে মেতে উঠেছে। সাহিত্যের নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে। দেখা হলেই কলকাতার গল্প করত। মুগ্ধ বিস্ময়ে তার কাছ থেকে কলকাতার ইতিহাস জানতাম।

ইতিমধ্যে একদিন সন্ধ্যায় সে এসে জানিয়ে গেল যে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেছে—শিল্প নির্দেশক হিসেবে। আমি খুব খুশি হলাম। বন্ধুদের মধ্যে পূর্ণেন্দুর উত্থান আমাদের সকলকেই খুব গর্বিত করেছিল। তবে পূর্ণেন্দুর এই উত্থান আমাদের মধ্যে কিছুটা ফারাকের সৃষ্টি করল। সেটা অন্য কোনো কারণ নয়। ওর অত্যধিক ব্যস্ততা এই ফারাকের মূল কারণ। তাঁর মাঝে অহঙ্কারের কোনো চিহ্নই দেখা দেয়নি। বন্ধুদের কাছে সে যেমন ছিল তেমনি থাকল। সাক্ষাৎ হলে সেই একই রকমের উত্তাপ।

এখানেই থেমে থাকলে কথা ছিল। কিন্তু থামবার পাত্র সে নয়। একদিন শুনলাম চলচ্চিত্র পরিচালনায় মেতে উঠেছে। ইতিমধ্যে একদিন আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে দেখা। আমাকে টেনে উপরে ক্যান্টিনে নিয়ে গেল। নিজেই বলল সবকিছু। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটিকে সে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছে।

আমি বললাম, কি রে তুই সত্যজিৎবাবুকেও রেহাই দিবি না!

পূর্ণেন্দু হাসতে লাগল। খুবই সমস্যার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে সে কথা জানাল। একদিন স্যুটিংয়ে আমন্ত্রণও করল। তারপর সত্যি সত্যি নানা দুঃখ-কষ্ট, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পূর্ণেন্দু ছবিটি শেষ করে ফেলল। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, নানা বৈচিত্র্যের এত কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে কি করে। তাছাড়া ওর শরীর যে খুব পোক্ত তেমন ছিল না। হাঁপানির অসুখে মাঝে মাঝে সে খুব কষ্ট পেত। কিন্তু কোনোভাবেই সে থেমে থাকেনি। লেখা, ছবি আঁকা, ছবি করা, সব দিকেই সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছে। প্রতিভার এমন বৈচিত্র্য খুব কমই চোখে পড়ে। একদিন কফি হাউসে দেখা হতে ওকে বললাম, 'তুই তো রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিস। রবীন্দ্রনাথ তো আর চলচ্চিত্র পরিচালনা করেননি। তবে একটা দিকে তোর খামতি আছে কিন্তু, তুই রবীন্দ্রনাথের মতো মঞ্চে মেয়ে নাচাতে পারিসনি।'

পূর্ণেন্দু হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'তোর কোনো ভাবনা নেই, কিছুদিনের মধ্যেই নাচিয়ে দেব।'

সে অবশ্য নাচাতে পারেনি বা সেই সুযোগ পায়নি।

এত কাজের মধ্যেও পূর্ণেন্দুর কলম কখনো থামেনি। কত রকমের লেখা সে লিখে

গিয়েছিল। শুধু কলকাতা নয়, অন্যান্য প্রসঙ্গেও অনেক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সে লিখেছে। পুরানো দিনের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল খুব গভীর। সুযোগ পেলেই সে দিনগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করত। কতবার যে এই প্রসঙ্গে গল্প করেছে তার ঠিক নেই।

শিল্প-সাহিত্যের যে ক্ষেত্রেই সে হাত দিয়েছে কোথাও সে খুব অসার্থক হয়নি। কিঞ্চিত হলেও একটা ছাপ রাখতে সে পেরেছে। সে কবিতায় হোক, গদ্য সাহিত্যে হোক, ইতিহাসে হোক, চিত্রাঙ্কনে হোক, চলচ্চিত্রে হোক বা যে কোনো বিষয়ে। শুধু কমার্শিয়াল আর্টের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে পূর্ণেন্দু অসংখ্য ছবি এঁকেছিল এবং তার প্রদর্শনীও করেছিল। শেষবার তার সল্টলেকের বাড়িতে আমি যখন তার সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলাম তখন সে তার সর্বশেষ প্রদর্শনীর ছবি নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে ঘুরে ঘুরে ছবিগুলো দেখচ্ছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে তার এই অসাধারণ সৃষ্টি উপভোগ করছিলাম। সেদিন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম। সে বারবার বলছিল যে সে বড় ক্লান্ত। লেখা ও ছবি আঁকা ছাড়া সে আর অন্য কোনো দিকে মাথা দিতে চায় না। বন্ধু-বান্ধব ছাড়া কারো বইয়ের প্রচ্ছদও সে করতে চায় না।

আমি বলেছিলাম, 'তোর এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। সব দিকে বিচরণ করতে গিয়ে তোর অনেক কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না। আমাদের সবারই বয়স হয়ে যাচ্ছে, একটা জায়গায় এবার দাঁড়ানো দরকার।'

পূর্ণেন্দু জবাব দিয়েছিল, 'ঠিকই বলেছিস। সেই কারণেই তো এমন ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।'

আনন্দবাজার পত্রিকার শিল্প বিভাগে সে ছিল সর্বেসর্বা। তাকে হঠাৎ বসিয়ে দেওয়া হল। কেন আমি জানি না। তার সেই দুঃসময়ে একটি প্রচ্ছদ আঁকানোর জন্যে তার কাছে আনন্দবাজার অফিসে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম শিল্প বিভাগের বাইরে একটি ঘরে তার বসার ব্যবস্থা। সে আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মনের মাঝে চেপে রাখা দুঃখ ও বেদনা প্রকাশের জন্য আঁকুপাঁকু করতে লাগল। হঠাৎ সে তার তুলি দেখিয়ে বলল, দ্যাখ এখানে আমার সব তুলি শুকিয়ে গেছে। আমাকে কোনো তুলি ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয় না।

আমি বললাম, 'যা থাকে কপালে, তুই ছেড়ে দে। এখন তো তোর সেই অভাব নেই। যেটুকু কাজ তুই করবি তাতে তোর ভাতের অভাব হবে না।'

পূর্ণেন্দু জবাব দিল, 'অনেক টাকা পাই, সেই মোহতে ছাড়তে পারছি না। কিন্তু তুই ঠিকই বলেছিস ছাড়তে আমাকে হবেই। মানুষের এমন অসম্মান সহ্য করা কঠিন।'

ইতিমধ্যে তার সামনে একটা সুযোগ এসে গেল। প্রিয়ব্রত দেব ও স্বপ্না দেব 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন শুরু করলেন। স্বপ্না আমার খুব স্নেহের পাত্রী। সাক্ষরতা আন্দোলনে সে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আমার ছাপাখানার পাশেই ছিল

তাদের কার্যালয়। তখন প্রায় রোজই দেখা হত স্বপ্নার সঙ্গে। একদিন প্রিয়ব্রত-স্বপ্না ও পূর্ণেন্দু আমার কাছে এসে হাজির। 'প্রতিক্ষণ' প্রকাশের সব পরিকল্পনা আমাকে জানাল। চৌরঙ্গিতে তারা বিশাল অফিস নিয়েছে। তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রণব মুখোপাধ্যায়। তিনি বোধহয় তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তাঁর সাহায্য ছাড়া এমন জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। সাক্ষরতা আন্দোলনের সময় থেকেই প্রণববাবুর সঙ্গে স্বপ্নাদের যোগাযোগ ছিল। আমার সঙ্গেও যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু কেন জানি না মানুষ খুব বড় হয়ে গেলে আমি চিরকাল তাঁর থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিই। নিজে কাছে টেনে নিলে অবশ্য অন্যকথা। যাঁদের কথা আমি বলছি তাঁরা সবাই বড় মাপের মানুষ আমি জানি, কিন্তু কেউ-ই আমাকে দূরে সরিয়ে দেননি। পূর্ণেন্দুরও তো খুবই নামডাক। কিন্তু আমি চাই বা না চাই সে কিন্তু পুরানো সম্পর্ক একইরকমভাবে রক্ষা করেছে।

যাক সে সব কথা। 'প্রতিক্ষণ'-এর সঙ্গে পূর্ণেন্দু সম্পর্কিত হল। তার আগে অবশ্য সে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে। তিনজন শিক্ষিত তরুণ—রাজীব, রঞ্জন, আর দীপক এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি কিনে নিয়েছে। এককালে খুব নামী এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন অমিয় মুখোপাধ্যায়। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গেলে আমার মন ভরে যেত। তখনকার যত পণ্ডিতজন তাঁদের সকলের আড্ডা ছিল অমিয়বাবুর এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে, তাঁদের প্রায় সকলেরই বই এ. মুখার্জী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ড. সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, সুবোধ সেনগুপ্ত, গোপাল হালদার, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখের সকল মূল্যবান বইয়ের প্রকাশক এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি। অমিয়বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র কন্যা এই মূল্যবান প্রতিষ্ঠানটি রাজীবদের কাছে বিক্রি করে দেয়। রাজীবরা বেশ একটা হৈ-হল্লা করে তাদের যাত্রা শুরু করে। পূর্ণেন্দুকে তারা তাদের মাঝে টেনে নেয়। সে এ. মুখার্জীর অসাধারণ নতুন লোগো তৈরি করে, আর একটা মজার শ্লোগান দেয়—'আমরা বই ছাপি না, বিষয় ছাপি'। এইসব চমকের ভাষায় সে প্রথম যুগ থেকেই ছিল সিদ্ধহস্ত। এ. মুখার্জী এবং প্রতিক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও পূর্ণেন্দু তখনো কিন্তু আনন্দবাজারের চাকরি ছাড়েনি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সে চাকরি ছেড়ে দেয়।

আমি তখন মাঝে মাঝে 'প্রতিক্ষণ' অফিসে আড্ডা মারতে যেতাম। আমার পরিচিত অনেকেই তখন ওই পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। খুবই সুন্দরভাবে পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সুন্দর প্রোডাকশনের দিকে প্রিয়ব্রতর অসাধারণ ঝোঁক। তাছাড়া পূর্ণেন্দু তো প্রাণ ঢেলে পত্রিকা সাজাচ্ছে। তার যোগ্যতা তো প্রশ্নাতীত। খুব ঘনিষ্ঠজন ছাড়া কারোর আর প্রচ্ছদের কাজ তখন সে করতে চায় না। আমি বললে সে কখনই না করে না। সেই সময় আমি 'বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র' প্রকাশ করছি। কোনোরকম ছবি ব্যবহার না করে তার

অঙ্কিত সেই প্রচ্ছদ অমর হয়ে আছে। মনে আছে 'প্রতিক্ষণ' অফিসে বসে সে আমার চোখের সামনেই এই প্রচ্ছদটি এঁকেছিল। আমার চোখের সামনেই এমন কাজ সে অনেক করেছে। সাধারণকে অসাধারণত্বে নিয়ে যাওয়ার কি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার।

একদিন কথায় কথায় সে আমাকে তার সেই প্রথম যুগের উপন্যাস 'দাঁড়ের ময়না' প্রকাশ করতে বলল। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি। নতুন ভাবে সে প্রচ্ছদ আঁকল। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপন্যাসটি সেভাবে বিক্রি হয়নি। আজকের পাঠকের মানসিকতা অনেক পাল্টে গেছে। 'দাঁড়ের ময়না'-র মতো সিরিয়াস উপন্যাস তাদের মন টানে না। হালকা যুগের হালকা লেখকদের হালকা লেখায় হালকা পাঠকদের আকর্ষণ করে। এই যুগটা আমাদের কাছে কেমন যেন অচেনা, অজানা। আমরা একে স্পর্শ করতে পারি না। যাক যা সত্য তাকে তো মেনেই নিতে হবে।

অস্থির চরিত্রের পূর্ণেন্দু প্রতিক্ষণের সঙ্গেও খুব বেশিকাল থাকতে পারেনি। তবে সম্পর্ক কিন্তু ত্যাগ করেনি। প্রিয়ব্রত-স্বপ্নার কাছে কোনো অসম্মানই সে কখনো পায়নি।

শেষ সময়ে সে 'আজকাল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। পত্রিকা অফিসে কয়েকবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ জমিয়ে আড্ডা মেরেছি। তখন সে বঙ্কিম বা বিদ্যাসাগরের উপর একটি কাজ করছিল। জানি না কাজটি সে শেষ করতে পেরেছিল কিনা।

তারপর একদিন খবর পেলাম সে হাসপাতালে, সে আর বেশিদিন নেই। কেন জানি না তার কাছে যেতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। একটা ভয় আমাকে বারবার পিছনে টেনে ধরছিল। সেই কুড়ি বছর বয়স থেকে আমরা পাশাপাশি পথ হাঁটছি। সে জীবনে অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। তার আলোকে আমিও আলোকিত। সেই আলো আজ নিভে যাওয়ার মুখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আর তাতেই আমার এমন ভয়।

সে ভয়ের অবসান ঘটিয়ে পূর্ণেন্দু আমাদের ছেড়ে চলে গেল। রেখে গেল শূন্য স্মৃতি। সেই স্মৃতিকে বুকে বেঁধে আজও পথ হাঁটছি। একেবারে একা।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

জীবনে জীবন যোগ করে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য আমাদের থমকে যেতে হয় যখন জীবনের একটি তারা অকস্মাৎ খসে পড়ে। জীবন যত দীর্ঘায়ত হয় ততই এই তারার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর তাতেই আমাদের মনের মাঝে জন্ম নেয় ব্যথা-বেদনা-যন্ত্রণা। যেমন আজ আমি ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি আমার জীবনের প্রিয়তম তারা বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে হারিয়ে। দেখতে দেখতে তাও তো দু'বছর কেটে গেল। আমার জীবনে যে দু-চার জন সমবয়সী প্রিয়তম বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি তাদের মধ্যে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৫২ সালে। 'আগামী' পত্রিকা প্রকাশের কিছুকাল পরে। সেই পরিচয় কখন যে বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হল তা আমরা দু'জনের কেউই বুঝতে পারিনি। সেদিনের সেই বন্ধুত্ব সমানভাবে টিঁকেছিল যতদিন বরেন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়নি।

বরেন জামশেদপুরের ছেলে। কলকাতায় পড়তে এসে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হল। সেই সময়েই সে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নজরে পড়ে। সুভাষদা তখন 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক। বরেনেব লেখা ছড়া সুভাষদাকে চমকে দেয়। সুভাষদাই প্রথম আমাকে বরেনের কথা বলেন। ইচ্ছা প্রকাশ করেন যেন আমি বরেনকে 'আগামী'র মাঝে টেনে নিয়মিত ছড়া লেখাই। এই কথার কয়েকদিন পরেই সুভাষদার চিঠি নিয়ে বরেন আমার সঙ্গে দেখা করল। সেই আমার বরেনের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্বের শুরু।

বরেনের লেখা ছড়া তখন আমাদের বন্ধুদের মাঝে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। 'আগামী' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকল বরেনের সেই সব অসাধারণ ছড়াগুলি। দুর্ভাগ্যের বিষয় বরেনের সেই সব সাড়া জাগানো ছড়া কোথায় হারিয়ে গেছে। ছড়াকার হিসেবে বরেনের নাম কোথাও উল্লেখ হতে দেখি না।

সেই সময় লেখালিখি নিয়ে আমরা যারা নিয়মিত আড্ডা দিতাম তাদের মধ্যে বরেন ছাড়াও ছিল মিহির সেন, সুবীর হাজরা, প্রণব বিশ্বাস, বীরেশ্বর সরকার প্রমুখ আরও কয়েকজন। বীরেশ্বর ছিল খুব ধনী সন্তান। বি. সরকার জহুরির মালিক। বন্ধুদের তুলে ধরবার জন্য সেই সময় বীরেশ্বর একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে। সেখান থেকে প্রকাশিত হয় বরেনের প্রথম ছড়া-সংগ্রহ। সে বই কারও কাছে আছে কিনা জানি না। আমার কাছে নেই, বরেনের কাছেও ছিল না। সেই সময় বরেন ছোটদের নাটকও লেখে। অজানা এক প্রকাশকের কাছ থেকে তার একটি নাটকের বইও প্রকাশিত হয়। যথারীতি সেটিও হারিয়ে গেছে।

বরেন তখন 'আগামী' পত্রিকার লেখক নয়—নিয়মিত কর্মী। সবসময় আমার পাশে

থেকেছে। পত্রিকা পরিকল্পনায় সাহায্য করেছে, ব্যবস্থাপনার কাজও ভাগ করে নিয়েছে। প্রতিদিনই আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়।

স্কটিশে পড়া শেষ করে বরেন হঠাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে শিক্ষকতার চাকরি নেয়। প্রতি শনিবারে সোজা চলে আসত আমাদের কার্যালয়ে। আর ছুটির দিনে তো নিয়মিতই হাজির থাকত। 'আগামী'র আড্ডা তখন খুব জমজমাট। প্রবীণ থেকে নবীন অনেক লেখকের উপস্থিতিতে গমগম করত 'আগামী'র কার্যালয়। আমাদের দুই শিল্পী বন্ধু তখন গভীরভাবে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। একজন পূর্ণেন্দু পত্রী, অন্যজন সুবোধ দাশগুপ্ত। সুবোধ দাশগুপ্ত তখন প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার কাজে বেশ স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুবোধ নিয়মিত 'দেশ' পত্রিকায় ইলাস্ট্রেশনের কাজ করছে। 'দেশ' পত্রিকায় তখন গল্পের দায়িত্বে ছিলেন বিমল কর। বিমল করের লেখার আমরা সকলেই খুব ভক্ত। স্পষ্ট মনে আছে, একদিন 'আগামী' কার্যালয়ে আমি আর সুবোধ বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি এমন সময় বরেন এসে হাজির। বরেন এসে জানাল সে একটি গল্প লিখেছে এবং আমাদের পড়াবার জন্য গল্পটি নিয়েও এসেছে। বরেন এ কথাও জানাল গল্পটি ছোটদের নয়, বড়দের। আমি সুবোধ দুজনেই অবাক। তারপর বরেন গল্পটি আমাদের দুজনকে পড়ে শোনাল। প্রথমে অবাক হওয়া এবার চমকে পরিণত হল। এমন অসাধারণ গল্প যে বরেন লিখতে পারে আমরা কেউই তা ভাবতে পারিনি। গল্পটির নাম 'বজরা'। ঠিক হল, সুবোধ গল্পটি নিয়ে বিমলদার হাতে পৌঁছে দেবে। সুবোধ সে দায়িত্ব পালন করেছিল। কয়েকদিন পরে সুবোধ জানাল গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে এবং সুবোধ তার ছবিও এঁকে দিয়েছে। মনে আছে, গল্পটি প্রকাশিত হবার পর চারদিকে কীরকম আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সবাই বরেনকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। প্রিয় বন্ধু হিসেবে আমারও বুক গর্বে ভরে উঠেছিল।

বরেন ছিল খুব লাজুক প্রকৃতির, মিষ্টি স্বভাবের। সকলের সঙ্গে মেলামেশার সময় তার ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই থাকত। গল্পটি প্রকাশিত হবার পর বিমলদা বরেনকে ডেকে পাঠালেন এবং পরবর্তীকালে বরেনই বোধহয় হয়ে উঠল বিমলদার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র। 'বজরা' থেকে শুরু। তারপর একের পর এক বরেনের গল্প 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বরেন তরুণ লেখকদের প্রথম সারিতে চলে এল। ছোটদের জন্য লেখা বরেনের অনেক কমে গেল, যদিও ছোটদের লেখা একেবারে বরেন বন্ধ করেনি। কিন্তু যেটি বন্ধ করল সেটি অতীব দুঃখজনক। যে ছড়া লিখে বরেনের সাহিত্যযাত্রা শুরু সেই ছড়া লেখা বরেন একেবারে বন্ধ করে দিল। আমি খুব চাপাচাপি করলে বলত, 'বিশ্বাস কর, কিছুতেই আমি সে মেজাজ আর আনতে পারছি না।' কি আর বলব আমি! ভিতর থেকে না এলে কারোর পক্ষে কি কিছু লেখা সম্ভব?

বাংলা ছোটগল্পে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদানকে অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই। বরেনের ছোটগল্প দেশে-বিদেশে অনূদিত হয়েছে। রাশিয়ার শুধু রুশ ভাষা নয়, অন্যান্য ভাষাতেও বরেনের বেশ কিছু গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। চেক ভাষাতেও বরেনের একাধিক গল্প অনূদিত হয়েছে। আমার মনে আছে, ১৯৭১ সালে আমি যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন গিয়েছিলাম তখন একজন রুশ সমালোচক বরেনের গল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। বরেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শুনে তিনি তার সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জানতে চেয়েছিলেন। তখন অবশ্য 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় বরেনের 'নিশীথ ফেরি' উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে। দেখলাম সেই সংবাদও ভদ্রলোকের জানা, কিন্তু উপন্যাসটি হাতে পাননি। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার ননী ভৌমিক তখন মস্কোর বাসিন্দা। ননীবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বরেন সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাইছিলেন। দেশে থাকবার সময় ননীবাবুর অন্যতম প্রিয়পাত্র ছিল বরেন।

সুন্দরবন বরেনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার গল্পে, উপন্যাসে বারবার ঘুরে এসেছে সুন্দরবন—তার মাটি, মানুষ, অরণ্য, জীবজন্তু, প্রকৃতি আর তার লৌকিক ইতিহাস। বরেনের বিখ্যাত উপন্যাস 'বনবিবির উপাখ্যান'। বরেনের খুব ইচ্ছে ছিল উপন্যাসটির সে দ্বিতীয় খণ্ড লিখবে, কিন্তু লিখে উঠতে পারেনি। বনবিবির পাণ্ডুলিপি বরেন আমার বাড়িতে কয়েকজন বন্ধুকে শুনিয়েছিল। আমরা সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। বরেনের উপন্যাসের সংখ্যাও খুব কম নয়। তার আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'বাগদা'। চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে। প্রথমে নাম দিয়েছিল চিংড়ি। সেই নামে অন্য ভাষায় বিখ্যাত উপন্যাস আছে জেনে নাম পরিবর্তন করে দেয়।

বরেনের মতো বন্ধু পাওয়া জীবনে বড় কঠিন। বরেনের সঙ্গে আমার সম্পর্কের চিড় কখনও ধরেনি। কোনো মুহূর্তের জন্য বরেন আমাকে ত্যাগ করেনি। আমিও করিনি। বন্ধুত্ব কত সৎ এবং আন্তরিক হতে পারে তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সংঘর্ষের সময়। আগেই বলেছি, আমার ছাপাখানার আড্ডা ক্রমশ ভাঙতে শুরু করেছে। অনেকেই আর আসেন না। হয়তো ভয়ে। আমার মতো যারা কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী তাদের সবাই তখন পরিত্যাগ করছে। দিনের পর দিন পত্রপত্রিকায় কমিউনিস্ট বিরোধী লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। এমনকি একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় এক মহিলা কবি লিখে বসলেন, কমিউনিস্টদের আমেরিকার মতো লিঞ্চিং করা উচিত। সেই পত্রিকাতেই 'শিল্পীর স্বাধীনতা' নামে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকল কমিউনিস্ট বিরোধী লেখা। তখনকার সব খ্যাতনামা লেখকই এই বিভাগে লিখেছিলেন—ব্যতিক্রম সমরেশ বসু আর বরেন।

একদিন বরেন এসে আমাকে বলল, তোর এখানে আসতে বিমলদা নিষেধ করছিলেন। এমনকি বলছিলেন, তোর এখানে না এলে বুঝি আমার ভাত হজম হয় না।

জিজ্ঞেস করলাম, তুই কি-বললি?

বরেন বলল, আমি বিমলদাকে বলে দিলাম, আপনি আমাকে যা খুশি বলতে পারেন কিন্তু প্রসূনের সঙ্গে আমি সম্পর্ক ত্যাগ করব না। যদি আপত্তি করেন আমি আপনার কাছে আসব না। কিন্তু প্রসূনের কাছে আমি যাবই। ও এখন অনেকটা একা হয়ে পড়েছে। আমার আরও বেশি করে যাওয়া দরকার।

জিজ্ঞেস করলাম, বিমলদা কি জবাব দিলেন?

বরেন বলল, কি আর জবাব দেবেন, চুপ করে থাকলেন। সেখান থেকেই তো চলে এলাম তোর কাছে।

এই ছিল বরেন। এই ছিল তার সততা। বিমলদার ভাবাদর্শ আমি জানতাম। বরেনের সঙ্গে বিমলদার পরিচয়ের আগেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। বিমলদা ছিলেন র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট—মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভক্ত। তাঁর কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাব হওয়া স্বাভাবিক। যদিও একটিমাত্র ঘটনা ছাড়া বিমলদা আমাকে কমিউনিস্ট বলে কখনও ঠাট্টা করেননি, দূরে সরিয়ে দেননি।

সামান্য কয়েকজন লেখকের সঙ্গে আমার তুই সম্পর্ক ছিল। তারা হল—পূর্ণেন্দু পত্রী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাস ও বরেন। ধনঞ্জয় ছাড়া আমরা সকলেই ছিলাম প্রায় সমবয়সী। ধনঞ্জয় ছিল আমাদের চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়। সিটি কলেজে আমি যখন প্রথম বর্ষে তখন ধনঞ্জয় তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

সুন্দরবন ছাড়বার পর বরেন টালিগঞ্জে সাহাপুর বিদ্যাপীঠে চাকরি নিয়ে কলকাতা ফিরে আসে। কিছুদিনের মধ্যেই শ্যামলকে ওই বিদ্যাপীঠে চাকরি দিয়ে বরেন নিয়ে আসে। শ্যামল সাহাপুর বিদ্যাপীঠে অনেকদিন মাস্টারি করে।

শ্যামল ছিল এক অসাধারণ চরিত্র। বরেনই শ্যামলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। আমি এবং শ্যামল খুলনা জেলার ছেলে, ধনঞ্জয়ও। শ্যামলের মতো এমন প্রাণবন্ত, রসিক, বন্ধুবৎসল মানুষ খুব কম দেখেছি। শ্যামলের মাঝে মধ্যবিত্তসুলভ তথাকথিত ভদ্রতা ছিল না। ছিল না কোনোরকম জড়তা।

শ্যামল খুব উঁচু দরের লেখক ছিল। যদিও প্রথমদিকে মর্যাদা সে পায়নি। পেয়েছিল একেবারে শেষ জীবনে। যখন সে মর্যাদা পেতে শুরু করল, তখনই আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

শ্যামলের একবার মাথায় একটা ভূত চেপে বসল। সে কৃষিজীবনে মন দেবে। দিলও। কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে দক্ষিণের চম্পাহাটি গ্রামে নিজস্ব খামার গড়ে তুলল। আমাদের বন্ধু-বান্ধব অনেককেই সে ওখানে সস্তায় জমি কিনিয়েছিল। আমাকে রাজি করাতে পারেনি। চম্পাহাটি গ্রামটি সেই সময় সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে। উঠে আসে শ্যামলের জন্য।

সাহাপুর বিদ্যাপীঠ ছেড়ে শ্যামল সাংবাদিক হিসাবে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেয়। সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ দিল্লি থেকে ফিরে তখন আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হয়েছেন। সন্তোষদাও ছিলেন আমার খুব ঘনিষ্ঠ। সন্তোষদার ভবানীপুরের বাড়িতে কতদিন গিয়েছি। সন্তোষদা ছিলেন সুভাষদার ছেলেবেলার বন্ধু। সুভাষদার বাড়িতেও একসঙ্গে অনেকদিন আমরা আড্ডা দিয়েছি। সন্তোষদাও ছিলেন শ্যামলের মতো অস্থির প্রকৃতির মানুষ। সে অস্থিরতা অবশ্য সৃষ্টির অস্থিরতা। সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার এক অসাধারণ মিলন ঘটালেন সন্তোষদা। আজ যে আনন্দবাজারকে আমরা দেখছি তার স্রষ্টা বোধহয় সন্তোষদা। সন্তোষদা তখন তরুণ লেখকদের আনন্দবাজারে টেনে আনেন। একে একে যোগ দেয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পূর্ণেন্দু পত্রী ও আরও কয়েকজন।

আনন্দবাজারে শ্যামল বেশ ভালই কাজ করছিল। কিন্তু তার এই অস্থিরতায় সন্তোষদার সঙ্গে গোলমাল পাকিয়ে সে আনন্দবাজার ছেড়ে দেয়। যোগ দেয় 'যুগান্তর' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে শ্যামল যুগান্তর গোষ্ঠীর 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক হয়। ১৯৭৮ সালে আমি যখন 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার' প্রকাশ করে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছি তখন শ্যামল 'অমৃত' পত্রিকায় সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে একটি প্রচ্ছদকাহিনি প্রকাশ করে। আমার একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারও প্রকাশ করেছিল। প্রচ্ছদকাহিনির নাম দিয়েছিল 'সংস্কৃতের দুয়ার খুলে গেল।' অসাধারণ সেই লেখাটি আজ আমি আর খুঁজে পাই না। শ্যামল আমাকে অতি উচ্চাসনে বসিয়েছিল, যে উচ্চাসন আমার প্রাপ্য ছিল না।

বরেন কিছুকাল পরে অবশ্য সাংবাদিক হিসাবে 'যুগান্তর' পত্রিকায় যোগ দেয়। যুগান্তরে তখন বার্তা সম্পাদক হয়ে আসেন আনন্দবাজারের অমিতাভ চৌধুরী। অমিতদাও সন্তোষদার মতন তরুণ লেখকদের যুগান্তরে টানার চেষ্টা করেন। যোগ দেয় বরেন ও প্রফুল্ল রায়। শিল্পী হিসাবে আসে আমাদের বন্ধু সুবোধ দাশগুপ্ত। যুগান্তরে যোগ দিয়ে বরেনের কাল হল। শেষ জীবনে তাকে যে অর্থকষ্টে কাটাতে হয়েছে তার জন্য 'যুগান্তর' পত্রিকাই দায়ী। বরেন যদি সাহাপুর বিদ্যাপীঠ না ছাড়ত তাহলে তাকে শেষজীবনে অত অর্থকষ্টে কাটাতে হত না। বিশাল অঙ্কের পেনশন নিয়ে তার জীবন কাটত। 'যুগান্তর' দিনে দিনে ছন্নছাড়া হয়ে উঠেই গেল। বরেন তার প্রাপ্যের বেশির ভাগটাই পেল না। বরেনের এ-পরিণতির জন্য আমার নিজেকেও অনেকটা দায়ী মনে হয়। বরেন আমার অভিমত না নিয়ে 'যুগান্তর' পত্রিকায় যোগ দেয়নি। আমি আশা করেছিলাম যুগান্তরে যোগ দিলে বরেনের সাহিত্যিক জীবন আরও বিকশিত হবে। কিন্তু না, তা হল না। বিকশিত যা হয়েছে তা বরেনের চেষ্টায়। যুগান্তরের কোনও ভূমিকাই সেখানে নেই।

অমিতদার সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আমার অনেকবার কথা হয়েছে। অমিতদা বরেনকে খুব স্নেহ করতেন। বরেনের এ আর্থিক অসুবিধার জন্য অমিতদাও অনুতপ্ত।

বরেন নিজের বা পরিবারের কথা বলত খুব কম। তার কতিপয় বন্ধু ছাড়া তার সম্পর্কে বিশদভাবে খুব কম লোকেই জানে। পারিবারিক জীবনে সে সুখী হতে পারেনি। নিজের সংসার পাতা তার পক্ষে সম্ভব হল না, অথচ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে সংসার টেনে গেল। ভাই, ভাইপো, ভাইঝি সকলকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিল বরেন। এই নিয়ে কতবার তার কাছে অভিযোগ করেছি! সে কোনও জবাব না দিয়ে মিষ্টি হাসিতে সব অভিযোগ খণ্ডন করে দিতে চেয়েছে।

হরিপদ দত্ত লেনে তার বাড়িতে কতবার গিয়েছি! দোতলার একটি ঘরে থাকত বরেন। একচিলতে সেই ঘরটিই ছিল বোধহয় তার পৃথিবী।

আমি আর বরেন একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে আমরা কেউ সংসার করব না। বরেন তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে, আমি করিনি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বরেন আমার কাছে কখনও কোনও কথা তোলেনি। বরঞ্চ সে আমার পরিবারে হয়ে উঠেছে আপনজন। আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ের কাছে সে ছিল খুব প্রিয়। শরৎ ব্যানার্জী রোডে আমি বাস করতাম তিন তলায়। কিন্তু নীচে আমার একটি পৃথক ঘর ছিল। সেই ঘরে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় বিশেষভাবে আমরা তিনজন বন্ধু মিলে জমিয়ে আড্ডা দিতাম। মূল বিষয় অবশ্য সাহিত্য। আমরা দু'জন ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি হলেন লেখক অভ্র রায়। 'অভ্র' ছদ্মনাম। মূল নাম বিভূতি। তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। আমরা তখন অনেক সাবালক হয়েছি। চা-কফি ছেড়ে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়েছি। এই নিয়ে বরেন আর বিভূতিকে আমার স্ত্রীর কম মুখ-ঝামটা শুনতে হয়নি। অবশ্য আমরা ছিলাম খুব পরিমিতবোধের মানুষ। সীমার বাইরে যেতে কেউই অভ্যস্ত ছিলাম না।

একসময় আমাদের আড্ডাস্থল হয়ে উঠেছিল বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব। আমি প্রথমে তারপর বরেন ও বিভূতিকে সদস্য করি। এ. এ. ই. আই. ক্লাবে তখন লেখক-শিল্পীদের জমাটি আড্ডা। উদ্দেশ্য মদ্যপান—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পরিবেশটা কফি হাউসের মতো। খাবারও কফি হাউসের মতো সস্তা এবং ভাল। সেখানে তখন নিয়মিত আড্ডা দিতেন সাগরময় ঘোষ, সমরেশ বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুবিনয় রায় ও আরও অনেকে। দিনে দিনে অবশ্য লেখক-শিল্পীদের পরিধি বাড়ছিল। পশ্চিমবঙ্গের লেখক-শিল্পীদের বেশিরভাগই তখন মাঝে মাঝে এই ক্লাবে আসতেন। শনিবার হলে তো কথাই নেই। রাত বারোটা পর্যন্ত চলত জমাটি আড্ডা। পৃথক পৃথক টেবিলে পৃথক পৃথক দল। শিল্প সাহিত্যের পরিধির বাইরেও কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। কেউ আইনজীবী,

কেউ চিকিৎসক, কেউ বা ব্যবসায়ী। পশ্চিমবাংলার শিল্প-সাহিত্য জগৎ তখন যেন উঠে এসেছিল এই ক্লাবে।

পৃথক পৃথক টেবিলে চলত আমাদের আড্ডা। আমাদের টেবিলে আমি বরেন, বিভূতি তো থাকতামই, মাঝে মাঝে এসে বসত সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বরুণ চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন। আমি আর বরেন মাঝে মাঝে সাগরদার সাথেও বসতাম। সাগরদার সান্নিধ্য লাভ একটা পরম প্রাপ্তি। বয়সে আমাদের চেয়ে কত বড়, 'দেশ' পত্রিকার ডাকসাইটে সম্পাদক—তবু ব্যবহার কী মধুর। সাগরদার মুখ থেকে সাহিত্যিকদের কত টুকিটাকি গল্প শুনতাম। সাগরদার সান্নিধ্য যারা লাভ করেনি তাদের জীবন বৃথা। লক্ষ করতাম সাগরদা কিছু বিষয়ে বরেনকে এড়িয়ে থাকতে চাইতেন। কারণটা অবশ্য আমি জানতাম। বরেন শান্ত স্বভাবের হলে কি হবে! সত্যি কথাকে সে সোজাসাপ্টাভাবে মুখের ওপর বলে দিত। এমন দু-একটা অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়দের ছিল পৃথক টেবিল। সেখানেও অনেকে উপস্থিত। সুনীলের ব্যবহারও তো অসম্ভব মিষ্টি। পেটে কিছুটা পড়বার পর মাঝে মাঝে সুনীল গলা ছেড়ে গান জুড়ে দিত। ক্লাবের অন্য সদস্যেরা তার জন্য একটু বিরক্ত হত না, পরিবেশকে খুবই উপভোগ করত।

সমরেশদা প্রায় নিয়মিতই আসতেন। সমরেশদার সঙ্গে আমার একটা পৃথক ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। সমরেশদা তাঁর টেবিলে মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে নিতেন। দুজন মিলে কত রকমের গল্পই না করতাম। সে সব কথা অন্যত্র বলব।

সুবিনয় রায় এ হল্লা থেকে একটু দূরে পৃথকভাবে বসতেন। তাঁর সঙ্গী থাকত অন্য ধরনের মানুষ। শিল্প সাহিত্য-জগতের নয়। শক্তিও নিয়মিত এই ক্লাবে আসত। কিন্তু একবার সে এমন হল্লা বাধিয়ে দিল যে ক্লাব তাকে বহিষ্কার করল। সুনীলের চেষ্টায় সে সদস্যপদ আবার লাভ করে এবং ক্লাবে ফিরে আসে। তারপরে শক্তি আর হল্লা করেনি। শক্তি তখন পার্ক সার্কাসে তারক দত্ত রোডে থাকত। বেশ কয়েকদিন রাতে আমি তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছি। শক্তি যখন স্বাভাবিক জীবনে থাকত তখন অসম্ভব বিনয়ী ও ভদ্র। কিন্তু পেটে কিছুটা পড়বার পর তার অন্য রূপ। তখন তার মাঝে একটা বেপরোয়া ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। পৃথিবীটাকে সে তার পায়ের বুড়ো আঙুলের নীচে চেপে ধরেছে এমন একটি ভাবনায় সে বুঁদ হয়ে যেত। যাকে তাকে যা খুশি বলতে তখন তার মুখে একদম আটকাত না। শক্তির এই স্বভাবের কথা অনেকেই বলেছেন। আমি নতুন করে আর কি বলব!

এ. এ. ই. আই. ক্লাবের দিনগুলো আমাদের খুব ভালই কাটছিল। বরেন আর আমি একসঙ্গে রোজই বাড়ি ফিরতাম। লেকের এপারে আমি থাকি আর ওপারে থাকে বরেন, অবশ্য একটু দূরে। আমার সঙ্গে এসে একটি রিকশা চেপে সে বাড়ি ফিরত। প্রতিরাতের অতিথি হিসেবে রিকশাওলাও তাকে চিনে গিয়েছিল।

এই আড্ডা অবশ্য খুব বেশিদিন টিকল না। ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে শুরু করল। জানি না, বোধহয় একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল। আমি যাওয়া বন্ধ করলাম। বরেনরা তবু মাঝে মাঝে গেলেও আমি একদম যেতাম না। সাগরদা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সকলেই আসা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু বাঙালির আড্ডা ছাড়া তো চলে না। নতুন আড্ডা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। যদিও অতীতের আড্ডার রূপ পাল্টে গেছে। এটাই বোধহয় নিয়ম। নতুন আড্ডা গড়বার জন্য আমি আবার উদ্যোগী হয়ে উঠলাম। আমি নিজে আড্ডা ছাড়া বাঁচতে পারি না। এই আড্ডাই হয়েছে আমার জীবনের কাল। আড্ডার কবলে পড়ে আমি জীবনে কিছুই করে উঠতে পারিনি। শেষ বয়সে এসে আজ আর আপশোশ করে লাভ নেই।

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডা. বদিন মজুমদার এই সময় বিলেত থেকে স্থায়ীভাবে ফিরে এসেছে। লেকের ঠিক পশ্চিমপারে নতুন ফ্ল্যাট কিনে সংসার পেতেছে। সেখানে আমার নিয়মিত যাতায়াত। স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসার। ১৯৬৩ সালে বদিন ও তার স্ত্রী কৃষ্ণা যখন প্রথমবারের জন্য বিলেত থেকে ফিরে আসে তখনই বদিনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। তার কিছুদিন আগেই তাদের বিয়ে হয়েছে। কৃষ্ণার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আরও আগে ১৯৫২ সাল থেকে। আমি আর কৃষ্ণা একসঙ্গে 'আগামী' করেছি। ১৯৫৭ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য কৃষ্ণা বিলেত পাড়ি দেয়। একই জাহাজে বদিনও বিলেত গিয়েছিল উচ্চশিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। বদিন হল দাঁতের ডাক্তার, আর কৃষ্ণা সমাজবিজ্ঞানী। ১৯৬৩-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তারা কলকাতায় ছিল, বদিন ডাক্তারি করবার চেষ্টা করেছিল। কৃষ্ণাও কিছু গবেষণার কাজ করেছিল। কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে ১৯৬৯ সালের শেষভাগে আবার বিলেত ফিরে যায়। শরৎ ব্যানার্জী রোডের যে ফ্ল্যাটে ওরা ছিল, সেটি আমি সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম। ওরা বিলেত ফিরে যাওয়ার পর আমি ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হই। সত্যি কথা বলতে কি ওরা ফিরে যাওয়ার আগে আমাকে বিয়ে দিয়ে সংসারি করে যায়।

বদিন-কৃষ্ণা প্রথমবার ফিরে আসবার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা পুনরায় 'আগামী' প্রকাশ করি। বোধহয় ১৯৬৫ সালে। এবার আমি একক সম্পাদক না থেকে, কৃষ্ণা আর আমি যুগ্ম সম্পাদক হই। পত্রিকার কার্যালয়ও হয় ওদের ওই ছোট ফ্ল্যাটে। বরেনও পুরনো দিনের মতো 'আগামী'র সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায়। তখন তার যথেষ্ট নামডাক। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও জড়িয়ে পড়েন 'আগামী'র সঙ্গে। সুভাষদার ছিল 'আগামী'র সম্পর্কে গভীর দুর্বলতা। মৃত্যুর কিছুদিন আগে পি. জি. হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে তিনি আমার হাত ধরে বলেছিলেন, 'তুমি আবার 'আগামী' প্রকাশ করো এটা আমার একান্ত ইচ্ছে'। তখন অবশ্য বরেন আর এই পৃথিবীতে নেই।

যাক, যা বলছিলাম, 'আগামী' পুনরায় জমে ওঠে। বরেনের সঙ্গে বদিনেরও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কৃষ্ণার সঙ্গে সম্পর্ক তো পুরনো 'আগামী' থেকেই ছিল। সেই সময় বরেন নিয়মিত শরৎ ব্যানার্জী রোডে আসত। নতুন পর্যায়ের 'আগামী'তেও বরেন নিয়মিত

লিখেছে। গল্প ছাড়াও উপন্যাসও লিখেছে। কিন্তু ছড়া আর লেখেনি বা লিখতে পারেনি। পঞ্চাশের দশকে সেই যে তার ছড়া লেখা বন্ধ হয়ে গেল, সেই দরজা আর কখনই খুলল না। গদ্য সাহিত্যে সে একেবারে ডুবে গেল। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'আগামী' খুব বেশিদিন চলেনি। ১৯৬৯ সালের শেষ ভাগে বদিন-কৃষ্ণা বিলেত ফিরে যাওয়ায় আমি বেশিদিন পত্রিকা চালাতে পারিনি। অনিয়মিতভাবে বছর দুয়েক চলেছিল। আমি সবসময় অবশ্য বরেনকে সঙ্গে পেয়েছিলাম।

তাই আশির দশকে বদিন-কৃষ্ণা যখন স্থায়ীভাবে কলকাতায় ফিরে এল, তখন যথারীতি আমার নতুন আড্ডাস্থল হল তাদের আস্তানা। বদিনের সঙ্গে কথা বলে সেখানেই আমরা নতুন আড্ডাস্থল গড়ে তুললাম। প্রথমদিকে আমরা জড়ো হলাম পাঁচজন। বদিন ছাড়া বাকি চারজন হল বরেন, এম. সি. সরকারের সুপ্রিয় সরকার, অভ্র রায় আর আমি। সুপ্রিয়দা ছিলেন খুব জমাটি আড্ডাবাজ। তাঁদের দোকানে তো এককালে জমাটি আড্ডা ছিল—মৌচাকের আড্ডা। সুপ্রিয়দার বাবা, মৌচাকের সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার ছিলেন সেই আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু। মৌচাকের সেই আড্ডায় নিয়মিত যোগ দিতেন রাজশেখর বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। সুপ্রিয়দা এঁদের সকলকে কাছ থেকে দেখেছেন, সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছেন। সুপ্রিয়দার আচার-ব্যবহারে সব সময় লেগে থাকত একটা আড্ডার মেজাজ। ১৯৮৬ সালে সুপ্রিয়দাকে আমি লন্ডন শহরে বদিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সেবার আমরা একসঙ্গে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় গিয়েছিলাম। আমি আর সুপ্রিয়দা একসঙ্গেই গিয়েছিলাম আর একসঙ্গেই ফিরেছিলাম। জার্মানিতে আমার ছোট ভাইয়ের বাড়িতে কিছুদিন থেকে আমরা প্যারিস হয়ে একসঙ্গে লন্ডন পৌঁছেছিলাম। সুপ্রিয়দা কয়েকদিন অন্যের বাড়িতে থাকবার পর আমি বদিনকে বলে তাঁকে ওর বাড়িতে নিয়ে আসি। বদিনের বেশ বড় দোতলা বাড়ি, নিজস্ব। নীচে চেম্বার ওপরে থাকবার জায়গা। আমি তো প্রথম থেকেই বদিনের বাড়িতে ছিলাম। শেষের কদিন সুপ্রিয়দাও আমার সঙ্গে থাকলেন। সেই সময় বদিনের সঙ্গে তাঁরও একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বদিনও স্বভাবে খুব আড্ডাবাজ। রাঁধতে এবং অপরকে খাওয়াতে খুব ভালবাসে।

কলকাতায় বদিনের ফ্ল্যাটের এই আড্ডা প্রথম থেকেই বেশ জমে উঠল। বদিনের নিত্যনতুন খাদ্য সহযোগে এই মদ্যপানের স্বাদই পৃথক। ধীরে ধীরে সদস্য সংখ্যাও বাড়তে লাগল। অভ্র'র দু-একজন বন্ধু এ-আড্ডায় নিয়মিত যোগ দিতে শুরু করল।

অবশ্য আমি হয়ে পড়লাম অনিয়মিত। প্রকাশনা জগতে সাংগঠনিক কাজে আমি খুব জড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু বদিনের আড্ডা চলতে লাগল। প্রতি বুধবারের সন্ধ্যায় বসত এই আড্ডা। এই আড্ডার মধ্যে দিয়ে বরেনের সঙ্গে বদিনের বন্ধুত্ব গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠল। বরেনের একাকিত্বকে বদিন পুরোমাত্রায় কাটিয়ে দিল। আড্ডার দিন ছাড়াও

বেশিরভাগ রবিবারের সন্ধ্যায় বরেন বদিনের কাছে আসত। তখন আমিও যেতাম। সে আড্ডা চলত তখন আমাদের তিনজনের। কৃষ্ণাও মাঝে মাঝে যোগ দিত। এই সময় বরেন আকস্মিকভাবে সেরিব্রালে আক্রান্ত হয়। বদিনই দেখাশোনার প্রধান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। গড়িয়াহাটে আমার নতুন আস্তানার কাছাকাছি একটি নার্সিংহোমে বরেন ভর্তি হল। বদিন আমাকে খবর দেয়। আমি ছুটে যাই ন্যার্সিংহোমে। ভাগ্য ভাল, বরেন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। অন্যদিক থেকে আবার দুর্ভাগ্যের বিষয় বরেনের মস্তিষ্কের কিছুটা ক্ষতি হয়। ডাক্তার জানিয়ে দেন সে ক্ষতি কোনওদিন পূরণ করা যাবে না। বরেন নিজে অবশ্য সে কথা জানত না। আমরা কতিপয় বন্ধুরা জানতাম। এর পরিণতি হল খুব খারাপ। বরেনের লেখা বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের চাপাচাপিতে সে চেষ্টাও করছিল। কিন্তু কিছুতেই মাথায় ধরে রাখতে পারছিল না। অসুখের পর বরেনের স্বভাবটাও কেমন পাল্টে গেল। সে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। তার সেই স্বাভাবিক উচ্ছলতা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। সে কথা বলত কম। শুধু ঠোঁটের কোণে লেগে থাকত তার মিষ্টি হাসিটা। অসুখ সে হাসিকে কেড়ে নিতে পারেনি।

সুস্থ হয়ে ওঠবার পর বরেন আবার বদিনের বাড়ির আড্ডায় নিয়মিত যোগ দেওয়া শুরু করল। তখন তার জীবনযাত্রা অনেক নিয়ন্ত্রিত, অনেক পরিমিত। বদিন সবসময় তাকে কাছে টেনে রাখত। বাইরে কোথাও গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বদিন বরেনকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। বরেন তখন আর বেশি দূরে কোথাও যেত না। বইপাড়ায় যাওয়াও বন্ধ করে দিল। বদিনের বাড়ি ছাড়া তার যাতায়াত আর কোথাও ছিল না।

এই সময় সাহিত্যের হর্তাকর্তা বিধাতাদের বোধহয় একটু টনক নড়ল। কোনও পুরস্কারের জন্য বরেনের নাম কখনো বিবেচিত হয়নি। ছোটখাটো দু-একটা পুরস্কার অবশ্য সে লাভ করেছিল। কিন্তু এর জন্য বরেনের কোনও ক্ষোভ ছিল না। বরঞ্চ আমি মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতাম, পুরস্কারের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্কিত অনেককে কথাও শোনাতাম। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। এই সময় বাংলা আকাদেমি প্রাঙ্গণে অন্যের সঙ্গে বরেনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। এটাই বোধহয় বরেনের একমাত্র সরকারি প্রাপ্তি। সম্বর্ধনার উত্তরে বরেন কিছুই বলল না। সম্বর্ধনা তার মনে কোনও প্রভাব বিস্তার করেছিল বলেও আমার মনে হয় না।

বদিনের বাড়ির আড্ডার অন্যতম প্রধান সদস্য সুপ্রিয় সরকার চিরতরে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। মনে আছে স্টুডেন্টস হলে সুপ্রিয়দার স্মরণসভায় বরেনকে কিছু বলবার জন্য জোর করে মঞ্চে তুলে দিলে সে মাইকের সামনে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নীচে নেমে এসেছিল। একটি শব্দও তার মুখ থেকে বের হয়নি। উপস্থিত সবাই সেদিন বুঝতে পেরেছিল মনের দিক থেকে বরেন একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

তারপর একদিন, শুধু মন নয় সবদিক থেকে সবকিছু শেষ হয়ে গেল। আকস্মিকভাবে বরেন আমাদের ছেড়ে চলে গেল। বদিনের বাড়ি আসবার জন্যই সে তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই হার্ট অ্যাটাক এবং জ্ঞান লোপ। হাসপাতালে বেশিক্ষণ আর সে

টেকেনি। সামান্য সময়ের মধ্যে তার জীবনের অবসান ঘটে। একদিক থেকে আমি তৃপ্ত যে মৃত্যুযন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়নি। বিছানায় পড়ে থাকলে তার জীবন কি ভয়াবহ হয়ে উঠত—ভাবলে আমি শিউরে উঠি!

বরেন চলে যাওয়াতে বদিন আমি দুজনেই খুব ফাঁকা হয়ে গিয়েছি। এখনও দুজন মিলে আমরা যখন গল্প করি আড্ডা দিই তখন ঘুরে ফিরে বরেন আসবেই। সেই মুহূর্তে অনুভব করি বরেন যেমন ছিল তেমনই আমাদের পাশে আছে। যতদিন এই পৃথিবীতে থাকব ততদিন বরেন আমার কাছে থাকবে। বরেনকে ছাড়া আমার জীবন আমি ভাবতেই পারি না।

বোধহয় বদিনেরও একই ভাবনা।

সৌরি ঘটক

জীবন যেরকম, মন যদি সেরকম মেনে নিত, তাহলে জীবন বোধহয় অন্যরকম হয়ে যেত। আর এই অন্যরকম হয় না বলেই আমাদের এত যন্ত্রণা, এত ব্যথা, এত বেদনা।

লেখালিখির জগত থেকে সরে গিয়েছি অনেক দিন আগে। কিন্তু ইদানীং মনে হচ্ছিল কিছু ভাবনার কথা বলি। তখন ভাবতেও পারিনি ভাবনা ছেড়ে আমাকে কেবল বিয়োগের কথা বলতে হবে।

সেই কতদিন আগে দীপেন অর্থাৎ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে গেল, তখন কতরাত ঘুমোতে পারিনি। দেখতে দেখতে কত বছর হয়ে গেল। মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। দীপেন আর আমি হাসি ঠাট্টা করতাম কে কার বিয়োগপঞ্জী লিখব। আমার বিয়োগপঞ্জী লেখার সুযোগ দীপেনের হল না, আমিও দীপেনের বিয়োগপঞ্জী লেখার মতো মনোবল পাইনি।

তারপর আমাকে ছেড়ে চলে গেল আমার এককালের খুবই কাছের মানুষ সুবীর রায়চৌধুরী। সুবীরের সঙ্গে পরবর্তীকালে যোগাযোগ না থাকলেও, দুজনে একসঙ্গে দেখা হলেই পুরানো-সেই আগুনে সেঁকা দিনগুলিতে ফিরে যেতাম। কতদিন দুজনে পাশাপাশি মিছিলে পথ হেঁটেছি!

তারপর চলে গেল শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শক্তি কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। শক্তিকে নিয়ে অনেকে অনেক কথা বললেও, আমি কখনোই কিছু বলিনি। অথচ এককালে শক্তি আর আমি খুব কম কাছাকাছি ছিলাম না। শক্তি, আমি আর দীপেন খুব কম আড্ডা দিইনি। শক্তি যখন স্বাভাবিক থাকত তখন আমার সঙ্গে দেখা হলে সুবীরের মতো সেই পুরানো দিনে ফিরে যেতাম। আমার যখন প্রথম সন্তান অর্থাৎ কন্যার জন্ম হল সেদিন মেডিকেল কলেজের গেট থেকে বেরোতেই শক্তির সঙ্গে দেখা। শক্তিকে কন্যার জন্মের খবর দিলাম। শক্তি আমাকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বলেছিল, এবার তোর কপাল ফিরবে। আমারও প্রথম সন্তান কন্যার জন্মের আগে আমার অবস্থা তো জানিস! কিন্তু কন্যা জন্মাবার পর হাতে হাতে ফল পেয়েছি। সন্তোষদা আমাকে ডেকে আনন্দবাজারে চাকরি দিয়েছেন। এই শুভ সংবাদে কন্যা সন্তানের জন্মের চেয়ে খুব কম আনন্দ পাইনি। শক্তি চিরকালের মতো চলে যেতে সেই রাজকীয় শোক-মিছিলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়েছিলেন। কেউ আমরা কোনো কথা বলিনি। চুপচাপ বসে ফিরে গিয়েছিলাম সেই সব ছেড়ে আসা দিনগুলিতে।

আর তারপর কোনো কিছু না বুঝিয়েই চলে গেল পূর্ণেন্দু, পূর্ণেন্দু পত্রী। পূর্ণেন্দুর সঙ্গেও কতদিন কতদুঃখে কত যন্ত্রণায় কেটেছে সেকথা এখনও চোখের সামনে ভাসে।

এদের সকলের কথা আজ আমার দারুণভাবে মনে পড়ছে। সকলেই এরা আমার

চেয়ে নামী-দামী। লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো আমিও আজ একজন অতি সাধারণ মানুষ। তবুও বেঁচে থাকতে কেন এরা কেউ আমাকে ভোলেনি, কেন দেখা হলেই বুকের মাঝে টেনে নিয়েছে? আজ তারা চিরকালের জন্যে চলে গেলে কেন আমি অসহায়তার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি? ছেলেবেলা থেকে জেনে আসছি, সময় নাকি সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। কই, সময় আমাকে তো ভোলাতে পারল না! ভুলে যে যেতাম না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু একটার পরে একটা ধাক্কা না এলে, হয়তো সাময়িকভাবে একটু প্রলেপ পড়লেও পড়তে পারত।

ঠিক সেই ধাক্কাই আবার পেলাম। আমার আর এক অতি কাছের মানুষ সৌরি ঘটক আমাদের ছেড়ে চলে গেল। সৌরির মৃত্যুসংবাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হয়নি। বেশিরভাগ সংবাদ-মাধ্যম তার চলে যাওয়ার কোনো গুরুত্বই দেয়নি। এমনই আমার দুর্ভাগ্য, আমিও চলে যাওয়ার সংবাদ জানতে পারিনি।

সৌরির সঙ্গে আমার যখন ঘনিষ্ঠতা তখন একমাত্র দীপেন ছাড়া উল্লিখিত বাকি তিনজন অন্যদিকে ছিটকে গেছে। চারজন আমরা ছিলাম প্রায় সমবয়সী আর সৌরি ছিল আমাদের চেয়ে কিছুটা বড়। সৌরি যখন গ্রামে গ্রামে কৃষক আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে, তখন আমরা কখনো কফিহাউস, কখনো 'পরিচয়' পত্রিকার অফিস আর কখনো পটুয়াটোলার তখনকার সাড়াজাগানো 'আগামী' পত্রিকার অফিসে বসে নতুন জীবনের আর নতুন সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছি। সৌরির নাম সেইভাবে আমাদের কারোরই জানার কথা নয়। তার 'কমরেড' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর আমি প্রথম সৌরির নাম জানতে পারলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে, একদিন আমি কফিহাউসে ঢুকে দেখি সমরেশদা অর্থাৎ সমরেশ বসু একা একা বসে কফি খাচ্ছেন। সমরেশদাকে দেখে আমি চেয়ার টেনে বসতেই সমরেশদা বললেন, সৌরি ঘটকের 'কমরেড' পড়েছ? প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেই আমার জন্যে কফি আর পকোড়ার অর্ডার দিলেন। তখনো আমি 'কমরেড' পড়িনি। নাম শুনেছি। বললাম, না এখনো পড়িনি।

সমরেশদা বললেন, পড়ে দেখো, ভাবিয়ে তুলেছে। সমরেশদা তখন আর কমিউনিস্ট পার্টিতে নেই। পার্টি ভাগ হয়ে গেছে। সৌরি ঘটক সি. পি. এমে যোগ দিয়েছে। এবং 'নন্দন' পত্রিকার প্রধান লেখক। আমি সৌরির ঠিক বিপরীতে। সমরেশদার মতো পার্টি না ছাড়লেও সি. পি. আই-তে থেকে গিয়েছি।

সৌরি পরবর্তীকালে সি. পি. এম থেকে সি. পি. আই-এ যোগ দেয়। তার মূল বাড়ি এবং আন্দোলনস্থল বর্ধমান ছেড়ে কলকাতার বাসিন্দা হয়। সৌরি যখন সি. পি. এম. ছাড়ে তখনও সে সি. পি. এমের বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। আমার সঙ্গে সৌরি ঘটকের যখন পরিচয় হয়, তখন সে সি. পি. আই-য়ের দৈনিক পত্রিকা 'কালান্তর'-এর কর্মী। আমি তখন কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের সাংস্কৃতিক

বিভাগের সম্পাদক। স্বাভাবিকভাবেই সৌরির সঙ্গে আমার যোগাযোগ নিয়মিত হতে থাকে এবং খুবই অল্পদিনের মধ্যে আমরা দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হই। সৌরি আর আমি এত কাছাকাছি চলে আসি যে প্রায় প্রতিদিন দুজনের একবার দেখা না হলে কারোরই ভাল লাগত না। আমি আমার প্রথম যৌবন থেকেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের খুবই ঘনিষ্ঠ। আমার সঙ্গে সৌরিও নিয়মিত সুভাষদার বাড়ি যাতায়াত করতে করতে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আমার মতো সৌরিকেও সুভাষদা অসম্ভব স্নেহ করতেন।

সৌরি ছিল অকৃতদার। আমার সংসারে তার স্থান ছিল নিজের পরিবারের মতো। কোনোরকম ভাল রান্না হলে সৌরিকে ডেকে না খাওয়ালে আমার স্ত্রী তৃপ্তি পেতেন না।

সৌরি তখন নিয়মিতভাবে লিখছে। তার বেশিরভাগ লেখা প্রকাশিত হত 'কালান্তর' পত্রিকায়। তার একটি উপন্যাস প্রকাশিত হওয়া মাত্রই প্রথম কপি হাতে পেয়েই সে আমার বাড়ি ছুটে এসেছিল। বইটি আমার স্ত্রীর হাতে তুলে না দিয়ে শান্তি পায়নি।

প্রগতি লেখক সংঘকে পুনরায় যখন উজ্জীবিত করে তোলার ব্যবস্থা হল, সৌরিকে তখন আমরা অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেছিলাম। সৌরি আর আমি একবার অক্লান্ত পরিশ্রম করে কলকাতার বেকার হলে 'সারাভারত লেখক সেমিনার' অনুষ্ঠিত করেছিলাম। ড. নীহাররঞ্জন রায় সেই সেমিনার উদ্বোধন করে যে অসাধারণ ভাষণ দিয়েছিলেন, তা আজও যে কোনো চিন্তাশীল মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে।

সৌরির সঙ্গে আমার কখনো কোনো বিষয়ে বিরোধ হয়নি। মতপার্থক্য হলে অতি সহজেই মিটিয়ে নিতাম। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হওয়ার জন্য তার অর্থাভাব সব সময় লেগেই থাকত। কিন্তু তার জন্যে কখনো তাকে কোনোরকম বিষণ্ণতায় ভুগতে দেখিনি। সৌরিকে আমার একজন সাচ্চা মানুষ বলে মনে হত।

ধীরে ধীরে আমি যখন প্রকাশনা ব্যবসায় ভালভাবে জড়িয়ে পড়তে লাগলাম, সৌরির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ক্রমশ কমে গেল। পার্টিও ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ হতে লাগল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারতেই প্রগতি লেখক আন্দোলন ঝিমিয়ে যেতে লাগল। চোখের সামনে সমাজতান্ত্রিক শিবির ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আর যে স্বপ্নে আমরা সবাই ছেলেবেলা থেকে বুক বেঁধেছিলাম সেই স্বপ্নগুলি দেয়ালে মাথা কুটেকুটে পাথরে পরিণত হল।

ইতিমধ্যে 'কালান্তর' সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। সেখান থেকে পার্টিকর্মী হিসেবে যে সামান্য রোজগার তার ছিল, তা পাবার আর কোনো সুযোগ থাকল না। নতুনভাবে 'কালান্তর' আবার প্রকাশিত হলে সৌরিকে আর নেওয়া হল না। কেন, তা আমি জানি না। পার্টির কোনো দায়িত্বে আমিও নেই, কিছুটা দূরে সরে এসেছি। সৌরির মতো একটা বলিষ্ঠ কলমকে কেন যে নেতৃত্ব অবহেলা করল, তার কোনো যুক্তি আমি খুঁজে পাইনি।

সৌরির সঙ্গে আমার দূরত্ব তখন অনেক বেড়ে গেছে। প্রকাশনা জগতে নানা সমস্যার সঙ্গে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছি। সৌরি আমার কাছে দু-চারবার এসেও দেখা পায়নি। তখন সে রিষড়ায় থাকে। তার এক আদরের ভাগ্নি বিদ্যা-ই তাকে দেখাশোনা করে। বিদ্যা না থাকলে সৌরির শেষ জীবনটা যে কী হত!

সৌরির সঙ্গে আকস্মিকভাবে একদিন অবশ্য আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। পুরানো দুই বন্ধু অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে গল্পগুজব করেছিলাম। সৌরি জানাল সে নতুন একটি উপন্যাস লিখছে। শরীর তখন তার খুবই খারাপ। জানাল, নানারকম সমস্যায় ভুগছে। সেই আমার সৌরির সঙ্গে শেষ দেখা। সৌরিকে কথা দিয়েছিলাম. তার উপন্যাসটি শেষ হলেই যেন আমাকে পাঠিয়ে দেয়। প্রকাশের কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু সেই উপন্যাস সৌরি শেষ করেছিল কিনা জানি না। আমিও কোনো যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি।

তারপর আকস্মিকভাবে খবর পেলাম সৌরি গুরুতর অসুস্থ। সে রিষড়ায় থাকে না। ভাগ্নির সঙ্গে কোন্নগর চলে গেছে। ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারিনি। তারপরেই খবর পেলাম তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এবং গুরুতর অসুস্থতায় দেহের গঠন এমন হয়েছে যে চোখে দেখা কঠিন। আমি ভয়ে হাসপাতালে যেতে পারিনি। ভেতরে ভেতরে নিজের মনের সঙ্গে লড়াই চলছিল। শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম দূর থেকে হলেও একবার দেখে আসব। তারপরের দিনই খবর পেলাম সৌরি আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেছে।

মৃত্যু সত্য একথা তো প্রতিনিয়তই জানি। আমাদের সকলকে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে তাও জানি। তবু নিজেকে বারবার কেমন যেন অসহায় মনে হচ্ছে। কিছুই ভাল লাগছে না।

আমার প্রিয়জনেরা যখন একে একে সবাই চলে যাচ্ছিল, তখন খুবই দুঃখ, খুবই যন্ত্রণা অনুভব করলেও এমনভাবে ভেঙে পড়িনি। কিন্তু আজ যাদের কথা বলছি তারা সকলেই প্রায় আমার সমবয়সী, দু-পাঁচ বছরের এদিক ওদিক। সত্যিই কি মৃত্যুভয় আমাকে পেয়ে বসছে! জানি না।

সৌরিকে প্রচার-মাধ্যম যেভাবে অবহেলা করল, তা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে বড় কঠিন। এই অবহেলার মাঝে একটি সংবাদে অবশ্য তৃপ্তি লাভ করেছি। রাজ্যের সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সৌরির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। হয়তো ব্যক্তিজীবনে তিনি লেখক বলে তাঁর এই উপলব্ধি। তৃপ্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম বুদ্ধদেববাবু এই উপলব্ধি যদি তার জীবদ্দশায় প্রকাশ করতে পারতেন, তাহলে সৌরি নিজে অন্তত একটু শান্তিলাভ করত। তাকে কি কোনো সম্মানে সম্মানিত করা যেত না? আমি মানছি, সৌরি ঘটক 'জনপ্রিয়' লেখক বলতে আজ যা বোঝানো

হয় তা ছিল না। কিন্তু জনপ্রিয়তা কি পুরস্কারের মাপকাঠি? জানি না। যে-জীবন সে দেখেছে, যে-জীবনের কথা জেনেছে, তাকেই সে সাহিত্যে রূপ দিয়েছে। প্রচারের যুগে প্রচার না পেলে একজন লেখকের দাঁড়ানো বড় কঠিন। সি. পি. এমে থাকতে সৌরি সংগঠিত পার্টির মাধ্যমে অনেক প্রচার পেয়েছিল। সৌরি যদি সেদিন সি. পি. এম ছেড়ে না আসত তাহলে আজ সে শুধুমাত্র প্রচার নয়, অনেক সম্মান, অনেক মর্যাদা এবং অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারত। যে নিঃশব্দে সৌরি আজ চলে গেল, সে নিঃশব্দে তাকে আজ চলে যেতে হত না। যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে, এই নিঃশব্দে চলে যাওয়াকে অনেক বেশি মর্যাদার বলে মনে করি। আমি জানি সৌরির মরদেহ নিয়ে বিশাল শোকমিছিল হত। সেই শোক মিছিলে আমার মন সায় দেয় না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তার মৃত্যুসংবাদটুকু ঠিকমতো প্রচারিত হবে না? বাংলা সাহিত্যে সৌরি ঘটকের কি কোনো অবদান নেই?

সৌরির বিয়োগের কথা বলতে বসে, কেন সকলের কথা বারবার মনে পড়ছে! শক্তিকে নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় সুনীল একটি কবিতা লিখেছেন দেখলাম। তাঁর কবিতাটি পড়ে আমার বারবার মনে হচ্ছে, শুধু শক্তি নয়, সবাই যেন আমাকে ডাকছে।

মন চায় সবাই ডাকুক। সকলের ডাক-ই যেন শুনতে পাই। যতক্ষণ, যতদিন এই পৃথিবীতে আছি। তারপর আর কী ভাবনা! আমিও সকলের দলে চলে গিয়ে, যারা থেকে গেল তাদের ডাকতে থাকব। সত্যিই আমরা ক'জন আর থেকে গেলাম!

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন দু'হাজার তিন-এ। আর তার ঠিক এক বছর পরে চলে গেলেন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতাদি যে আর বেশিদিন থাকবেন না সেকথা আমরা জানতাম। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন ভাবতে পারিনি। সুভাষদা পিজি হাসপাতালে থাকতেই গীতাদি সেখানে ভর্তি হয়েছিলেন। সুভাষদার সবসময় ভয় ছিল গীতাদি তাঁর আগে চলে না যান। এমনই ছিল ভালবাসার গভীরতা। গীতাদির রোগের কথা সুভাষদা জেনে যাননি। গীতাদি নিজেও জেনেছেন অনেক পরে। এমন রোগ যা পৃথিবীতে কেউ সারাতে পারে না। তবে আয়ু দীর্ঘায়ত করবার নানা রকম চিকিৎসা বেরিয়েছে। কিন্তু গীতাদির রোগ এমন সময় ধরা পড়ল, যে চিকিৎসায় জীবন দীর্ঘায়ত করা সম্ভব হল না।

গীতাদিকে কিছুদিনের জন্যে তাঁর ছোট বোন আবুদি মুম্বাই নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। আবুদি হলেন বিখ্যাত মার্কসবাদী দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্ত্রী। ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল অনেক বছর আগে। তখন আমি আবুদিকে দেখেছি। পরবর্তীকালে তিনি মুম্বাইতে আবার সংসার পাতেন। দেবীদা ছিলেন সুভাষদার অকৃত্রিম বন্ধু—প্রথম জীবন থেকেই। দেবীদার সঙ্গেও আমার খুব হৃদ্যতা ছিল। দেবীদার মতন এমন হিসেবি লেখক আমি খুব কম দেখেছি। দুরূহ বিষয়ের গ্রন্থ লিখেও যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করা সম্ভব, দেবীদা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দেবীদা পরবর্তীকালে আবার বিবাহ করেন এককালের বিখ্যাত ছাত্রনেত্রী অলকা মজুমদারকে। অলকাদির সঙ্গেও আমি ছাত্র আন্দোলন করেছি। অলকাদিও পরবর্তীকালে ভারততত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করে সুনাম অর্জন করেন। তিব্বতি ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। দেবীদা মারা যাবার পরেও অলকাদির কাছে আমি অনেকবার গিয়েছি। দেবীদা-অলকাদিও গীতাদিদের মতো দুই কন্যাকে দত্তক নিয়েছিলেন।

আবুদির সঙ্গে দেবীদার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও গীতাদির সঙ্গে কিন্তু সম্পর্ক ছিল। দেবীদার মৃত্যুর পর দেবীদা সম্পর্কে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় গীতাদির একটি লেখা খুব বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। সেখানে খোলামেলাভাবে দেবীদা সম্পর্কে গীতাদি অনেক কথা বলেছিলেন। এই লেখা সম্পর্কে অলকাদি আমার কাছে নানারকম অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। আমি গীতাদিকে সেসব কথা বলেছিলাম। গীতাদি বলেছিলেন, তিনি যা লিখেছেন তার একটি শব্দও অসত্য নয়। বরঞ্চ যতটা তাঁর লেখা উচিত ছিল সুভাষদার চাপাচাপিতে ততটা তিনি লিখতে পারেননি। আমি বিশ্বাস করতাম গীতাদি কখনো অসত্য কথা বলেন না।

গীতাদিকে আমি প্রথম দেখি পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়, তিনি বিদেশ থেকে ফিরে আসবার পর। পার্টি সবে তখন আইনি হয়েছে। সুভাষদা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। আমার উপরও গৃহবন্দির যে বিধিনিষেধ ছিল তার থেকে মুক্তি পেয়েছি।

গীতাদির কথা আমি আগেই শুনেছি। গীতাদি স্কটিশের ছাত্রী ছিলেন। সুভাষদা যখন সেই কলেজের ছাত্র—সেই একই সময়ে। তবে সুভাষদার চেয়ে গীতাদি ছিলেন দু'বছরের নীচে। সেই ছাত্রাবস্থাতেই নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন ধ্রুব মিত্রকে। এই বিয়ে অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ধ্রুব মিত্রের সঙ্গে পরবর্তীকালে বিবাহ হয় বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের। সুচিত্রাদির সঙ্গেও সেই বিয়ে টেকেনি। শিশুপুত্র নিয়ে সুচিত্রাদি উঠে আসেন ১৯ নম্বর ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোডে। এই বাড়িতেই আমার কেটেছে পঁচিশ বছরের জীবন। সুচিত্রাদির সেদিনের সংগ্রামী জীবন আমি দেখেছি।

গীতাদি একবার আমাকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমি যাকে ছেড়ে এলাম সুচিত্রা তাকেই ধরল! ওকে যে পস্তাতে হবে সেকথা আমি জানতাম।

সুচিত্রাদির একটি মূর্তি বানিয়েছিলেন রামকিঙ্কর। দাম্পত্য কলহের পরিণতিতে সেই মূর্তি আছড়ে পড়ে সামনের রাস্তায়—ধড়-মাথা পৃথক হয়ে যায়। আমি সুচিত্রাদির কাছে সেই খণ্ডিত মূর্তি দেখেছি।

ধ্রুব মিত্রকেও আমি চিনতাম। আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন তিনি চোখে পড়ার মতো সুপুরুষ। কিন্তু পরবর্তীকালে ভগ্নস্বাস্থ্যেও দেখেছি। সুচিত্রাদির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরও ধ্রুবদা আবার সংসার পেতেছিলেন। ছাড়াছাড়ি হলেও ধ্রুবদার সঙ্গে সুচিত্রাদির বন্ধুত্বের সম্পর্ক টিকে ছিল। গীতাদির সঙ্গেও ধ্রুবদার একটা অশত্রুতার সম্পর্ক আমি দেখেছি। ধ্রুবদা সুভাষদারও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কথাবার্তায় ধ্রুবদাকে আমার খারাপ মানুষ মনে হত না। তবু এই দু'জন কৃতী, গুণী ও সংবেদনশীল মহিলার সঙ্গে তাঁর যে কেন সম্পর্ক টিকলো না তা আমি বুঝতে পারতাম না।

গীতাদি সে-কথা অবশ্য আমাকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর জীবনের একেবারে শেষ দিনগুলিতে। গীতাদিকে একদিন যখন পিজি হাসপাতালে দেখতে গিয়েছি, তখন গীতাদি ছিলেন একা, অন্য কেউ তখন আসেনি। গীতাদি আর আমি দু'জনে মিলে একান্ত ব্যক্তিগত সব কথাবার্তা বলছি। গীতাদি ছিলেন আমার কাছে নিজের দিদির মতো। শুধু দিদি নয় খুবই প্রিয়তম দিদি। নানারকম কথা বলতে বলতে হঠাৎ ধ্রুবদা প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। গীতাদিই তুললেন। গীতাদি হঠাৎ আমাকে বললেন, জানো, ধ্রুব কিন্তু লোক খারাপ ছিল না।

আমি বললাম, তাইতো আমার মনে হয়। তবু আপনাদের দুজনের সঙ্গে সম্পর্ক টিকলো না কেন?

গীতাদি জবাব দিলেন, স্বামী হিসেবে ধ্রুবকে মেনে নেওয়া যায় না। সে ভাল বন্ধু

হতে পারে। কিন্তু ভাল স্বামী হওয়ার যোগ্যতা তার ছিল না। অযোগ্যতার জন্যে মানুষ হিসাবে ধ্রুবকে আমি দোষ দিই না।

আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি নি। গীতাদির সঙ্গে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মিশেছি। কিন্তু এমন কথা তাঁর মুখ থেকে কখনো শুনিনি। তাঁর মনের কোণে ধ্রুব মিত্রেরও যে একটা আসন ছিল, একথা আমি কখনো ভাবতে পারিনি। আমার মনে হল, জীবনের শেষ সময়ে গীতাদি তাঁর এই অনুভূতির কথা কেন আমাকে জানালেন! আর কাউকে গীতাদি এমন কথা বলেছেন কি না আমি জানি না।

ইউরোপ থেকে দেশে ফিরবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সুভাষদা আর গীতাদির বিয়ে হয়। গীতাদি তখন আছেন শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্টিটে। দেবীদাদের বাড়িতে। দেবীদার বড় ভাই কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল গীতাদির খুড়তুতো বোন রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কামাক্ষীপ্রসাদও খুব ভাল লেখক ছিলেন। এখন তিনি প্রায় বিস্মৃত। কিছুদিন হল তাঁর রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। তবে প্রকাশকের মুখে শুনেছি একদম নাকি বিক্রি হয় না। সব ভাল লেখকদের বোধহয় একই দুরবস্থা।

গীতাদিদের বিয়ের দিন উপস্থিত না থাকলেও পরের দিন আমি গিয়েছিলাম। মনে আছে, গীতাদি যত্ন করে আমাকে মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন। সুভাষদা আমাকে এড়িয়ে থাকছিলেন। ভাবটা এমন দেখাচ্ছিলেন যে বিয়ে করে তিনি খুব অন্যায় করে ফেলেছেন।

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই গীতাদি-সুভাষদা বজবজে ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামে আস্তানা গাড়লেন। উদ্দেশ্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। রাজনীতি আর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কাজে কেবলমাত্র তাঁরা ব্যস্ত থাকেননি, গ্রামের মেয়ে-বৌদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ আর আত্মনির্ভর করে তোলার জন্যে নানারকম প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। দু'জনের মিলিত উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল 'নব-জীবন পাঠশালা'। এই শ্রমিক মহল্লায় থাকতে এসে লেখক দম্পতির জীবনকে দেখার চোখ একেবারে পালটে গিয়েছিল। এখানে বসেই সুভাষদা লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ও বিতর্কিত গ্রন্থ 'ভূতের বেগার'। এই গ্রন্থ নিয়ে পার্টির মধ্যে যে বিতর্ক হয়েছিল সেকথা আমি অন্যত্র বলেছি। সুভাষদা-গীতাদির শ্রমিক জীবনের মাঝে বাস করার এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাতে তাঁদের কাছে এসেছিলেন তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ। চিনুদার বাড়িতে অজয় ঘোষের মুখ থেকে আমি সুভাষদা-গীতাদির ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি। অজয় ঘোষ ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশের আপন পিসতুতো ভাই। এই বজবজ থেকেই গীতাদিরা নিয়ে এসেছিলেন পুপেকে, তাঁদের প্রথম দত্তক কন্যা-সন্তান।

গীতাদি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু পরিবারের সন্তান। পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার দাপুটে সম্পাদক। ঠাকুরমা কাত্যায়নী দেবী ছিলেন গীতাদির আদর্শ। খুব দাপুটে স্বভাবের মহিলা। সুযোগ পেলেই গীতাদি ঠাকুরমার গল্প করতেন। গীতাদি

বলতেন, তিনি তাঁর এই দাপুটে স্বভাব পেয়েছেন ঠাকুরমার কাছ থেকে। শুধু গীতাদি নয় তাঁর সব বোনের কাছেই ঠাকুরমা ছিলেন আদর্শ। গীতাদির দিদি সীতাদিও ঠাকুরমার কথা বলতেন। সীতাদি যখন মুম্বাই ছেড়ে কলকাতায় বাস করতে এলেন তখন সীতাদির সঙ্গেও আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। সীতাদি ছিলেন খুব ভাল অভিনেত্রী। থিয়েটার ও সিনেমায় তিনি দীর্ঘকাল অভিনয় করেছেন। এখন সীতাদির নাম বোধহয় কেউ জানে না। জানলেও মনে রাখে না।

গীতাদির ছেলেবেলাটা কেটেছে মালয়ে। তাঁর বাবা ছিলেন আইনজীবী। কর্মসূত্রে তাঁকে মালয়ে যেতে হয়েছিল। অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারিয়ে গীতাদিকে ফিরতে হয়েছিল তাঁর সাবেক নিবাসে। কলকাতায় এসে ভর্তি হয়েছিলেন কমলা গার্লস স্কুলে। সেখানে তাঁর রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ হয় শিক্ষিকা সুধা রায়ের প্রেরণায়। সুধা রায়কে আমি চিনতাম। তাঁরা তখন ওয়ার্কার্স পার্টি করতেন। সুভাষদার এবং তার দাদার প্রথমে সম্পর্ক ছিল এই ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে। আমার যখন সুধাদির সঙ্গে সম্পর্ক তখন তিনি ওয়ার্কার্স পার্টির নেত্রী। আমার চোখের সামনে ওয়ার্কার্স পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিশে যায়। সুধাদিও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন।

ইস্কুলের ছাত্রী অবস্থাতেই বন্দিমুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে গীতাদি লালবাজার দর্শন করেছিলেন। পরে গীতাদি সাম্যবাদী রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন ও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন।

অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য আর অরুণ বসুর উদ্যোগে গীতাদি ইউরোপ যাত্রা করলেন ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধি হয়ে। অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য তখন ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সারির নেতা। আর অরুণ বসু বিলেত থেকে ফিরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যর সঙ্গে গীতাদির খুব বন্ধুত্ব ছিল। অন্নদাশঙ্করকে আমি 'ছোটদা' বলে ডাকতাম। শেষদিকে তার সঙ্গে একত্রে আমি অনেক কাজ করেছি। তিনি ছিলেন সি. পি. আই-এর. সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের দায়িত্বে, আর আমি ছিলাম সাহিত্য ফ্রন্টের দায়িত্বে। আগেই বলেছি আমরা দু'জনেই তখন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক উপসমিতির সদস্য। একসঙ্গে অনেকবার দিল্লি গিয়েছি, একসঙ্গে অজয় ভবনে থেকেছি, একসঙ্গে পার্টিতে তর্ক বিতর্ক করেছি। এই ছোটদার কাছ থেকে গীতাদির প্রথম জীবনের অনেক কথা আমি জানতে পেরেছি। বিশেষভাবে ধ্রুব মিত্রের সঙ্গে বিয়ের কথা। ছোটদার মুখ থেকেই শুনেছি, যে এই বিয়েতে তিনি তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। বিয়ে ভেঙে যাওয়াতে খুশি হয়ে গীতাদিকে ইউরোপ পাঠাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

গীতাদি ইউরোপে থেকেছিলেন বেশ কয়েক বছর। সেখানে তিনি পেয়েছিলেন নতুন জীবনের সন্ধান। প্যারিসে দেখেছিলেন স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারের নেত্রী লা-পাসিয়োনারাকে। শুধু পরিচিত নয় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। বৃত্তি নিয়ে হাঙ্গেরিতে

গিয়েছিলেন সমাজবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা করতে। সোভিয়েতে থাকলেন বেশ কিছুদিন, তারপর গেলেন চীনে। চীনে তাঁর সঙ্গে মাও-সে-তুঙ-এর দেখা হয়েছিল। গীতাদির মুখ থেকে সেইসব দিনের অনেক গল্পই আমি শুনেছি। চীনের অভিজ্ঞতার কথা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায়—এই তাঁর প্রথম বাংলা রচনা।

বজবজ থেকে ফিরে গীতাদি পুরোপুরি মন দিলেন সাহিত্য সৃষ্টিতে। বজবজে থাকতেই তিনি লেখা শুরু করেছিলেন। প্রকাশিত হল তার সাড়া জাগানো ছোটদের বই 'ববির বন্ধু'। বইটি প্রকাশ করেছিলেন সিগনেট প্রেস, আর অসাধারণ ছবি এঁকেছিলেন হৈমন্তী সেন। হৈমন্তী সেন বিয়ে করেছিলেন আমাদের সময়কার ছাত্রনেতা সুখেন্দু মজুমদারকে। সুখেন্দু মজুমদারের সঙ্গেও ছিল আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা। আশ্চর্যজনকভাবে বিয়ের পর কেমন পালটে গেলেন সুখেন্দুদা। পরবর্তীকালে তো তাঁকে দেখলাম পণ্ডিচেরীর শিষ্য হিসাবে। আমাদের যিনি এককালে বিপ্লবের বাণী শোনাতেন তিনিই আমাকে শোনাবার চেষ্টা করলেন ঋষি অরবিন্দ ও শ্রীমা'র মহিমা।

'ববির বন্ধু'র পর একে একে প্রকাশিত হল 'হনু মানুষ', 'পিকলুর সেই ছোটকা', 'হাওয়া-গাড়ি গাড়ি-হাওয়া' ও আরো অনেক বই। 'হাওয়া-গাড়ি গাড়ি-হাওয়া' দিলীপ বসু'র গাড়ি নিয়ে লেখা—সেকথা আমি অন্যত্র বলেছি।

শুধু শিশু সাহিত্য নয়, গীতাদি বড়দের উপন্যাসও লিখেছেন। নাটকও লিখেছেন বেশ কয়েকটি। 'স্ত্রীর পত্র' নাট্যরূপ দিয়ে ঋত্বিক ঘটকের নির্দেশনায় নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন পঞ্চাশের দশকে। সেই নাটক দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তারপর গীতাদি তৈরি করলেন একটা নাটকের দল। নিয়মিত মঞ্চস্থ করেছেন কয়েকটি নাটক। 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত তাঁর 'সম্ভ্রান্ত' নাটকটির কথা কি ভোলা যায়!

তারপর গীতাদি মেতে উঠলেন পুতুল নাচের পালায়। তখন তাঁর সহযোগী ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী ও আর-এক পুতুল নাচ-পাগল রঘুনাথ গোস্বামী। লেক টেরাসে গীতাদি 'সুশিক্ষণ' নামে যে স্কুল গড়ে তুলেছিলেন তার ছাদে অসংখ্য পুতুল নাটক অভিনীত হয়েছে। গীতাদিকে দেখেছি যে কাজে যখন তিনি হাত দিয়েছেন, তখন সেই কাজ ছাড়া তিনি অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না। অনেক কষ্টে 'ছাগলের সেই তৃতীয় ছানা' নামে একটি চলচ্চিত্র করেছিলেন। দূরদর্শনেও ছোটদের জন্যে ছবি বানিয়েছেন। একবার আমার মেয়ে রুম্পাকে নিয়ে ছোট পর্দার জন্যে একটি ছবি করেছিলেন। ছবিটি দূরদর্শনে দেখানো হয়েছিল। রুম্পা'র তখন তিন বছর বয়স।

'সুশিক্ষণ' ছিল গীতাদির প্রাণ। ইংরাজি মাধ্যমে শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন গীতাদি। তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল, মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন। জীবনে শেষদিন পর্যন্ত সুশিক্ষণে সেই প্রচেষ্টাই তিনি করে গিয়েছেন।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার উদ্দেশ্যে যখন আন্দোলন শুরু করেছিলেন তখন আমরা সবাই ছিলাম তার কর্মী। চিনুদা, সুভাষদা, গীতাদি, আমি তখন দিনের পর দিন সেই আন্দোলনে শামিল থেকেছি। সেই সময় আচার্য সত্যেন বসু গীতাদির 'সুশিক্ষণে' এসেছিলেন এবং গীতাদির মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেদিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। দেখেছিলাম সুভাষদা-গীতাদির প্রতি সত্যেন বসুর কী গভীর স্নেহ।

গীতাদি ছিলেন সচ্ছল পরিবারের সন্তান। স্বাচ্ছন্দ্যেই কেটেছে তার প্রথম জীবন। কিন্তু সুভাষদার সঙ্গে জীবন যোগ করার পর থেকে, যে দারিদ্র্য তার সঙ্গী হয়, সেই দারিদ্র কখনো তাঁকে ত্যাগ করেনি। দারিদ্র্যকে যে কীভাবে অবহেলা করতে হয়, সে শিক্ষা আমি গীতাদির কাছে পেয়েছি।

গীতাদির সঙ্গে আমার পঞ্চাশ বছরের সম্পর্কে লক্ষ করেছি দরিদ্র সাধারণ মানুষকে আপনভাবে কাছে টেনে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল গীতাদির। আমাদের যার বাড়ি যার কাজের লোকের প্রয়োজন হত গীতাদি সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন। এমন নিবিড় সম্পর্ক ছিল তাঁর কাজের লোকদের সঙ্গে।

গীতাদি কিছুকাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে কাজ করেছিলেন। সেই সময় প্রায় প্রতিদিন তিনি অসুস্থ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে বাড়ি ফিরতেন। গীতাদির কর্মক্ষেত্র থেকে মানিকবাবুর বাসা ছিল কাছাকাছি।

সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, সমাজসেবা, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গীতাদি যে অসাধারণ কাজ করে গেলেন তার জন্যে বিশেষ কোনো সম্মান তাঁর কপালে জোটেনি। শিশু সাহিত্যে 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' ছাড়া আর কোনো সম্মান তিনি পাননি। প্রচারের আলোতেও গীতাদি কোনোদিন আসেননি। এমন উঁচুদরের লেখিকা হওয়া সত্ত্বেও, তাঁকে তেমন ভাবে মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

মানুষ হিসেবে গীতাদি ছিলেন অসাধারণ। জীবনে অনেক মানুষ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু গীতাদির মতো মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি যেভাবে একের পর এক অসহায় শিশুদের নিজের বুকের মাঝে টেনে নিয়েছিলেন, তেমন কোনো কমিউনিস্টকেও আমার চোখে পড়েনি। মনে আছে, যখন তোতা ও পাপুকে গীতাদি দত্তক নিলেন তখন আরো দু'একজনের জন্যে তিনি তার কমিউনিস্ট বন্ধুদের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু নানা সমস্যার কথা তুলে তাঁরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। দুজনকেই মাত্র আমি জানি যাঁরা গীতাদির অনুরোধে দত্তক হিসাবে পুত্র-কন্যা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা একজন হলেন পরিমল ভট্টাচার্য ও দ্বিতীয়জন শান্তিনিকেতনের সুনীল সেন। দুজনেই ছিলেন আমার খুব ঘনিষ্ঠ। দুজনেই এখন প্রয়াত।

গীতাদির মাঝে আমি কোনোদিন কোনো ক্ষুদ্রতা কোনো তুচ্ছতা দেখতে পাইনি।

তিনি ছিলেন ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার উর্ধ্বে। বিশাল হৃদয়ের এই মানুষটির তাই প্রিয় সঙ্গী ছিল ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, গাছপালা, পশু-পাখি। গীতাদির বাড়িতে মানুষ হত এক ডজন হৃষ্টপুষ্ট বেড়াল। বেড়ালদের এমন রাজার হালের সুখী জীবন বোধহয় কেউ কখনো দেখেনি।

গীতাদির মুখে সবসময় লেগে থাকত হাসি। তাঁর বিষণ্ণ মুখ আমি কদাচিৎ দেখেছি। কিন্তু সেই হাসিমুখে গীতাদি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারলেন না। এমন একটা অসুখ তাঁর শরীরে বাসা বাঁধল, যে অসুখে শেষকালে কেউ হাসতে পারে না। আমি বিখ্যাত বিজ্ঞানী জে. বি. এস. হলডেনকে দেখেছি একই অসুখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে। তাঁর আত্মজীবনীতে এই অসুখকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে শেষকালে কবিতাও লিখেছিলেন, কিন্তু শেষদিনে যন্ত্রণায় হাসতে পারেননি—গীতাদির মতোই। গীতাদি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে হলডেনের সঙ্গে কাজও করেছেন।

গীতাদির মরদেহ যখন তার শরৎ ব্যানার্জী রোডের বাড়িতে নিয়ে আসা হল, তখন খবর পেয়ে আমি ছুটে গিয়েছিলাম। আমি তখন খুবই অসুস্থ, কিন্তু অসুস্থতা আমাকে পিছু টানতে পারেনি। মনের টানের শক্তি এত প্রবল।

চুপচাপ আমি গীতাদির মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল সব যন্ত্রণার শেষ। গীতাদির চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে সেই চিরন্তন হাসি। মনে হচ্ছিল, গীতাদি আমাকে দেখে সেই আগের মতোই হাসছেন। হাসতে হাসতেই তিনি গেলেন কেওড়াতলা মহাশ্মশানে, তারপর মহাশূন্যে।

সমাপ্তি ঘটল অসাধারণ সাচ্চা এই মানুষটির বিরাশি বছরের জীবন।

উমা সেহানবীশ

আজ এই অচেনা অজানা দিনে নিজেকে কেমন অসহায় লাগছে। অচেনা সময় অচেনা মানুষ। যাদের দেখছি, যাদের সঙ্গে চলাফেরা করছি, তাদের কাউকেই কেন নিজের লোক বলে মনে হয় না তা আমি ঠিক জানি না। দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকলে অথবা ক্ষমতার ছোঁয়া লাগলে মানুষ কেমন অচেনা হয়ে যায়—জানি না...। পুরানো দিনের মানুষ আজ আর ক'জন আছেন! একমাত্র জ্যোতি বসু ছাড়া তো আর কাউকেই দেখতে পাই না। তাঁকেও তো আজ পুরোপুরি চেনা মানুষ বলে ভাবতে পারছি না। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুরজিৎ ছাড়া কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না। চেনা মানুষদের সন্ধানে আজও আমি ঘুরে বেড়াই। কিন্তু কোথায় পাব তাঁদের! তাঁরা তো একে একে সবাই চলে গেলেন। এই তো কিছুদিনের ব্যবধানে চলে গেলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর উমা সেহানবীশ।

উমাদির কথা আজ আমার ভীষণভাবে মনে পড়ছে। কতদিন উমাদির ঘনিষ্ঠজন হিসেবে কেটেছে আমার জীবন। উমাদিদের ১৯ নং ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোডের সামনের দিককার ঘরে সেই আড্ডার দিনগুলি আজও যেন আমার সামনে খেলা করছে। চিনুদা আর উমাদির টানে কত মানুষের যে ভিড় জমত সেই আড্ডায়! মূল বিষয় রাজনীতি-সাহিত্য-সংস্কৃতি আর শিক্ষা। ব্যক্তিগত গসিপ যে হত না তা নয়। তা ছিল উপরি পাওনা।

চিনুদা-উমাদির কাছে আমি যখন গিয়েছি তখন তাঁরা থাকতেন উত্তর কলকাতায় খান্না সিনেমার পাশে। কতবার সেই বাড়িতে আমি গিয়েছি। সে বাড়িতে জ্যোতি বসুও এসেছেন বেশ কয়েকবার। জ্যোতি বসুর সঙ্গে চিনুদা-উমাদির খুব হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। জ্যোতি বসুকে উমাদি 'জ্যোতিদা' বলে ডাকতেন। উমাদি ছাড়া আর কেউ তাঁকে 'দাদা' বলে ডেকেছে এমন কথা আমি জানি না। ছোট-বড় সকলের কাছে তিনি চিরকালই 'জ্যোতিবাবু'। জ্যোতিবাবুরও নিজের বোনের মতো উমাদির প্রতি গভীর স্নেহ ছিল তা আমি অনেকবার লক্ষ করেছি।
উমাদি ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। আশি বছর বয়সেও তার সৌন্দর্যের হানি ঘটেনি। উমাদির দুই দাদা সুন্দর হলেও উমাদির মতো এমন চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য তাঁদের ছিল না। উমাদির বাবাকে আমি দেখিনি। কিন্তু উমাদির মা ও দুই দাদাকে আমি শুধু দেখেছি তাই নয় তাঁদের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। উমাদির মা-ও ছিলেন খুব সুন্দরী। মাসিমার কাছে বসে কতদিন পুরানো দিনের কত কথাই না শুনেছি! প্রথম যুগের স্নাতক

ছিলেন উমাদির মা। শিক্ষা ও রুচির মিশ্রণে সৌন্দর্য যে কী রূপ পেতে পারে তা উমাদি ও তাঁর মায়ের মতো মানুষদের না দেখলে বোঝা যাবে না।

উমাদির বড় দাদা হলেন ভারতের বিখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী। আমি যখন নিখিলদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছি তখন তিনি দিল্লিতে থাকেন। শেষ জীবনও কেটেছে দিল্লিতে। রাজনীতি ও সাংবাদিকতা জগতে নিখিলদার একটি বিশেষ সম্মান ছিল। ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন নিখিলদার খুবই ঘনিষ্ঠ। অনেক জটিল ও গুরুতর বিষয়ে শ্রীমতি গান্ধী নিখিলদার পরামর্শ নিতেন। নিখিলদার পরিচিতি শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বিদেশেও তিনি ছিলেন খুব পরিচিত ও সম্মানিত।

নিখিলদার স্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেত্রী ও দীর্ঘকালের সাংসদ রেণু চক্রবর্তী। রেণুদিরও আমি খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। রেণুদির নির্বাচনে অনেকবারই কাজ করেছি। রেণুদি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। রেণুদি-নিখিলদার বিয়ে হয়েছিল বিলেতে—যখন তাঁরা সেখানে ছাত্র। ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধী ছিলেন তাঁদের বন্ধু। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সেখান থেকেই তাঁদের সম্পর্ক। নিখিলদা-রেণুদি বিলেতে থাকতেই কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভূপেশ গুপ্ত-জ্যোতি বসুর সঙ্গে সেখানেই তাঁরা রাজনীতি করেছেন।

রেণুদি ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়ের আপন ভাইঝি। রাজনীতির ক্ষেত্রে কাকা-ভাইঝি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করলেও তাঁদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল খুবই নিবিড়। রেণুদির মুখ থেকে বিধান রায় সম্পর্কে অনেক অজানা কথা আমি জানতে পেরেছি।

তাঁদের একমাত্র ছেলে সুমিতও নামী সাংবাদিক। দিল্লিতে থাকে। নিখিলদা প্রতিষ্ঠিত 'মেইনস্ট্রিম' পত্রিকার সুমিত এখন সম্পাদক। পুত্রবধূ তানিয়া দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদ। তানিয়ার বাবা শান্তিময় রায় আর মা সাবিত্রী রায়। শান্তিময়বাবু ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও কমিউনিস্ট কর্মী। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি-প্রতিষ্ঠার জন্যে শান্তিবাবু শেষ জীবন পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। ইংরাজি ও বাংলায় তাঁর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে। সাবিত্রী রায় খুবই উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক। কিন্তু জীবিতকালে কোনো সম্মানই তিনি পাননি। ইদানীং তাঁকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে দেখে আমি খুবই খুশি। তাঁর একটি উপন্যাস আমি প্রকাশ করেছিলাম।

সুমিত ও তানিয়া আমার খুবই প্রিয়জন। এখন অবশ্য দেখা সাক্ষাৎ হয় খুব কম। বিয়ের আগে থাকতেই তাদের দুজনকে দেখে আসছি।

উমাদির ছোটদা হলেন নিরঞ্জন চক্রবর্তী। ডাকনাম 'বাদল'। আমি 'বাদলদা' বলেই ডাকতাম। বাদলদা ও তাঁর স্ত্রী পিপুদির সঙ্গেও আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। পিপুদিও ছিলেন উমাদির মতোই সুন্দরী। বাদলদা ছিলেন খ্যাতনামা মুদ্রণ বিশারদ। প্রিন্টিং টেকনোলজি কলেজের তিনিই প্রথম অধ্যক্ষ। বাদলদা কিছুকাল আফ্রিকাতে কাটিয়েছিলেন।

সেখানেই তার একমাত্র শিল্পী ছেলে 'বোজো' দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। সেই শোক আজও আমি ভুলতে পারি না। কী অসাধারণ সুন্দর তাজা যুবক ছিল বোজো! কী অসাধারণ ছবি আঁকত! জীবন কী নির্মম! বোজো চলে যাওয়াতে বাদলদা-পিপুদির দিকে আমি তাকাতে পারতাম না। যদিও পরিশীলিত ব্যক্তিত্বের এই দম্পতি কী গভীর চাপা স্বভাবের ছিলেন। তাঁদের একমাত্র মেয়ে পিয়ালী প্যারিসের বাসিন্দা। উমাদিকে শেষ দিন পর্যন্ত দেখেছি পিয়ালীর ফোনের জন্যে অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। উমাদির আগেই নিখিলদা-রেণুদি, বাদলদা-পিপুদি সবাই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন।

এইসব যন্ত্রণা বুকে বেঁধে বেঁচেছিলেন উমাদি।

উমাদি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী ছাত্রী। তাঁর সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, জলিমোহন কল ও আরো অনেকে। এঁরা সবাই ছিলেন কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে উমাদির প্রিয় বন্ধু ছিলেন কবি মণীন্দ্র রায়ের প্রথমা স্ত্রী রমাদি। রমাদি সম্পর্কে অনেক কথা আমি উমাদির মুখ থেকে শুনেছি। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই পুরীতে এক দুর্ঘটনায় রমাদির মৃত্যু ঘটে। রমাদিকে উমাদি ভুলতে পারেন নি। শেষদিন পর্যন্ত তিনি রমাদির কথাই বলতেন।

উমাদি সুভাষদা দুজনেই এম. এ. শেষ না করে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পার্টির বেআইনি যুগে সর্বোচ্চ স্তরের নেতৃবৃন্দের দেখভালের দায়িত্ব ছিল উমাদির। আন্ডারগ্রাউন্ডে তখনকার সাধারণ সম্পাদক বি.টি. রণদিভেকে দেখভালও অনেকদিন করেছেন উমাদি। উমাদির সৌন্দর্য, সততা ও কর্তব্য-নিষ্ঠাকে গোপনীয়তার কাজে লাগিয়েছিলেন নেতৃবৃন্দ। সেইসব দিনের অনেক গল্পই উমাদির মুখ থেকে শুনেছি।

কিন্তু মজার বিষয় আমার মতো তুচ্ছ মানুষেরা বারবার ধরা পড়লেও উমাদি কখনো ধরা পড়েননি। আমরা এই প্রসঙ্গে ঠাট্টা করে বলতাম, আপনার রূপে মুগ্ধ হয়ে পুলিশ আপনাকে ধরার কথা ভুলে যেত।

উমাদিও হাসতে হাসতে জবাব দিতেন, নিরেট পুলিশের নিরেট মাথা এর চেয়ে আর বেশি কী হবে!

উমাদিকে শান্তি আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে আমি দীর্ঘকাল দেখেছি। শুধু দেখিনি, তাঁর সঙ্গে শান্তি আন্দোলন করেছিও। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত 'রবীন্দ্রমেলা'য় উমাদিকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি। সবসময় তিনি চিনুদার পাশাপাশি থেকেছেন।

চিনুদা-উমাদির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। উত্তর কলকাতা থেকে উমাদিরা উঠে আসেন দক্ষিণ কলকাতায়। অল্প কিছুদিন গড়িয়াহাটে কাটিয়ে বাস করা শুরু করেন লেকের কাছাকাছি ১৯ নং ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোডে। এই বাড়িতে আমিও পঁচিশ বছর কাটিয়েছি। সেই পঁচিশ বছরে চিনুদা-উমাদি আর আমি একই

পরিবারের সদস্যের মতো জীবন কাটিয়েছি। সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনা ও আনন্দে আমরা একই সঙ্গে আন্দোলিত হয়েছি। আগেই বলেছি আমার দুই সন্তান তো উমাদির কাছেই ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছে। তাদের জীবনে উমাদি-চিনুদার প্রভাব খুব বেশি।

দক্ষিণ কলকাতায় উমাদি-চিনুদা এবং আমাকে অতি অল্প ভাড়ায় যিনি এনে বসিয়েছিলেন তিনি হলেন দিলীপ বসু। তাঁর কথা তো আগেই বলেছি। দিলীপবাবুর কথা উমাদি শেষদিন পর্যন্ত বলতেন।

শিক্ষাবিদ হিসেবে উমাদির অবদান কেউ বোধহয় অস্বীকার করতে পারবে না। সাউথ পয়েন্ট স্কুল গড়ার পিছনে উমাদির বিশেষ ভূমিকা আছে। সাউথ পয়েন্টের প্রতিষ্ঠাতা সতীকান্ত গুহকে উমাদি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। উমাদির চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ছিল যে কাজে তিনি হাত দেবেন সার্থকভাবে সেই কাজ শেষ করবেনই। সাউথ পয়েন্টে তখন উমাদি ছিলেন সতীকান্তবাবুর পরেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

সতীকান্তবাবুকেও আমি চিনতাম। শেষদিন পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতাও ছিল। পুত্রবধূর মৃত্যু নিয়ে খুবই বিপাকে পড়েছিলেন। অনেকে তাঁকে ত্যাগ করলেও আমি তাঁকে একেবারে ত্যাগ করিনি। তাঁর বিপদের দিনে তাঁর কাছে গিয়েছি। মানুষ হিসেবে সতীকান্তবাবুকে আমার কখনো খারাপ মনে হয়নি। তবু তাঁকে কারাবাস করতে হল, লাঞ্ছিত হতে হল, পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে ধিকৃত হতে হল! এমন একজন সার্থক মানুষের এমন পরিণতি আমাকে খুবই ব্যথিত করেছিল। সাহিত্যের প্রতি সতীকান্তবাবুর গভীর নিষ্ঠা ছিল। তিনি লেখকের স্বীকৃতি পেতে চেয়েছিলেন। ছোটদের ও বড়দের বেশ কয়েকটি গ্রন্থের তিনি লেখক। তবু তাঁর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পাওয়া নিয়ে প্রচণ্ড বিরূপতা হয়েছিল। আজও আমার মনে হয় সে বছর তাঁকে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দেওয়ার মধ্যে বিশেষ স্বচ্ছতা ছিল না। অনেক ব্যক্তিগত স্বার্থ সেখানে কাজ করেছিল। তিনি আমার ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তি আমি মানতে পারিনি।

সতীকান্তবাবুর সঙ্গে উমাদির আকস্মিক বিরোধ শুরু হল। দুজনের মাঝে এমন সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, যাতে এমন বিরোধ বাধতে পারে তা কেউ ভাবতে পারেনি। শান্ত স্বভাবের উমাদিকে অত্যন্ত উত্তেজিত হতে দেখেছি। প্রতিদিন সকালে চায়ের টেবিলে উমাদি, চিনুদা আর আমি এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করতাম। সাময়িকভাবে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে আমি সতীকান্তবাবুর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। উমাদির প্রতি এই ব্যবহার আমি মানতে পারিনি। সতীকান্তবাবুর কাছেও উমাদি প্রসঙ্গ তুলতে চাইনি। ভেবেছি এর ফলে তিক্ততা বেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না।

উমাদিকে সতীকান্তবাবু আকস্মিকভাবে ছাঁটাইয়ের নোটিশ পাঠালেন। উমাদির ঘনিষ্ঠ আমরা থমকে গেলাম। উমাদির ঘনিষ্ঠ সব সহকর্মীরা কিন্তু উমাদির পাশে এসে দাঁড়ালেন না। কলকাতার লেখক বুদ্ধিজীবীদের বেশ কয়েকজন তখন সাউথ পয়েন্টের

শিক্ষক। তাঁরা কেউই উমাদির সমর্থনে দাঁড়ালেন না। কয়েকজন শিক্ষক কিন্তু দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, নিবেদিতা নাগ ও জয়া চট্টোপাধ্যায়ের নাম মনে পড়ছে। তাঁরা শুধু দাঁড়ালেন না, উমাদির সমর্থনে পদত্যাগও করলেন। যতদূর মনে পড়ছে উমাদির সমর্থনে বোধহয় নয়জন শিক্ষক পদত্যাগ করেছিলেন। উমাদির বাড়িটি তখন আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল। প্রখ্যাত আইনজীবী কৃষ্ণবিনোদ রায় আইনি-বিষয়টি নিজের হাতে তুলে নিলেন। আগেই বলেছি কৃষ্ণবিনোদ রায় হলেন আমার মাসতুতো ভাই। আমার আর এক মাসতুতো ভাই তখনকার বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অমিয় বসু উমাদির পাশে এসে দাঁড়ালেন। এছাড়া উমাদির পাশে তখন দাঁড়িয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়—যিনি ছিলেন উমাদির দীর্ঘকালের বন্ধু।

উমাদি অনুভব করলেন, আন্দোলন বা সংঘর্ষ করে বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার চেয়ে অন্য কিছু ভাবা যাক। সেই ভাবনারই ফসল কলকাতায় বিখ্যাত স্কুল 'পাঠভবন'। পাঠভবনের জন্য বাড়ি খোঁজা শুরু হল এবং পাওয়াও গেল। বালিগঞ্জ প্লেসে তখনকার বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ডা. আর আহমেদ-এর বাড়ি। ডা. আহমেদ অবশ্য তখন প্রয়াত। তাঁর মেয়ের কাছ থেকে উমাদিরা বাড়িটা পেয়েছিলেন। একটি স্কুল করতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন। তবু উমাদি পিছপা হলেন না। ছাঁটাই হওয়ার ফলে শিক্ষকরা সাউথ পয়েন্ট থেকে যে অর্থ পেয়েছিলেন সেটিই হল পাঠভবনের প্রথম মূলধন। তবে ভাল কাজে তো আর টাকার অভাব হয় না। টাকা ভূতে জোগায়। পাঠভবনের ক্ষেত্রে ভূতই বোধহয় জুগিয়েছিল। তা না হলে এত অল্প মূলধনে এমন একটা উঁচুদরের স্কুল কখনো গড়ে উঠতে পারে! যে যেমন পারেন সেরকম সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন অনেকেই। প্রথম যুগে আমিও জড়িয়ে গিয়েছিলাম কিছুটা। উমাদির সঙ্গে একই বাড়িতে থাকি, দু'বেলা ওঠাবসা করি, উমাদির এমন একটা মহৎ কাজে জড়িয়ে না পড়ার কথা কি ভাবা যায়!' পাঠভবনের জন্যে উমাদি তাঁর জীবনের সবকিছু উজাড় করে দিলেও, শেষ সম্মান কিন্তু পেলেন না। শেষকালে নিজের গড়া কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইস্কুলে নিজেই কেমন যেন ব্রাত্য হয়ে গেলেন। এখানেও রাজনীতি গ্রাস করল। উমাদির সঙ্গে তখন আমি পাঠভবনের পরিস্থিতি নিয়ে অনেকদিন আলোচনা করেছি। উমাদি সহজভাবে আলোচনা করলেও তখন তাঁর মাঝে গভীর বেদনা লক্ষ করেছি।

তখনকার পাঠভবন ছিল পাঠ্য তালিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ পাঠ্য নিকেতন নয়। প্রতিটি ছাত্রকে পূর্ণাঙ্গ বাঙালি ও মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা ছিল। নানারকম অনুষ্ঠান, মেলা তো লেগেই ছিল। দেশপ্রিয় পার্কে পাঠভবন যে মেলার আয়োজন করেছিল, সেকথা আজও আমি ভুলতে পারিনি। বহুদূর থেকে দেখা যেত দুটি না তিনটি পুতুল একপায়ে দাঁড়িয়ে। কলকাতাবাসীর কাছে সেদিনের সেই পাঠভবন-মেলা গভীর আকর্ষণের সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া পাঠভবনের সুকুমার মেলার কথাও বোধহয় কেউ

ভুলতে পারেনি। সবই সম্ভব হয়েছে উমাদির অসাধারণ উদ্যোগ, সততায় ও আন্তরিকতায়। এইসব কাজে উমাদির সবচেয়ে সহায়ক ছিলেন তার প্রিয় বন্ধু সত্যজিৎ রায়।

আমার ছেলেমেয়ে উমাদির হাত ধরে এই পাঠভবনে গিয়েছে। শুধু আমার নয় অনেক নামী ব্যক্তির ছেলেমেয়েরা সবাই পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রী। পাঠভবন থেকে অনেক কৃতী ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়েছে। এখন সেই পাঠভবন বোধহয় আর নেই।

উমাদি যখন বুঝতে পারছিলেন তাঁর স্বপ্নের সেই পাঠভবন ধীরে ধীরে কক্ষচ্যুত হচ্ছে তখন তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন প্রাথমিক বিভাগটিকে রক্ষা করতে। রক্ষা ছিল প্রাথমিক বিভাগের ম্যানেজিং কমিটি সম্পূর্ণ পৃথক। যত গোলমাল মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে। উমাদি অনুভব করেছিলেন প্রাথমিক বিভাগ-ই তো জীবন গড়ার ভিত্তিভূমি। তাই সেখানে কোনোরকম ভেজালকে উমাদি প্রশ্রয় দেননি।

শুধু প্রাথমিক বিভাগে মন দিয়ে উমাদি ক্ষান্ত থাকেননি, ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি আবার গড়ার কাজ শুরু করলেন। গড়ে উঠল 'ডানকুনি পাঠভবন', একেবারে পৃথক সত্তা। এখন মাধ্যমিকের অনুমোদনও লাভ করেছে। এতসব দায়িত্ব উমাদি যখন পালন করছেন তখন তিনি চোখে প্রায় দেখতে পান না। শেষের দিকে ডানকুনি যেতেও পারতেন না। বাড়িতে বসেই সবকিছু পরিচালনা করতেন। আমার যে তিন বছরের মেয়ে রুম্পা বা পিয়ালীকে উমাদি হাতে ধরে কলকাতার পাঠভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাকেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করলেন ডানকুনি পাঠভবনে। পাঠভবনের অনেক ছাত্রই পরবর্তীকালে শিক্ষক হয়েছেন।

উমাদির এই গড়ে তোলার পিছনে আর একজনের অবদানের কথা আমার মনে পড়ে। তিনি হলেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি উমাদির পাশে ছিলেন। তাঁর কথা আমি অন্যত্র বলেছি।

চিনুদা চলে যাওয়ার পরে উমাদি একেবারে একা হয়ে যান। তখন ছায়ার মতো তাঁর পাশে থেকেছে অতি সাধারণ একটি মেয়ে—তার নাম সারদা। আপন মায়ের মতো উমাদিকে শেষ জীবনে সারদাই দেখাশুনো করেছে।

শরৎ ব্যানার্জী রোড ছেড়ে আসার পর আমি মাঝে মাঝে উমাদির কাছে যেতাম। প্রতিদিনের দেখা-সাক্ষাতের সেই সুযোগ আর ছিল না। দুরারোগ্য রোগে উমাদি আক্রান্ত হলেন। নিজের মুখে তাঁর অসুখের কথা তিনি আমাকে জানালেন। একা নিঃসঙ্গ এই মানুষটির শেষদিনগুলির কথা ভেবে আমি সেদিন শিউরে উঠেছিলাম!

তারপর একদিন শুনলাম সব শেষ। উমাদি আর নেই।

কয়েকদিন আমি কোনো কাজে মন দিতে পারিনি। যেখানেই যাই ভেসে ওঠে উমাদির মুখ। শেষের দিকে রাজনীতি-জগতের সবাই প্রায় উমাদিকে ত্যাগ করেছিলেন। কী নির্মম এই রাজনীতির জগৎ! কত মানুষের উপস্থিতিতে একদিন গমগম করত শরৎ

ব্যানার্জীর সামনের এই একতলাটা। শেষের দিকে সেই স্থান হয়ে গেল কেমন নিষ্প্রভ। মতবিরোধে উমাদি পার্টি সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পার্টির প্রকাশ্য বিরোধিতা কখনো করেননি। তবু তাঁর বিশাল অবদানকে পার্টি কোনোভাবেই স্বীকার করল না। তাতে অবশ্য উমাদির কিছু যায় আসে না। মাঝে মাঝে ক্ষোভ বা দুঃখ যা প্রকাশ করেছেন, তা আমাদের মতো ঘনিষ্ঠজনের কাছে, অন্য কোথাও নয়। উমা সেহানবীশ—উমা সেহানবীশই থাকবেন। আর কোথাও না হোক শিক্ষা জগৎ থেকে তাঁর নাম মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। এমন সুন্দরী বিদুষী ও পরিশীলিত ব্যক্তিত্বের মানুষটির কথা কি কেউ ভুলতে পারে! শেষদিন পর্যন্ত দেখেছি তাঁর প্রিয় ছাত্ররা তাঁকে ভোলেনি। আর কোথাও না হোক ছাত্রদের মাঝে উমাদি অমর হয়ে থাকবেন। আমার ছেলেমেয়েকে দেখে সে-কথা আমি বুঝতে পারি।

উমাদিদের মতো মানুষদের সান্নিধ্যের স্মৃতি বুকে বেঁধেই আজও আমি বেঁচে আছি।

দ্বারিক গুপ্ত

আমার ভাল লাগছে না। কখনই ভাল লাগছে না। সকলের মাঝে থেকেও যেন আমি নেই। আমার অস্তিত্ব আর আমি অনুভব করতে পারছি না। সময় একি নির্মমতা শুরু করেছে! নতুন যে শতাব্দী আসছে সে শতাব্দীর কাছে কি আমরা এতটাই অবাঞ্ছিত? তা না হলে এই শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এমনভাবে একের পর এক নক্ষত্র-পতন হবে কেন?

আবার নক্ষত্র-পতন। বাপী অর্থাৎ ড. দ্বারিক গুপ্ত চিরদিনের জন্য নিভে গেল। এখানে নয়, সুদূর লন্ডন শহরে। অবসর গ্রহণের পর বাপী লন্ডন শহরে পাকাপাকিভাবে বসবাস করছিল।

আমার মতন সাধারণ মানুষ ছিল না সে। বিজ্ঞানী হিসেবে ড. দ্বারিক গুপ্ত বিশ্বখ্যাত। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের দেশে ড. দ্বারিক গুপ্তের নাম খুব কম লোকই জানে। বিজ্ঞানী মহলে সে নিশ্চয় পরিচিত ছিল। গত বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগে একজন সংগঠক তরুণ বিজ্ঞানীকে তার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত ঠেকিয়ে চোখ বড় করে বলেছিলেন, বাব্বাঃ তিনি তো নমস্য। দ্বারিক আমার তরুণ বয়সের বন্ধু একথা জানাতে সেই তরুণ বিজ্ঞানী বিস্ময়ভরা চোখে আমাকে দেখেছিলেন। আমি যে এরকম ব্যক্তিত্বের বন্ধু হতে পারি, সে-কথা তিনি বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি।

বাপীকে এখানে বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, নীলরতন সরকার স্বর্ণপদকে সম্মানিত করা হয়েছে। কিন্তু বাপীর আবিষ্কার নিয়ে কখনই সেরকম কোনও প্রচার আমার চোখে পড়েনি। আমাদের সব সংবাদপত্রেরই লন্ডনে প্রতিনিধি আছেন। তাঁদের পাঠানো রিপোর্ট প্রায়ই পাঠ করি। কিন্তু তাঁরা কেউ ড. দ্বারিক গুপ্তকে নিয়ে কখনও কিছু লিখেছেন বলে আমার মনে পড়ে না।

গত মাসে লন্ডন থেকে একটি আমন্ত্রণপত্র পেলাম। প্রয়াত অধ্যাপক দ্বারিক গুপ্তের জীবন ও কর্মের স্মরণে আলোচনা-সভা। বিষয় : একবিংশ শতাব্দীতে স্নায়ু বিজ্ঞানের ভবিষ্যত। চারটি সংগঠন মিলিতভাবে এই আলোচনা-সভা আহ্বান করেছে। ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার রয়াল সোসাইটি অভ মেডিসিন ভবনে এই আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সেই সম্পর্কে কোনো রিপোর্টই কোনো পত্রিকার প্রতিনিধি এখানে পাঠাননি। পাঠালে এমন একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ নিশ্চয় প্রকাশিত হত।

বাপী দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল জানতাম। সেই খবর যখন প্রথম পাই তখন কয়েক রাত ঘুমোতে পারিনি। কিন্তু মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম বাপীর মতো বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী নিজেকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু পারল না।

বিজ্ঞান ব্যর্থ হল। বিজ্ঞানের এই ব্যর্থতার কথা ঠিক আর একবার আমার মনে হয়েছিল। তিনি বিদেশি হয়েও এদেশে ছিলেন আমাদের কাছের মানুষ। পাজামা গেরুয়াপাঞ্জাবি পরিহিত আমার পরম শ্রদ্ধেয় সেই বিজ্ঞানীকেও কিছুটা কাছ থেকে দেখেছিলাম। তাঁর নাম জে. বি. এস. হলডেন। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে, আমার গভীর বিশ্বাস ছিল অত বড় বিজ্ঞানীর এত সহজে মৃত্যু হবে না। কিন্তু বিশ্বাস ভাঙতে বেশিদিন লাগেনি। বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞান ব্যর্থ হতে সেবার আমি দেখেছিলাম। আজ সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখলাম।

পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই ড. দ্বারিক গুপ্ত বা বাপীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। সেদিনের সেই দিনগুলির কথা আমি আগেই বলেছি। কী তাজা, কী উজ্জ্বল, কী স্বপ্নমাখা ছিল সেই দিনগুলি। কফিহাউসে এক কাপ কফি তিনজনে ভাগ করে নিয়ে নিজেদের কী পরম সৌভাগ্যবান মনে করতাম। মনের গভীরে দৃঢ় বিশ্বাস দেশটাকে আমরা নিশ্চিতভাবে পাল্টে দিতে পারব। কফিহাউসের সেই আড্ডায় বাপী বেশিরভাগ সময় হাজির থাকত। সকলের মধ্যে আমি ছিলাম বয়ঃকনিষ্ঠ। বাপী ছিল অসাধারণ সুপুরুষ-উজ্জ্বল শানিত চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত। কোনো মেয়েরই চোখ এড়িয়ে যাবে না, যেতও না। কিন্তু কেউই বাপীকে তিরবিদ্ধ করতে পারেনি। বাপী তিরবিদ্ধ হয়েছে অন্যত্র। দুই সন্তানের জননী ভক্তিদি হলেন বাপীর জীবনসঙ্গিনী। ভক্তিদিও আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী। ভক্তিদি'র রচিত গ্রন্থ 'সেক্স এথিকস ইন মহাভারত ইন দ্য লাইট অভ ধর্মসূত্র রুলিংস' আজও আমার কাছে প্রকাশের অপেক্ষায়। আক্ষেপের বিষয় বইটি বাপী দেখে যেতে পারল না। তার জন্যে প্রধান অপরাধী আমি নিজে। আমার আমিকে ক্ষমা করা বড় কঠিন।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় সেই উত্তাল দিনগুলিতে বাপী, আমি এবং আরও অনেকে অতি সহজে অশান্ত আগুনের দিকে নির্দ্বিধায় এগিয়ে গিয়েছি। নতুন দিনের স্বপ্নে আমরা সবাই মশগুল। সাহিত্যের প্রতি আমাদের সকলের নেশা। কিন্তু বিশ্বাস করতাম সাহিত্য হল সংগ্রামের হাতিয়ার। বাপী সেই সময় বাংলা ভাষায় সহজ সরলভাবে বিজ্ঞানসাহিত্য রচনা শুরু করেছে। বিজ্ঞানের লেখক হিসেবে খুব অল্পদিনের মধ্যেই সে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। এখনকার মতো তখন অসংখ্য বিজ্ঞানের লেখক ছিল না। এমনকি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার আন্দোলন' তখনও দানা বাঁধেনি। যে কতিপয় বিজ্ঞান লেখকের নাম তখন স্বীকৃত ছিল দ্বারিক গুপ্ত তার মধ্যে অন্যতম। যদিও বিজ্ঞানের লেখক হিসেবে দ্বারিকের পরিচিতি, তবুও তার মূল আবেগ ছিল কবিতার প্রতি। বাপী বেশ ভালই কবিতা লিখত। কিন্তু সেই কবিতাগুলি প্রকাশের ব্যাপারে তার এক আশ্চর্য জড়তা ও কুণ্ঠা ছিল। ফলে তার বেশিরভাগ কবিতা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। একদিকে সাচ্চা কমিউনিস্ট কর্মী, অন্যদিকে বিজ্ঞানের

একনিষ্ঠ সাধক ও লেখক এই চলছিল বাপীর জীবন। সেই সময় ভক্তিদি তার জীবনে প্রবেশ করেন। কিন্তু বাপী ঘর বেঁধেছে অনেক পরে। এখানে নয়, লন্ডন শহরে।

বাপী খুব গরিবের ছেলে। বিধবা মা আর এক ছোট বোন নিয়ে বাপীর সংসার। তাই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপীকে অর্থোপার্জনের পথ বেছে নিতে হয়েছে। অর্থ থাকুক বা না থাকুক বাপী সুন্দর রুচিশীলভাবে জীবনযাপন করতে জানত। বাপীর ঘরে ঢুকলে বৈশিষ্ট্যের ছাপ চোখে পড়বেই।

পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও গবেষক ড. কিংয়ের আমন্ত্রণে বাপী ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়াল পোস্ট গ্রাজুয়েট ইস্কুলে যোগ দেয়। সেই হল বাপীর প্রথম বিদেশযাত্রা। তারপরে বাপী আর পিছন ফিরে তাকায়নি। সে ক্রমশ সার্থক থেকে সার্থকতর জীবনের দিকে এগিয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার এক বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও অধ্যাপক ট্যানার শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে গবেষণা কাজের সঙ্গী হতে দ্বারিক গুপ্তকে আমন্ত্রণ জানান। এই দুই বিজ্ঞানীর যুগ্ম গবেষণায় শিশুর বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা এবং তার দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। টানা এগারো বছর এই দুই বিজ্ঞানী একই গবেষণাকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই গবেষণা চলাকালীনই ১৯৬৪ সালে ড. গুপ্ত এককভাবে আবিষ্কার করে 'অক্সিনডোল' নামে শিশুদের একটি নতুন উপাদান। এই গবেষণাকর্মের জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় বাপীকে পি-এইচ. ডি. উপাধি প্রদান করে।

বাপীর তখন বিশ্বজোড়া নাম। বিদেশে বসবাসকারী বন্ধুদের কাছ থেকে বাপীর সার্থকতার সংবাদ শুনে গর্বে বুক ভরে উঠত। ইতিমধ্যে ভক্তিদি কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরে এলেন। বাপীর একবছর আগেই ভক্তিদি বিলেত পাড়ি দিয়েছিলেন। দেশে ফিরে ভক্তিদি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোলপার্কে ভক্তিদি'র বাসস্থান তখন থেকে হল আমার নিয়মিত আড্ডার স্থল। ভক্তিদি'র দুই মেয়ে রুম আর ঝুম আমার খুবই আদরের। ছেলেবেলার মতো ওদের সঙ্গে এখনও আমার মধুর সম্পর্ক। রুমের পোশাকি নাম মিতা আর ঝুমের রত্না। সকলেই এখন লন্ডনের বাসিন্দা। ১৯৭১ সালে যখন আমি প্রথম লন্ডন শহরে যাই, তখন কয়েকদিন বাপীর বাসায় কি জমিয়ে আড্ডা মেরেছিলাম। কখনই মনে হত না লন্ডন শহর। মনে হত গোলপার্কে ভক্তিদি'র আস্তানায় জমাটি আড্ডা চলছে। আমার দুই প্রাণের বন্ধু ডা. বদিন মজুমদার ও তার স্ত্রী কৃষ্ণা মজুমদার। (লেখিকা হিসেবে যিনি কৃষ্ণা দত্ত নামে খ্যাত) বাপী-ভক্তিদি'র খুব কাছের মানুষ। বাপীর মৃত্যুসংবাদে কৃষ্ণা তো এতই ভেঙে পড়েছে যে ভক্তিদিকে সান্ত্বনা দিতে লন্ডন পাড়ি দিয়েছে।

১৯৭১ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় যোগ দিতে আমি যখন জার্মানি যাই তখন মেলায়

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন দেখি ভক্তিদি, কৃষ্ণা আর বদিন হাজির। দূরদর্শনের পঙ্কজ সাহাও লন্ডন থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট এসেছে। পঙ্কজ আমাদের সকলের খুব স্নেহের পাত্র। পঙ্কজ যখন প্রথমবার কলকাতা দূরদর্শনে ছিল বাপী কলকাতায় এলে তাকে নিয়ে একটি প্রোগ্রাম করেছিল। ওই একবারই বোধহয় বাপী তার কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিল। হোটেলে আমার ঘর পঙ্কজকে ছেড়ে দিয়ে আমি ভক্তিদি, কৃষ্ণা ও বদিনের সঙ্গে টুবিনগেন রওনা হলাম। বাপী অর্থাৎ ড. দ্বারিক গুপ্ত তখন টুবিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৯৬৯ সালে জার্মানির টুবিনগেন বিশ্ববিদ্যালয় যখন নিউরো-এনডোক্রিনোলজি বিভাগটি খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ড. গুপ্তকে এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদটির দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। বাপী সম্মত হয়। যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় ড. গুপ্তকে ডি. এস-সি. উপাধিতে সম্মানিত করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় বাপী অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করে। টুবিনগেন গেলে বাপী আমাকে সবকিছু বোঝাবার চেষ্টা করেছে। আমি কিছুই বুঝিনি। হেসে বলেছি আমার মতো মুখ্যু মানুষের এইসব দাঁতভাঙা নাম শুনে মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। বাপী তাতেও দমে যায়নি। পঞ্চাশের দশকের সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের লেখক ছিল তো সে! তাই আমার মগজে কিছুটা না ঢুকিয়ে থামেনি। বিজ্ঞান বিষয়ক যে দু'চারটি নামের উল্লেখ করেছি তা বোধহয় সেদিন বাপীর মগজ ধোলাইয়ের ফলশ্রুতি। ড. দ্বারিক গুপ্ত সম্পাদিত ও রচিত এক ডজনেরও বেশি বিজ্ঞানের বই দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কোনো বই প্রকাশিত হয়েছে ইংল্যান্ড থেকে, কোনোটি আমেরিকা থেকে আবার কোনোটি বা অস্ট্রেলিয়া কি জার্মানি থেকে। অতি সহজভাবে বাপী আমাকে বইগুলি দেখিয়ে দেখিয়ে ভিতরের বিষয়বস্তু বোঝাচ্ছিল। আমি নিশ্চুপভাবে তার উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম আর ভাবছিলাম কি অভাগা দেশে আমরা সব জন্মেছি। বিদেশে যার এত সম্মান দেশের মানুষ তাকে কোনোভাবেই চেনে না।

এখানে বামফ্রন্টের বিশ বছর শাসন হয়ে গেল। কত পুরস্কারের তো ছড়াছড়ি। যাদের আত্মত্যাগে নেতা মন্ত্রীদের এই সুখের জীবন তাঁরা কি কোনো ইতিহাসই জানেন না? জানলে বাপীর সন্ধান তাঁরা নিশ্চয়ই করতেন। জীবদ্দশায় বাপীকে এই সরকার যদি সম্মানিত করত, তাহলে যত বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করুক না কেন বামফ্রন্ট সরকারের সম্মানে সে নিশ্চয়ই খুব আলোড়িত হত। আর আমার মনে হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এই বিজ্ঞানীকে সম্মান জানাতে পারলে সরকার নিজেও সম্মানিত হতে পারত। যাক যা চলছে চলুক।

১৯৭১ সালে টুবিনগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাপী অবসর গ্রহণ করে লন্ডনের পাকাপাকি বাসিন্দা হয়। ইতিমধ্যে সে দু'বার কলকাতা ঘুরে গেছে। দেখা হয়েছে,

প্রাণখোলা আড্ডাও হয়েছে। কিন্তু চেহারার কোনো পরিবর্তন দেখিনি। বুঝিনি শরীরের মাঝে এই ভয়াবহ রোগ লুকিয়ে আছে। যার হাত থেকে বাপী রেহাই পেল না।

ভক্তিদি'র কথা আমার দারুণভাবে মনে পড়ছে। ভক্তিদি'র পাশে বসে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে দারুণ ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমি অসহায়। সুদূরে পাড়ি দেওয়ার কোনো সুযোগ বা সামর্থ্য কিছুই আমার নেই। ভক্তিদিকে চিঠি লিখবার জন্য কয়েকবার কাগজ কলম নিয়ে বসে কেবল কালির আঁচড়ই কেটেছি। চিঠি লিখতে পারিনি। কী লিখব, কী বলব। কিছুই আমার বলার নেই।

বাপী বেঁচে থাকবে তার আবিষ্কারে। তাকে মুছে ফেলবার ক্ষমতা কারোরই নেই। লন্ডনে 'ড. দ্বারিক গুপ্ত অ্যাওয়ার্ড' ঘোষিত হয়েছে, 'ড. দ্বারিক গুপ্ত সায়েন্টিফিক ফাউন্ডেশন' গঠিত হয়েছে। দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক পিটার ফেডর-ফ্রেবার্গ। যাঁদের করবার তাঁরা করছেন। এখানে কিছু হোক বা না হোক কী যায় আসে তাতে।

জীবনে যা সত্য তাকে গ্রহণ করতেই হয়। এই রূঢ় কঠিন সত্যের হাত থেকে কারোরই কোনো রেহাই নেই। জানি না আর কতকাল এই সত্যকে মেনে পথ চলতে হবে।

সুপ্রিয় সরকার

প্রকাশনা জগতে প্রবেশ করবার আগে আমার আদর্শ প্রকাশক ছিলেন এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স-এর সুধীরচন্দ্র সরকার। জ্ঞানী-গুণীজন পরিবেষ্টিত তাঁকে দূর থেকে দেখেছি। কাছে যেতে পারিনি, সাহস হয়নি।

সুধীরবাবু বসতেন পিছনের দিকে, সামনে বসতেন সুপ্রিয় সরকার। নানা পথ হেঁটে আমি যখন পাকাপোক্তভাবে প্রকাশনা জগতে এলাম সুধীরবাবু তখন গত হয়েছেন। পিছনে বাবার আসনে বসছেন সুপ্রিয় সরকার। বাবার মতো তিনিও ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। স্বাভাবিকভাবে তাঁরও কাছে যাওয়ার সাহস হয়নি।

যতদূর মনে পড়ে সুপ্রিয় সরকারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আমার এক মাসতুতো বোন, কলকাতা পুস্তকমেলায়। সে বছর সুপ্রিয় সরকার ছিলেন গিল্ডের সভাপতি। শ্বশুরবাড়ির সূত্রে সে ছিল সুপ্রিয়দার নিকট আত্মীয়া। আজ আমার সেই বোনও নেই, সুপ্রিয়দাও নেই।

পরিচয়েই শেষ, তারপর বিশেষ আর যোগাযোগ হয়নি। কাছাকাছি এলাম যখন আমরা কয়েকজন প্রকাশক মিলে 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকা প্রকাশ করলাম। সুপ্রিয়দাও আমাদের দলে যোগ দিলেন। সুপ্রিয়দাকে আমরা 'বাচ্চুদা' বলে ডাকতাম। আমাদের পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হল ব্রজকিশোর মণ্ডল। ব্রজকে আমরা অনেকদিন হারিয়েছি। চেহারায়, স্বভাবে, চলনে-বলনে ব্রজ ছিল একেবারে বেপরোয়া। ব্রজকে বলা হত 'বইপাড়ার দস্যু'। পত্রিকা প্রকাশের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে অতি তুচ্ছ একটি কারণে বেপরোয়া স্বভাবের ব্রজ বেপরোয়াভাবে সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়ে বসল। আমার সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ব্রজকে তার মত থেকে সরানো যায়নি। সেদিন নতুন সম্পাদক হিসেবে বাচ্চুদা বা সুপ্রিয় সরকারকে ঠিক করতে আমাদের এক মিনিটও সময় লাগেনি।

সম্পাদক হওয়ার পর থেকেই বাচ্চুদা এবং আমি পরস্পর কাছাকাছি আসতে শুরু করলাম। এতটা কাছাকাছি যে দুজনকে একসঙ্গে দেখলে মনে হত আমরা বুঝি ছোটবেলা থেকেই সম্পর্কিত। বাচ্চুদার সেই গাম্ভীর্যের মুখোশ কখন খসে পড়েছে তা তিনি টের পাননি, আমিও পাইনি। না জানিয়ে না বুঝিয়ে সময় আমাদের দুজনকে কাছাকাছি এনে দিল। যদিও বাচ্চুদা ছিলেন বয়সে আমার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়।

তারপর আমি আর বাচ্চুদা একসঙ্গে বিদেশ যাত্রা করলাম। প্রায় দেড়মাস আমরা একসঙ্গে থেকেছি, এক মুহূর্তের জন্যও কেউ কাউকে ছাড়িনি। আমরা দুজনে বিদেশ গিয়েছিলাম 'ফ্রাঙ্কফুর্ট গ্রন্থমেলা' উপলক্ষ্যে। সেই বছরের মেলার মূল বিষয় ছিল 'ভারতবর্ষ', অনেক লেখক ও প্রকাশক আমাদের মতো সেই বছর ফ্রাঙ্কফুর্ট গিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই ফ্রাঙ্কফুর্টে প্রায় সাতদিন জমে উঠেছিল জমাটি আড্ডা। প্রকাশকের

সংখ্যা ছিল খুব কম, লেখক ছিলেন অনেকে। শুধু আড্ডা নয়, বাচ্চুদা আর আমি ঘুরে ঘুরে দেশ-বিদেশের বই দেখতাম। কত জাতের কত স্বাদের বই! বাচ্চুদা পরবর্তীকালে যে কয়েকখানি সাড়া জাগানো অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তার মূল ভাবনা এসেছিল ওই ফ্রাঙ্কফুর্ট বই মেলা থেকে। বাচ্চুদার মুখ থেকেই আমার এই কথা শোনা।

একই হোটেলে একই ঘরে আমি ও বাচ্চুদা প্রায় সাতদিন ছিলাম। মেলা শেষ হলে তারপর বাচ্চুদাকে আমি নিয়ে যাই কোলনের কাছাকাছি বসবাসকারী আমার ছোটভাইয়ের কাছে। সেখানেও প্রায় সাত-আট দিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম। বাচ্চুদা আগে একবার জার্মানি এলেও এদিকটায় আসেননি। তাছাড়া বাচ্চুদার সে যাত্রা ছিল আমন্ত্রণের, বাঁধাধরার ছকে ঘোরাফেরা, এমন খোলামেলা নয়। ছোটভাই যখন আমাদের গাড়িতে জার্মানির গ্রাম দেখার প্রস্তাব দিল আমরা লাফিয়ে উঠলাম। প্রাণভরে আমরা দুজনে সেদিন জার্মানির আশ্চর্য উন্নত বেশ কয়েকটি গ্রাম দেখেছিলাম।

জার্মানি ছেড়ে আমরা একসঙ্গে প্যারিস যাই। দুজনেই আগে বিদেশে এলেও কখনও প্যারিসে আসিনি। প্যারিসে আমরা উঠেছিলাম একটি বড়সড় হোটেলে। আদবকায়দাই আলাদা। আমার মতো গেঁয়োভূতের গলা শুকিয়ে কাঠ। বাচ্চুদা বড় পরিবারের ছেলে, অনেক আদবকায়দা জানেন, তিনিও মাঝে মধ্যে ঘাবড়ে যেতেন। রাতে হোটেলে ফিরে নিজেদের বোকামির কাণ্ডকারখানা নিয়ে আমরা দুজনে খুব হাসাহাসি করতাম। দমবার পাত্র নন বাচ্চুদা। প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন আদবকায়দায় তিনি কোনও ভুল করেননি, অবশ্য মজা করে। বাচ্চুদা ছিলেন জাত রসিক, ঠিক সমপরিমাণ পরিশীলিত। দুজনেরই ইচ্ছা প্যারিসে সব ধরনের নাইট ক্লাবে যাব। হোটেলের অভ্যর্থনা থেকে কার্ড আনিয়ে নাইট ক্লাবের খরচার সঙ্গে আমাদের গাঁটের জোর মিলিয়ে আমরা হিসেব করলাম। শেষ পর্যন্ত দেখলাম একটির বেশি ক্লাবে যাওয়ার আর্থিক ক্ষমতা আমাদের নেই। বাচ্চুদা এখানে বড়লোক হলে কি হবে ওখানে তখন আমি বাচ্চুদার চেয়ে অনেক বড়লোক। জার্মানি থেকে আসার সময় আমার ধনী ছোটভাই আমার দুই পকেট ডলারে ভর্তি করে দিয়েছে। ঠিক হল নাইট ক্লাবের খরচা আমাকেই বহন করতে হবে। কপাল মন্দ হলে যা হয় তাই ঘটল। আমার এক পুরানো বন্ধু কবি সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় হোটেলে এসে হাজির। সুপ্রিয় ফরাসি এক মহিলাকে বিয়ে করে প্যারিসের বাসিন্দা। দারুণ নীতিবাগীশ, আমরা নাইট ক্লাবের কথা বলতেই ক্ষেপে লাল। দেশে থাকতে সে বাচ্চুদারও পরিচিত ছিল, খুব শ্রদ্ধা করত। বলল, বাচ্চুবাবু, আপনারও কি ওই চ্যাংড়ার মতো মাথা খারাপ হয়ে গেল। মনে মনে বললাম 'একেই বলে কপাল'। সুপ্রিয় আমাদের নিয়ে রোজই বেরিয়ে যেত প্যারিসের দ্রষ্টব্য স্থান দেখাতে। লেখক-শিল্পীদের আড্ডাস্থানে নিয়ে যেত, শিল্পকলা বোঝাত। দুজনের মুখে হাসি থাকলেও অত গুরু গম্ভীর পরিবেশে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। রাতে হোটেলে ফিরে দুজনে কবির শ্রাদ্ধ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তাম। নাইট ক্লাবে না যাওয়ার এই শোক বাচ্চুদা এবং আমি দুজনেই ভুলতে পারিনি।

প্যারিস থেকে আমরা দুজনে লন্ডন গেলাম। সেখানে উঠলাম আমার পুরানো বন্ধু ডাক্তার বদিন মজুমদার-এর বাড়িতে। বদিনের স্ত্রী কৃষ্ণাও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। কৃষ্ণা স্বীকৃত লেখিকা। বাচ্চুদা আমার সঙ্গে যাচ্ছেন একথা আমি প্যারিস থেকে বদিনকে জানিয়েছিলাম। বাচ্চুদা অন্য এক জায়গায় থাকবার জন্য স্থির করেছিলেন, কিন্তু সেখানে একরাতের বেশি থাকেননি। বদিনের বাড়িতে জমাটি আড্ডার লোভ বাচ্চুদা ত্যাগ করতে পারেননি। বিদেশে বসবাসকারী বাঙালিরা অতিথিদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও বদিন-কৃষ্ণা অন্যরকম। লন্ডনে আমরা বেশিদিন ছিলাম। তারপর আমরা একসঙ্গে দেশে ফিরে আসি।

দু-চার বছরের মধ্যে বদিন-কৃষ্ণাও স্থায়ীভাবে দেশে ফিরে আসে। বদিনের বাড়িতে শুরু হয় আবার এক আড্ডার আসর, প্রতি বুধবার সন্ধ্যায়। বাচ্চুদাও সেই আড্ডার স্থায়ী সদস্য হয়ে যান। বুধবারে বাচ্চুদাই আমাকে তুলে নিয়ে যেতেন বদিনের বাড়িতে। ধীরে ধীরে নানা ভেজালের চাপে আমার যাওয়া কমতে থাকে। বাচ্চুদা কিন্তু একদিনের জন্যেও সেই আড্ডা ছাড়েননি। ইতিমধ্যে বাচ্চুদার সঙ্গে বদিনের সম্পর্ক অনেক গভীর হয়েছে। দুজনেই প্রায় সমবয়সী। বাচ্চুদাবিহীন সেই আড্ডার আসর আজ নিষ্প্রভ। সেই আড্ডায় আলোচনা হত না এমন কোনও বিষয় বোধহয় পৃথিবীতে নেই।

বাচ্চুদার মতো নম্র ভদ্র পরিশীলিত ব্যক্তিত্বের মানুষ আমি জীবনে কম দেখেছি। কখনও তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনিনি, রাগের কোনও প্রকাশ কখনও দেখিনি। কঠিন শোকেও বাচ্চুদাকে দেখেছি শান্ত ঋজু দৃঢ়, আনন্দেও দেখেছি নিশ্চুপ। বাচ্চুদা ছিলেন চাপা স্বভাবের মানুষ। আমার মতন তাঁরা দু-একজন যাঁর খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছে তাদের কাছে ব্যক্তিগত বিষয়ে তিনি কখনও কখনও মুখ খুলেছেন। তবে খুব সামান্য।

তরুণ বয়সে দূর থেকে শ্রদ্ধার চোখে যে বাচ্চুদাকে দেখেছিলাম, পরবর্তীকালে ভালবাসায় যে বাচ্চুদাকে অতি আপনজন হিসেবে অনুভব করেছিলাম, সুখে দুঃখে যাঁর কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারতাম, সেই বাচ্চুদা আজ কৌতুকভরে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। নিজ বাসগৃহে শায়িত তাঁর হিমশীতল দেহটির দিকে তাকিয়ে অনুভব করছিলাম, বাচ্চুদা বুঝি ঘুমোচ্ছেন। এক্ষুনিই বুঝি উঠবেন। উঠেই ঠোঁটের কোণে দুষ্টু দুষ্টু হাসি এনে বলবেন, এত লোক আমাকে ভালবাসে!

বাচ্চুদা ছবি হয়ে গেলেন। একে একে আমরা সবাই ছবি হয়ে যাব। যিনি আগে ছবি হন তিনিই ভাগ্যবান। আমরা যারা এখনও ছবি হতে পারিনি তারা অন্যের ছবির দিকে তাকিয়ে জোর করে কান্নাকে চেপে রাখি। বাচ্চুদা ভাগ্যবানদের দলে নাম লেখালেন। আর আমি রয়ে গেলাম হতভাগোর দলে।

মুজফ্‌ফর আহমেদ

চোখ বুজলে সেদিনের সেই দিনগুলি আমার চোখের সামনে খেলা করে। বৃষ্টির ফোঁটার মতো নেচে নেচে। আগুনে স্যাঁকা সেই সব দিন!
কত পথ পেরিয়ে এলাম। নিজেকে না জানিয়ে না বুঝিয়ে কত বছর কেটে গেল! কখনও মনে হয় না সময় এত দীর্ঘ।

সময়টা ১৯৪৯। কমিউনিস্ট পার্টি সবে বেআইনি ঘোষিত হয়েছে। কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে পি. সি. যোশিকে সরিয়ে সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বি. টি. রণদিভে। শ্লোগান উঠেছে—'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'। কতই আর তখন আমার বয়স! আঠারোয় পা দিয়েছি। সামনেই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। অথচ নিজের অজান্তেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। ১৯৪৯ সালে ৯ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি রেল ধর্মঘটের ডাক দিল। ধর্মঘটও বেআইনি ঘোষিত হল।

আমাদের ছাত্রদের ওপর দায়িত্ব পড়ল বেআইনি সেই ধর্মঘটের প্রচারে। শ্রমিক নেতা ও অন্যান্য কর্মীরা তো ছিলেনই। লিলুয়ায় প্রচার করতে গিয়ে আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। আমাকে কিছুদিন হাওড়ার মল্লিকফটক জেলে আটকে রেখে দমদম জেলে নিয়ে যাওয়া হল। আর সেখানেই আমি দিনের স্পষ্ট আলোয় খোলা চোখে একটি স্বপ্ন দেখলাম।

মল্লিকফটকের সঙ্গে দমদম জেলের আকাশ-পাতাল তফাত। পাঁচিল ঘেরা একটা পৃথক পৃথিবী। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ, যাঁদের পুলিশ প্রথমে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তাঁদের বেশিরভাগই তখন ছিলেন এই দমদম জেলে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সর্বজনশ্রদ্ধেয়, কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ মুজফ্‌ফর আহমেদ তখন দমদম জেলে। পার্টির সকলের কাছে তিনি 'কাকাবাবু' নামে পরিচিত। সকলের কাছে তাঁর কাকাবাবু নামটি কীভাবে হয়েছিল সে-কথা আমার মতো ছেলেমানুষের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি কিছুকাল আগে সদ্যপ্রয়াত প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ডা. রণেন সেনের মুখ থেকে কারণটি আমি জেনেছিলাম। তিনি তাঁর 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সে-কথা লিখে গেছেন। কাকাবাবু নাম কি করে হল সেই প্রসঙ্গে ডা. রণেন সেন বলেছেন, 'কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদের সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ড ডেনে থাকার সৌভাগ্য আমার একবারই হয়েছিল (১৯৪০)। তিনি আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাই ডেনে একটা পারিবারিক প্রলেপ লাগাবার জন্য আমরা তাঁকে কাকাবাবু বলে ডাকতে শুরু করি। তারপর থেকেই পার্টির সর্বত্র ও সর্বস্তরে তাঁকে 'কাকাবাবু' বলে ডাকা শুরু হল। কনিষ্ঠদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কাকাবাবুসুলভই ছিল।'

জেলে তখন দুই স্তরের রাজনৈতিক বন্দি। বিনা বিচারে এবং বিচারাধীন। আমি হলাম বিচারাধীন বন্দি। অসত্যই ভরা আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ। তাই আমাকে নির্দিষ্ট দিনে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। আমি বেল-এ মুক্তি পেলেও পেতে পারি। কিন্তু বিনা-বিচারে বন্দিদের অনেকগুলি সুযোগ ছিল। জেলে থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য খরচ খরচার জন্য তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ ছিল। হাতে টাকা না পেলেও তাঁদের ইচ্ছা মতোই সেই টাকা খরচের নিয়ম ছিল।

জেলের মাঝেই দুইটি শিবির। রাজনৈতিক শিবির একেবারে পৃথক। সাধারণ কয়েদিরা সেই শিবিরকে দেখত অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে। বিচারাধীন বন্দিদের ঠিক রাজনৈতিক শিবিরে থাকবার কথা নয়। মল্লিকফটক জেলে এ-সুযোগ আমাকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু দমদমের জেল কমিটি এই দাবি আদায় করে নিয়েছিল। তবে স্বাভাবিকভাবে দাবি গৃহীত হত তা কিন্তু নয়। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রায় পৃথকভাবে দাবি আদায় করে নিতে হত। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল আমার ক্ষেত্রে। আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ছোকরা-ফাইলে। ছোকরা-ফাইল এক নরকক্ষেত্র। সে জ্ঞান অবশ্য আমার ছিল না, আমি পরে জেনেছি। বয়সে যারা ছেলেমানুষ তাদেরই পাঠিয়ে দেওয়া হয় ছোকরা-ফাইলে। ঘোষিত উদ্দেশ্য অবশ্য খুব মহৎ। ছেলে মানুষদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। কিন্তু পরিণতি ভয়াবহ। প্রতিটি ছেলেমানুষকেই হতে হয় যৌনাচারের শিকার। সমকামিতার বলির পাঁঠা। আমার সৌভাগ্য সেই নরকের মাঝে আমাকে পড়তে হয়নি।

আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে আমাকে কয়েকজন মিলে কাকাবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। কাকাবাবু তখন প্রশস্ত একটি বারান্দার এক কোণায় হাতলওলা চেয়ারে বসেছিলেন। পরনে ঘিয়ে রঙের ট্রাউজার্স ও পুরো হাতা শার্ট। মহম্মদ আলি পার্কে আমি দূর থেকে কাকাবাবুকে দেখেছিলাম, কিন্তু সামনাসামনি দাঁড়িয়ে দেখবার সৌভাগ্য এই প্রথম। সামনের একটি চেয়ারে কাকাবাবু আমাকে বসতে বললেন। তখন বোধহয় বেলা এগারোটা-বারোটা হবে। কাকাবাবু বসেছিলেন কিচেনের সামনের বারান্দায়। দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করবার পর কাকাবাবু একজনকে ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাজির। তাঁকে আমি চিনি না। সত্যি কথা বলতে কি আমি কাউকেই চিনি না। আমি যখন পুরোদমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি তখন সবাই তো জেলে বা আন্ডারগ্রাউন্ডে। দেখলাম, প্রায় ছ'ফুট লম্বা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কুচকুচে কালো রঙের এক ভদ্রলোক কাছে এসে দাঁড়ালেন।

কাকাবাবু বললেন, ইলিয়াস, একে সঙ্গে করে নিয়ে যান। প্রয়োজনীয় জামা কাপড় সব কিছু কিনে দিন। ভদ্রলোক আমাকে হাত ধরে টেনে তুলে জেল গেটের দিকে এগিয়ে চললেন। ইনিই হলেন মহম্মদ ইলিয়াস। পরবর্তীকালে আমার ইলিয়াসের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক হয়েছিল এবং সে সম্পর্ক তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত টিকে ছিল। ইলিয়াস ছিলেন একজন শ্রমিকসন্তান এবং নিজেও শ্রমিক। কমরেড ইলিয়াসকেও আমি

সারাজীবন শ্রদ্ধা করে এসেছি। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রথম সারির ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।

কলকাতায় তখন বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল দোকান ছিল কমলালয় স্টোর্স। দমদম জেলে ছিল তাদের শাখা। বিনা বিচারে বন্দিদের যা কিছু প্রয়োজন তারা এই কমলালয় স্টোর্স থেকেই কিনতেন। তাঁদের প্রাপ্য থেকেই এইসব দাম পরিশোধিত হত। বিচারাধীন বন্দি হিসাবে আমার কিছু পাওনা নয় সেকথা আগেই বলেছি। তাই অন্যের প্রাপ্য থেকে ইলিয়াস আমাকে নানারকমের জিনিস কিনে দিলেন। শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, রুমাল, তোয়ালে আরও কত কিছু। জিনিসপত্র নিয়ে আমরা আবার কাকাবাবুর কাছে ফিরে এলাম। আমি কোথায় থাকব সে-কথা ইলিয়াস কাকাবাবুকে বলে দিলেন। কমরেড ইলিয়াস আমাকে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গেলেন এবং সেটিই হল আমার নতুন আস্তানা। আমার চেয়ে সামান্য কিছু বয়সে বড় আরেকটি ছেলেকে দেখে ইলিয়াস আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা দুজন একসঙ্গে থাকবে।' ছেলেটির নাম শিবা, পুরো নাম সুহৃদ ঘোষ। হাওড়ার ছেলে। ইলিয়াসও হাওড়ার। শিবাও আমার মতন বিচারাধীন বন্দি। ধরা পড়েছে মাস তিনেক আগে। শিবা আর আমি গভীর বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হলাম। এবং আমরা দুজনেই কাকাবাবুর প্রিয়পাত্র ছিলাম। শিবা অবশ্য অহরহ হাসতে হাসতে অভিযোগ করত আমার ওপর কাকাবাবুর পক্ষপাতিত্ব নাকি একটু বেশি। ঠিক জানি না। আমার তো মনে হত কাকাবাবুর স্নেহ থেকে কোনও কমরেডই বঞ্চিত হতেন না। তবে যেহেতু বয়সে ছিলাম আমি সবচেয়ে ছোট তাই স্নেহের প্রকাশ একটু বেশি হতেই পারে।

বিচারাধীন বন্দি হিসাবে দমদম জেলে আমার প্রায় চার মাস কেটেছিল। দীর্ঘ এই সময়ে আমি কাকাবাবুর আরও কাছে চলে আসি। আমার খুব অবাক লাগত কাকাবাবু আমার সঙ্গে কখনও রাজনীতির কথা সেভাবে আলোচনা করতেন না। আমি প্রসঙ্গ তুললে অবশ্য জবাব দিতেন। আমি বুঝতে পারছিলাম জেলের মাঝে একটা আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। কাকাবাবুর নেতৃত্বে উচ্চতর জেল কমিটি ছাড়া সে কথা কেউই জানতেন না। সকলেই আমার মতো অনুমান করছিলেন। সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত দমদম জেলের সেই আন্দোলন মুখোমুখি সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। অনশনরত বন্দিদের ওপর পুলিশ শুধু নির্মমভাবে লাঠি চালনা নয়, গুলিও চালিয়েছিল। তখন অবশ্য আমি আর জেলে ছিলাম না। অল্প কিছু দিন আগে জামিনে মুক্তি পেয়েছি। বাইরে থেকে এই সংবাদ শুনে উদ্বেগে আমি ঘুমোতে পারতাম না। আমার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠত কাকাবাবুর মুখ।

কাকাবাবু আমার মামারবাড়ির অনেককে চিনতেন। তাঁদের গল্পও মাঝে মাঝে আমাকে করতেন। কাকাবাবুকে আমার আপন পিতৃব্য ছাড়া কিছুই মনে হত না। জেলে চার মাসের জীবনে আমি কাকাবাবুর যে সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম তা আমাকে মানুষ হিসেবে পরবর্তী জীবনে অনেক সাহায্য করেছে। যদিও কাকাবাবুর সঙ্গে সান্নিধ্যে এই

আমার শুরু, শেষ এখনও অনেক বাকি। জেল জীবনের কত টুকিটাকি ঘটনা মনে পড়ে। সারাটা সকাল ও বিকেল কাটত কাকাবাবুর সঙ্গে। কত রকমের পারিবারিক গল্প! কাকাবাবু তাঁর ছেলেবেলার গল্প করতেন মাঝে মধ্যে। পরবর্তীকালে কাকাবাবুর ছেলেবেলার সেই গল্প আমি কাজে লাগিয়েছি। ১৯৫২ সালে আমি ছোটদের পত্রিকা 'আগামী' প্রকাশ করি। পরের বছর শারদীয় সংখ্যায় কাকাবাবু লেখেন—'আমার ছেলেবেলা'। সেই সংখ্যাটি প্রচুর বিক্রি হয়েছিল। কাকাবাবুর ছেলেবেলার কথা এর আগে কেউ জানতেন না।

কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে আমি তো কিছুই জানি না। এত কাছে পেয়েছি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাকে! তিনিও এত কাছে টেনে নিয়েছেন আমাকে! তাই আমার জানবার আগ্রহের শেষ নেই। কাকাবাবু যে সবসময় আমার প্রশ্নের জবাব দিতেন তা নয়। কখনও মৃদু হাসতেন কখনও বলতেন পরে বলব। আবার অনেক প্রশ্নের উত্তরও দিতেন। কাকাবাবু কাউকে তুমি সম্বোধন করতেন না। আমি অবশ্য শুনিনি। আমার মতন ছেলেমানুষকেও আপনি সম্বোধন করতেন। আমি বলেও লাভ হয়নি। শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে 'আপনি' সম্বোধনই করতেন।

কাকাবাবু বিশেষভাবে নজর দিতেন আমার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, খেলাধুলোর দিকে। খেলাধুলোয় চিরকালই আমি অপটু। তবু বিকেলের দিকে শিবাকে ডেকে আমাকে খেলতে পাঠাতেন।

কাকাবাবু বেশি করে জিজ্ঞেস করতেন আমার মায়ের কথা। আমার মামার বাড়ি যে কাকাবাবুর খুব পরিচিত সেকথা তো আগেই বলেছি। বনগাঁর বিখ্যাত উকিল পরিবার আমার মামার বাড়ি। মায়ের কথা আমি কাকাবাবুকেও বলতাম।

মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, এখানে মায়ের কথা মনে পড়ে কিনা, আমি মাথা নীচু করে থাকতাম।

আমার মায়ের সঙ্গে পরবর্তীকালে কাকাবাবুর খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেকথা পরে বলছি।

তারপর বেশ কিছুকাল কেটে গেছে। কমিউনিস্ট পার্টি আর বেআইনি নেই। আমি তখন বাস করছি পার্কসার্কাসে। ওপার বাংলা থেকে মা-বাবা চলে এসেছেন। আমাদের পুরো সংসার। কিন্তু এই পুরো সংসার বেশিদিন টিকল না। কলকাতায় আসবার ছ-মাসের মাথায় বাবা চলে গেলেন। কাকাবাবু সংবাদটি পেয়েছিলেন অনেক পরে।

পার্ক সার্কাস অঞ্চল তখন খুব রমরমা। অনেক গুণী মানুষের বাস এই অঞ্চলে। একই বাড়িতে বাস করতাম আমরা আর বিখ্যাত চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন। মৃণালদা থাকতেন সামনের দিকের দোতলায় আর আমরা থাকতাম পিছন দিকের এক তলায়। পার্ক সার্কাসে তখন বাস করছেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, আবু সইদ আয়ুব, কাজি আব্দুল ওদুদ, পারভেজ শাহিদি, গোলাম কুদ্দুস, বরেন বসু আর কাকাবাবু। কাকাবাবু থাকতেন

কড়েয়া রোডের পার্টি কমিউনে। বেশ কিছুকাল ব্যবধানের পর কাকাবাবুর সঙ্গে পুনরায় আমার সম্পর্ক স্থাপিত হল। তখন আমি আর ছাত্র আন্দোলনে নেই—প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের কর্মী। কাকাবাবুর কাছে নিয়মিত যাতায়াত শুরু হল।

প্রায় প্রতিদিন সকালে আমি কাকাবাবুর কাছে যেতাম। একসঙ্গে চা-টোস্ট খেতাম। সকাল আটটার মধ্যেই কাকাবাবু স্নান সেরে ফিটফাট। কাকাবাবুর সকালের খাবার দুটি টোস্ট ও এক কাপ চা। আমার জন্যও একই বরাদ্দ।

তখন পুনরায় কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। ৩৩ নম্বর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে পত্রিকার কার্যালয়। কাছেই ৬৪ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোড, যা আজ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড বলে পরিচিত—পার্টির প্রাদেশিক কার্যালয়। সেই সময় কাকাবাবু একদিন আমাকে প্রাদেশিক কার্যালয়ে ডেকে পাঠালেন। কী একটি কাজের চাপে তখন কদিন সকালে কাকাবাবুর কাছে যেতে পারিনি। আমাকে এসে সংবাদ দিলেন অধীর চক্রবর্তী। আমাকে যে পার্টি থেকে একটি প্রস্তাব দেওয়া হবে সে-কথা আগেই অধীরদা জানিয়ে দিলেন। অধীরদা ছিলেন 'স্বাধীনতা' পত্রিকার চিফ-রিপোর্টার। অধীরদাও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর সঙ্গেও আমার আমৃত্যু সম্পর্ক ছিল। তিনি আমাকে হাতে ধরে সাংবাদিকতা শিখিয়েছিলেন।

যা হোক কাকাবাবুর কাছে গেলে আমাকে একটি প্রস্তাব দেওয়া হল। প্রস্তাবটি অবশ্য কাকাবাবু না দিয়ে দিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। প্রমোদদারও আমি খুব কাছের মানুষ ছিলাম। খুবই স্নেহ করতেন আমাকে। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার দায়িত্বে তখন ছিলেন প্রমোদদা। যতদূর মনে পড়ছে জ্যোতি বসু তখন রাজ্য সম্পাদক। আমাকে বলা হল 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ছোটদের বিভাগ 'কিশোরসভা' শুরু করতে হবে। প্রথম যুগের স্বাধীনতায় 'কিশোরসভা' শুরু করেছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর মৃত্যুর পর বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর অবশ্য পার্টি বেআইনি ঘোষিত হওয়ায় স্বাধীনতা পত্রিকাও বন্ধ হয়ে যায়। যেহেতু আমি ছোটদের পত্রিকা 'আগামী' প্রকাশ করছি তাই আমাকেই দায়িত্বভার দেওয়ায় আমি দায়িত্ব নিতে দ্বিধা করছি দেখে প্রমোদদা বললেন, তোমার অত ভাবনার কিছু নেই, তোমাকে প্রয়োজনে সাহায্য করবেন বরেন বসু ও নরেন মল্লিক। এসব কথা তো অধীরদা আগেই বলে গিয়েছেন। সবই আমার জানা। বরেনদা, নরেনদা প্রথমদিকে পরিকল্পনায় থাকলেও বিশেষ সময় দিতে পারেন নি। আমরা স্থির করে নিয়েছিলাম পরিচালক হিসাবে আমরা কারও নাম ব্যবহার করব না। পরিচালকের নাম হবে 'কিশোর-ভাই'।

সেদিনের 'কিশোরসভা' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমরা অনেক ছেলেমেয়েকে সভার সদস্য করেছিলাম। 'আগামী' আর 'কিশোরসভা' একসঙ্গেই কাজ করত। যাঁরা কখনও ছোটদের জন্য লেখেননি এমন অনেককে দিয়ে আমি কিশোরসভা বিভাগে লিখিয়েছিলাম। কাকাবাবু আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। বলতেন, খুব ভাল পাতা হচ্ছে। প্রমোদদার কাছ থেকেও সব সময় প্রেরণা পেয়েছি। কিশোরসভা বিভাগ পরিচালনার

জন্য আমাকে প্রায় প্রতিদিনই স্বাধীনতা পত্রিকা অফিসে যেতে হত। আজ এই সুদীর্ঘকাল পরে ভাবতে অবাক লাগে জীবনে কী উৎসাহ আর প্রেরণা পেয়েছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের কাছে! কিশোরসভা ভালভাবে দাঁড়িয়ে যাবার পর আমাকে সাংবাদিক তৈরি করার জন্য রিপোর্টিং বিভাগে দেওয়া হল। অবশ্য আমার সম্মতি নিয়েই। আমি আগেই কিশোরসভা ছাড়বার জন্য সরোজ মুখোপাধ্যায়কে বলছি। সরোজদা হয়তো আলোচনা করেছেন। প্রমোদদা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার কোনও আপত্তি আছে কিনা। আমি না করিনি। নতুন ধরনের কাজ শিখবার একটা উৎসাহ অনুভব করছিলাম। প্রমোদদা অবশ্য বলে দিয়েছিলেন নতুন যে আসছে তুমি তার পাশে থেকে কাজ শিখিয়ে দিও। আর ওপর থেকে তাকে সবসময় সাহায্য কোরো। ছোটদের ব্যাপারটা আমার মনের ভিতরের ব্যাপার, আমার আপত্তির কিছু ছিল না। তা ছাড়া 'আগামী' তো আমি সম্পাদনা করছিই। কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম আমাকে সাংবাদিক করবার পিছনে কাকাবাবুর সম্মতি আছে।

স্বাধীনতা পত্রিকা তখন অবশ্য আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে নেই। ঝকঝকে তকতকে কার্যালয় হয়েছে পার্ক লেনে। চীন থেকে নতুন রোটারি মেশিন এসেছে। আমাদের সকলের গভীর উৎসাহ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাকাবাবু বসতেন পার্ক লেনে। ঠিক জেলের মতো বারান্দায় চেয়ার টেনে। আমার মা-ও তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা। বাবার মৃত্যুর পর মা যখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন তখন তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। মা পার্ক সার্কাসে মুসলিম বস্তি অঞ্চলে মহিলা সমিতি করতেন। কাকাবাবুর সঙ্গে মায়েরও নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। মনে আছে, মাকে বলে একবার কাকাবাবু জোর করে তখনকার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডা. জ্ঞান মজুমদারের কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। হোমিওপ্যাথির ওপর আমার কোনও বিশ্বাস নেই জেনে মাকে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন কাকাবাবু। আমি তখন খুব পেটের গোলমালে ভুগছিলাম।

আরও মনে পড়ে, আমার ছোটভাই জার্মানি যাওয়ার সুযোগ পেয়েও যখন গ্যারান্টারের অভাবে পাসপোর্ট করাতে পারছে না তখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কাকাবাবু। এখনকার মতো তখন পাসপোর্ট পাওয়া অত সহজ ছিল না। যিনি গ্যারান্টার হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর নামটাও আমার মনে আছে। তিনি হলেন মনোরঞ্জন রায়। বড় ব্যবসায়ী। 'মার্কসবাদী দর্শন' নামে একটি বই লিখে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। সফল ব্যবসায়ী হলেও মনোরঞ্জনবাবু ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে কাকাবাবুর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার ছোটভাই জার্মানিতে আজ খুব সফল ব্যক্তি। কাকাবাবু যদি পাশে না দাঁড়াতেন সে আজ কোথায় ভেসে যেত। আমি এমন অসংখ্য মানুষের কথা ব্যক্তিগতভাবে জানি যারা কাকাবাবুর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। কাকাবাবুর প্রশ্রয় না পেলে আমি নিজেও-বা কোথায় ভেসে যেতাম কে জানে!

আমি বইপাড়ায় প্রথম এলাম কাকাবাবুর সাহায্যে। ৬০ নম্বর পটুয়াটোলা লেনে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির একটি ঘর ছিল। কাকাবাবু সেই ঘরটিকেই 'আগামী'-র কার্যালয় করে দিলেন। অল্প কিছুদিন ওই ঘরে থাকবার পর পাশের বাড়ি ৫৯ নম্বরে 'আগামীর' কার্যালয় হল। সেও কাকাবাবুর সহায়তায়। দুটি বাড়ির মালিক ছিলেন একজনই। তিনিও ছিলেন পার্টির লোক। নাম সলিল ঘোষ। ৫৯ নম্বরে কাকাবাবুর করে দেওয়া সেই আস্তানা আজও আমার তত্ত্বাবধানে আছে। মনে আছে কাজের সুবিধা হবে ভেবে কাকাবাবু একটা টেলিফোন আমাকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। তখন টেলিফোন পাওয়া অত সহজ ছিল না। রবি রায় নামে একজন বিধায়কের টেলিফোন কাকাবাবু আমাকে দিয়েছিলেন। শুধু কার্যালয়ই তৈরি করে দেননি, নতুন কার্যালয়ে আসবার পর সেই বছর আমরা বেশ বড় করে 'বার্ষিক আগামী' প্রকাশ করেছিলাম। শারদীয় সংখ্যা নাম না দিয়ে আমরা 'বার্ষিক আগামী' নাম দিয়েছিলাম। একেবারে বইয়ের মতো বোর্ড বাঁধানো। বিশাল ওই সংখ্যাটিতে অসংখ্য ছবি এঁকেছিল পূর্ণেন্দু পত্রী। 'বার্ষিক আগামী'র সমস্ত খরচ-খরচা কাকাবাবুর নির্দেশে বহন করেছিল ন্যাশনাল বুকে এজেন্সি।

পরেও নিয়মিত 'আগামী' পত্রিকার জন্য আমি কাকাবাবুর সাহায্য পেয়েছি। পত্রিকা যাতে সংগঠিত হয়ে চলতে পারে সেই কারণে 'আগামী'র জন্য একটি পৃথক পার্টি ইউনিট করে দেওয়া হয়েছিল। সব কিছুই কাকাবাবু আর প্রমোদদার সহায়তায়। পার্টি থেকে আমাদের নবগঠিত সেই ইউনিটের দায়িত্বে ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ।

আমি তখন আর পার্ক সার্কাসে থাকি না। বালিগঞ্জ প্লেসে উঠে এসেছি। প্রায়ই সকালের দিকে কাকাবাবুর কাছে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সারতাম। সন্ধ্যার সময় স্বাধীনতা অফিসে তো দেখাই হত। আমি তখন বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন নিয়ে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় রিপোর্টাজ লিখছিলাম। পরিচালনা অধীর চক্রবর্তীর। কাকাবাবু আমার লেখাগুলি খুব পছন্দ করছিলেন এবং প্রায়ই উৎসাহ জোগাতেন। রিপোর্টিংয়ের কাজও আমি ভালই শিখে গিয়েছিলাম। একদিকে 'আগামী' পত্রিকা অন্যদিকে স্বাধীনতার কাজ। আমার কিন্তু কখনও ক্লান্তি লাগত না।

'আগামী'র কাজ দ্রুত করবার জন্য পটুয়াটোলা লেনে আমি যে ছাপাখানা গড়ে তুলি তারও পিছনে আছে কাকাবাবু ও প্রমোদদার সহায়তা। প্রথম সব টাইপ এসেছিল গণশক্তি প্রিন্টার্সের মাধ্যমে। কাকাবাবু ও প্রমোদদা উভয়েই মুদ্রণশিল্প সম্পর্কে পারদর্শী ছিলেন। আমাকে হাতে ধরে মুদ্রণের কাজ শিখিয়েছেন।

আজ নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয় যখন ভাবি কাকাবাবু আর প্রমোদদার সাহায্যে গড়া সেই ছাপাখানাই পার্টি দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সংঘর্ষ সব ওলট-পালট করে দিল। ঘটনাটি যখন ঘটে তখন আমি রানিক্ষেতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কমিউনিস্ট নেতা প্রশান্ত শূরও ওই সময় রানিক্ষেতে ছিলেন। মনে আছে মুন হোটেলের চাতালে দাঁড়িয়ে আমি প্রশান্তদার সঙ্গে

কত আলোচনা করতাম। একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ যে আক্রমণ করতে পারে আমি তা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। প্রশান্তদা আমাকে বুঝিয়েছিলেন চীন কখনও আক্রমণ করেনি, সবই ভারত সরকারের পরিকল্পিত চক্রান্ত। সেই বিশ্বাস বুকে বেঁধে আমি কলকাতা ফিরে এসেছিলাম। না ফিরে উপায় ছিল না, কারণ মিলিটারি সকল পর্যটককে ফেরত পাঠাচ্ছিল। কলকাতায় ফিরবার পর আমি হতবাক—কলকাতা কেমন যেন পাল্টে গেছে। বেশ পরিকল্পিতভাবে সংবাদমাধ্যম কমিউনিস্ট বিরোধিতা জাগিয়ে তুলেছে। নানা দিকে কমিনিউস্টদের ওপর চলছে আক্রমণ। আমার ছাপাখানাও একদিন আক্রান্ত হল। পাড়ার লোকের সহযোগিতা না থাকলে সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত। কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত। কাকাবাবু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু প্রমুখেরা জেলের অভ্যন্তরে। আশ্চর্যজনকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়নি ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখকে। আমি একেবারে বিভ্রান্ত। কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। এই সময় 'সাপ্তাহিক কালান্তর' পত্রিকা প্রকাশের তোড়জোড় চলছিল। সামনে ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ। পিছনে তদানীন্তন সকল সি.পি.আই নেতৃত্ব। আমার ছাপাখানা তাঁরা 'কালান্তর' পত্রিকা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করতে চাইলেন। প্রথমে আমি রাজি হইনি, কিন্তু আমার প্রিয় নেতৃবৃন্দ জেলের অভ্যন্তরে। আমি কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। তারপর ধীরে ধীরে নিজের অজান্তে কেমন অন্য স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলাম। কাকাবাবুর সাহায্যে গড়া ছাপাখানা ব্যবহার করতে দিলাম তাঁদেরই বিরুদ্ধে।

১৯৬৪ সালে পার্টি সরকারিভাবে বিভক্ত হল। এক পার্টি ভেঙে দু'পার্টি—সি পি আই, সি.পি.আই (এম)। আমি সি.পি.আইতে থেকে গেলাম।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমি লজ্জায় কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। আকস্মিকভাবে কেমন যেন একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়ে গেল।

অসুস্থ থাকা অবস্থায় কাকাবাবুকে আমি কয়েকবার দেখতে গিয়েছি। আগের মতো মিষ্টি হাসিতে তিনি অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। কোনও অভিযোগ দূরে থাক, কখনও রাজনীতির কথা তোলেননি। চিরকাল যে স্নেহ লাভ করে এসেছি তার কোনও ঘাটতি হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি। লজ্জায় কুণ্ঠায় আমিই কেমন গুটিয়ে গিয়েছি।

তারপর কাকাবাবু এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। আমার মাঝে থেকে গেল তাঁর আদর্শ, তাঁর দেশপ্রেম, মনুষ্যত্ব ও আমার প্রতি তাঁর স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার ছোঁয়া। আমি অকপটে স্বীকার করি, যদি আমার মাঝে কখনও কোনও শুভ মঙ্গলময় কাজের লক্ষণ দেখা যায়—তবে তা হল কাকাবাবুর অবদান। আজও আমি কাকাবাবুকে বুকে বেঁধে বেঁচে আছি।

পান্নালাল দাশগুপ্ত

চল্লিশের দশকের শেষভাগ ও পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিনগুলি বারবার আমার কাছে ঘুরে ফিরে আসে। সেদিনের আমার আমিকে আজ আমি মাঝে মাঝে নিজেই চিনতে পারি না। সত্যিই সেই দিনগুলি ছিল এত উত্তাল, এত উজ্জ্বল যে তাকে ভোলা যায় না। এমনই দিনের কথা আজ আবার বলতে বসেছি।

আমরা যখন বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসাবে প্রতিনিয়ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছি, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছি, দেশ গড়ার কারিগর হিসাবে নিজেদের অনুভব করছি তখনই একটি খুদে বিপ্লবের কাহিনি আমাদের কাছে পৌঁছল। কংসারি হালদারের নেতৃত্বে কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলন তখন সশস্ত্র রূপ ধারণ করেছে। সেই সময়েই আমরা জানতে পারলাম পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বে দমদম-বসিরহাটে এই সশস্ত্র বিপ্লবের ঘটনা। এই ঘটনা সেদিন আমাদের মতো তাজা তরুণদের শুধু উজ্জীবিত নয়, রোমাঞ্চিত করেছিল। পান্নালাল দাশগুপ্তকে নিয়ে রোমাঞ্চকর সব কাহিনি তরুণদের মুখে মুখে। পান্নাবাবুকে আমি তখন দেখিনি। শুনতাম দুই হাতে তিনি নাকি অসাধারণভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারতেন। কেউ কেউ তো তাঁকে রবিনহুডের সঙ্গে তুলনাও করত। তারপর সংবাদপত্রে পান্নাবাবুর গ্রেপ্তারের ঘটনা পড়ে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁকে ধরতে পুলিশকে নাকি হিমশিম খেতে হয়েছিল।

পান্নাবাবু কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। ওঁদের বীরভূম সম্মেলনে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পান্নাবাবুর মতভেদ হয়। পান্নাবাবুর দলই জয়লাভ করে। পান্নবাবুর নীতি ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে উদ্দেশ্যের অবশ্য কোনো মতভেদ ছিল না। উভয় পার্টিই এই স্বাধীনতাকে তখন স্বাধীনতা বলে স্বীকার করেনি। সেই কারণেই সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক। অধিকাংশ তরুণ কর্মী চলে গেল পান্নাবাবুর দলে। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি অল্প সংখ্যক কর্মী নিয়ে তাঁর দলকে বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি। তখনকার দিনে পান্নাবাবুর যাঁরা প্রধান সৈনিক ছিলেন তাঁদের একজনের সঙ্গে পরবর্তীকালে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। তাঁর নাম পৃথ্বীশ দে। ডাক নাম তান্তু। আমার সঙ্গে যখন তান্তুবাবুর পরিচয় তখন তিনি ছবি আঁকায় মগ্ন। শিল্পী হিসাবে তান্তুবাবু তখন বেশ নাম করেছিলেন। পান্নাবাবু আমার কাছে তান্তুবাবুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

পান্নাবাবু অনেকদিন জেলে আটক ছিলেন। তাঁর মুক্তির জন্য তখন বাইরে নানারকম আন্দোলন চলছিল। সশস্ত্র বিপ্লবের পথ থেকে কমিউনিস্ট পার্টিও সরে এসেছে, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টিরও তখন আর অতীতের সেই ভূমিকা নেই। পান্নাবাবুর মুক্তির জন্য যিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির অন্যতম

নেতা ভূপেশ গুপ্ত। ইন্দিরা গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ভূপেশ গুপ্তর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভূপেশ গুপ্ত নিজেও একজন অসাধারণ চরিত্র। বিলেতে একই সঙ্গে জ্যোতি বসু প্রমুখের সঙ্গে তিনি আন্দোলন করেছেন। সেখানেই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধীও ছিলেন ভূপেশ গুপ্তর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভূপেশ গুপ্তর অতি সাধারণ জীবনযাপন সকলকে মুগ্ধ করত। তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। সাংসদ হিসাবেও তাঁর ভূমিকা অসামান্য।

ভূপেশ গুপ্তকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। শেষদিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থেকেছে। কলকাতায় এলে ভূপেশদা থাকতেন কড়েয়া রোডের সরকারি আবাসনে। ভূপেশদার জীবনযাত্রা আমাকে খুব আকৃষ্ট করত। তাছাড়া তাঁর মিষ্টি ব্যবহার ভোলা যায় না। ভূপেশদার প্রচেষ্টা ছাড়া পান্নাবাবুর পক্ষে মুক্ত হওয়া সম্ভব হত না। একথা পান্নাবাবু নিজেও আমাকে বলেছেন। জেলে থাকতে পান্নাবাবুর মতের একেবারে পরিবর্তন ঘটে। যে মত তিনি এতকাল পোষণ করেছেন, ঠিক তার বিপরীত। পান্নাবাবু সিদ্ধান্তে পৌঁছন ভারতবর্ষের মুক্তির একমাত্র পথ হল গান্ধীর পথ। জেলে বসেই তিনি লিখলেন তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ 'গান্ধী গবেষণা'। আর এই 'গান্ধী গবেষণা' প্রকাশ নিয়ে আমার পান্নাবাবুর সঙ্গে পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতা।

আমি যখন শরৎ ব্যানার্জী রোডে থাকতাম তখন একই বাড়িতে থাকতেন চিন্মোহন সেহানবীশ—সে কথা আগেই বলেছি। চিনুদার সঙ্গে তখন থাকছেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। নিরঞ্জনবাবু পান্নাবাবুর পার্টির একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন। দমদম বসিরহাটের ঘটনায় তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। নিরঞ্জনবাবু ছিলেন সুবক্তা, সুলেখক এবং বিনয়ী মানুষ। নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গেও আমার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'নফরকুণ্ডু' ছদ্মনামে তিনি অনেকদিন ব্যঙ্গাত্মক রচনা লিখেছেন। খুবই রসগ্রাহী সেইসব রচনা। পেশায় নিরঞ্জনবাবু ছিলেন শিক্ষক। প্রথম হেতমপুর কলেজে পড়িয়েছেন, পরে সাউথ পয়েন্ট ও পাঠভবনে। শিক্ষক হিসেবেও নিরঞ্জনবাবু ছিলেন ছাত্রদের খুবই প্রিয়। নিরঞ্জনবাবু কিছুকাল 'বিচিন্তা' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। ১৯৭১ সালের শেষভাগে আকস্মিক মেনিনজাইটিস রোগে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। আমি সেদিন হারিয়েছিলাম একজন সহৃদয় বন্ধুকে।

নিরঞ্জনবাবু আমাকে পান্নাবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পান্নাবাবু 'গান্ধী গবেষণার' পাণ্ডুলিপি নিয়ে নিরঞ্জনবাবুর কাছে এসেছিলেন। নিরঞ্জনবাবু তখন উপর থেকে আমাকে ডেকে পাঠান। পান্নাবাবুকে দেখে আমি একেবারে অবাক। তাঁর সম্পর্কে যে কল্পনা প্রথম জীবন থেকে করে এসেছি তার সঙ্গে কোনওরকম মিল নেই। ছোট্টখাট্ট চেহারা, হাসি হাসি মুখ, আস্তে আস্তে কথা বলেন। কথা বলার সময় হাসিই ঝরে পড়ে। পান্নাবাবুকে সেদিন আমি তাঁর সম্পর্কে আমার প্রথম জীবনের ভাবনার কথা বলেছিলাম। পান্নাবাবু খুব হেসে উঠেছিলেন।

'গান্ধী গবেষণা' প্রকাশের ব্যবস্থা পাকা হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বইটা আমি প্রকাশ করি। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বইটা আলোড়নের সৃষ্টি করে। পত্র-পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হতে থাকে। গান্ধী সম্পর্কে পাঠকেরা নতুন এক ভাবনার সন্ধান পান। প্রকাশের প্রায় কুড়ি বছর পরেও 'গান্ধী গবেষণা' আজও সমান জনপ্রিয়। আলোচনার এখনও শেষ হয়নি।

যে সময়ের কথা আমি বলছি তখন প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে পান্নাবাবু নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু সামাজিক আন্দোলনে নিজেকে পুরোমাত্রায় নিয়োগ করলেও দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেননি। নাগাল্যান্ড সমস্যার সমাধানে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। নাগাল্যান্ড ভ্রমণ করে তখন তিনি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছুই করে উঠতে পারেননি। বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে পান্নাবাবুর সুস্পষ্ট অভিমত ছিল এবং স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করা থেকে সরে আসেননি। এই সময় পান্নাবাবু গঠন করেন সর্ববৃহৎ বেসরকারি সামাজিক প্রতিষ্ঠান (N. G. O.) টেগোর রিসার্চ সেন্টার। বীরভূমের মানুষেরা তখন পান্নাবাবুকে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাঠান। নকশাল আন্দোলন তখন স্তিমিত। তাজা তাজা অসংখ্য তরুণকে প্রাণ দিতে হয়েছে নৃশংস পুলিশের হাতে। সেদিন পুলিশের খুনির ভূমিকা আমাদের অনেকেরই দেখা। বিধায়ক হিসাবে পান্নাবাবু প্রথম যে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তা হল জেলে নকশাল নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলোচনা। পান্নাবাবুর প্রচেষ্টায় সেই সময় কিছু নকশাল কর্মী কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছিল। তাদের বেশিরভাগই পান্নাবাবুর সঙ্গে যোগ দিয়ে সামাজিক আন্দোলনের কাজে নিজেদের নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গে পান্নাবাবুর সঙ্গে আমার দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়েছে। পান্নাবাবুর মুখ থেকে সেইসব কাহিনি আমি শুনেছি।

পান্নাবাবু ছিলেন অসাধারণ সংগঠক। এই সময় তিনি প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কম্পাস'। পত্রিকার নামকরণ থেকেই পত্রিকার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। নানান স্তরের বুদ্ধিজীবীরা তখন 'কম্পাস' পত্রিকায় যোগ দেন। পান্নাবাবুর স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় তখন চিন্তাশীল মানুষদের ভাবিয়ে তোলে। পান্নাবাবুর সঙ্গে যেসব বিপ্লবী কর্মী ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই 'কম্পাস' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কিত হন। শেষ জীবনে পান্নাবাবু আমাকে 'কম্পাস' পত্রিকার সঙ্গে জড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নানা কারণে আমি নিজেকে জড়াতে পারিনি।

পান্নাবাবুর সঙ্গে আমার বেশ কিছুকাল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। দূর থেকে তাঁর খবরাখবর রাখতাম। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ তিন বছর আমার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। পান্নাবাবুর তখন নব্বই ছুঁই ছুঁই বয়স, স্থায়ীভাবে থাকেন শান্তিনিকেতনে। শ্যামলী

খাস্তগীরের বাড়িতে। শ্যামলীও একজন অসাধারণ ত্যাগী চরিত্র। বিখ্যাত চিত্রকর সুধীর খাস্তগীরের একমাত্র সন্তান। ছেলেবেলা থেকেই শ্যামলীর জীবন কেটেছে শান্তিনিকেতনে। রাবীন্দ্রিক আবহাওয়ায় সে বড় হয়েছে। পান্নাবাবুর সামাজিক আন্দোলনে সেও একজন নিবেদিত কর্মী। শ্যামলী নিজেও শিল্পী। দীর্ঘকাল তার জীবন কেটেছে বিদেশে। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে তখন সে ছিল প্রথম সারির কর্মী। পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনেও শ্যামলী পুরোভাগে। বিদেশে কয়েকবার তাকে গ্রেপ্তার বরণও করতে হয়েছে। পান্নাবাবুর শেষ জীবনের দেখাশোনার দায়িত্বভার শ্যামলী স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল।

এইসময় আমি প্রায় প্রতি মাসে শান্তিনিকেতনে পান্নাবাবুর কাছে যাচ্ছি। উদ্দেশ্য পান্নাবাবুর সমস্ত লেখাপত্র গুছিয়ে দেওয়া এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করা। পান্নাবাবুর সঙ্গে তখন দিনের পর দিন নানা প্রসঙ্গে নানারকম কথা বলেছি। পান্নাবাবু খোলামনে তাঁর সারা জীবনের ভাবনা আমার কাছে তখন প্রকাশ করেছেন। আমাদের এইসব আলোচনার বেশিরভাগটাই বোধহয় শ্যামলীর কাছে টেপে তোলা আছে। কেন জানি না পান্নাবাবু উদ্‌গ্রীবভাবে আমার শান্তিনিকেতন যাবার জন্য অপেক্ষা করতেন। পান্নাবাবু তখন আমাকে বীরভূমে তাঁদের কেন্দ্রগুলি ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। কত মানুষ স্বনির্ভরতার শিক্ষায় নিযুক্ত সেদিন সেইসব কর্মকাণ্ড স্বচক্ষে দেখেছি। নিজের চোখে দেখেছি গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের সর্বস্তরের মানুষেরা পান্নাবাবুকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করেন। তাঁদের মুখ থেকেই শুনেছি, তাঁদের সমস্যা বোঝবার মতো মানুষ পান্নাবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। ওই বয়সেও ভগ্ন শরীরে পান্নাবাবু জিপে করে দূর-দূরান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সারা জীবন তাঁর ছোট-খাটো শরীরের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তাতে এত বছর বয়স পর্যন্ত সোজা থাকা সত্যিই বিস্ময়ের।

পান্নাবাবুর যে শরীর ভাঙছে, একথা স্বীকার করতে তিনি কখনই রাজি ছিলেন না। কোনো কিছুকে বিশেষ মূল্য দেওয়া ছিল তাঁর স্বভাব বিরোধী। যেমন খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়াকে তিনি সময়ের অপব্যবহার বলে মনে করতেন। বারবার বলতেন, মেয়েরা বিনা কারণে তাদের বেশিরভাগ জীবন নষ্ট করছে এই রান্নাঘরে। দায়ী অবশ্য পুরুষেরাই।

পান্নাবাবু বিশ্বাস করতেন, নিজের জীবনে প্রয়োগ না করে অন্যকে উপদেশ দেওয়া চূড়ান্ত ভণ্ডামি। অন্যেরা করছে না বড় কথা নয়, একা একা যদি নিজের জীবনধর্ম পালন করা যায়, তাহলে কেউই ঠেকাতে পারে না। এই বিশ্বাস তো গান্ধীর বিশ্বাস।

পান্নাবাবুর জীবনেরও অনেক কথা আমি শেষ জীবনে তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। কীভাবে তিনি মিলিটারির চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেকথা শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছি। তবে পান্নাবাবু আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন দুহাত কেন এক হাতেও তিনি

আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে জানেন না। জীবনে তিনি নিজে কাউকে হত্যা করেননি। একবারই মাত্র হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দলের এক সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায় কয়েকজন কর্মী ধরা পড়ে যাওয়াই ছিল এই নির্দেশের কারণ। সেই ঘটনার জন্য শেষ বয়সেও তাঁর কোনো অনুশোচনা ছিল না। দমদম-বসিরহাটের খুদে বিপ্লব নিয়ে পঞ্চাশ বছর পরে পান্নাবাবু তাঁর উপলব্ধির কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সেদিনের সেই ঘটনা ছিল অত্যন্ত অপরিণত। কিছুটা ছেলেমানুষিও বটে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাহলে তখন এমন ডাক আপনি দিলেন কেন? তখনও কি আপনার মনে কোনও দ্বিধা ছিল?

পান্নাবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, হ্যাঁ দ্বিধা তো ছিলই। কিন্তু আমার সহযোদ্ধাদের চাপে আমি সম্মত হতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে আমরা একটা আশা করেছিলাম, ভেবেছিলাম কংসারি হালদারদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হবে। তাহলে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমরা অনেকদিন এই সশস্ত্র আন্দোলন ধরে রাখতে পারব। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে ঘটনা ঘটেনি। কেন সে কথার মধ্যে আজ আর আমি যেতে চাই না।

কংসারি হালদারকে আমার কথাটি জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে ছিল। নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ না হলেও কংসারিদার সঙ্গে আমার খুবই চেনাজানা ছিল। কংসারিদারও পান্নাবাবুর মতো নিরীহ চেহারা, হাসি হাসি মুখ। কথা বললে হাসি ঝরে পড়ে। দেখে কোনোভাবেই বুঝবার উপায় নেই তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ কংসারি হালদার। পান্নাবাবুর সঙ্গে যখন আমার এইসব কথাবার্তা চলছে তখন কংসারিদা আর এই পৃথিবীতে নেই। সেদিন খুব আপশোশ হয়েছিল, পান্নাবাবুর কাছ থেকে এই কথাগুলি যদি আর কিছুকাল আগে জানতে পারতাম। এই দুই অসাধারণ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকের অভিমত আমার মনের মাঝে লেখা থাকত। এই দুজনই ছিলেন আমার প্রথম যৌবনের মহানায়ক।

মহাত্মা গান্ধীর কথা পান্নাবাবু বারবার বলতেন। তাঁর ঘরে গান্ধীর একটি অসাধারণ ছবি ছিল। তিনি ছবির দিকে তাকিয়ে কয়েকবার আমাকে বলেছেন, এই হল আধ্যাত্মিক গান্ধী। আধ্যাত্মিক গান্ধীকে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ গান্ধীকে বোঝা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

ঈশ্বর ভাবনা নিয়ে পান্নাবাবু তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় আমাকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। কোনো দিনই করিনি। আজীবন আমি নাস্তিক। কিন্তু বারবার আজ আমার মনে প্রশ্ন জাগে, ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে বেঁচে আছে আমার দেশের কোটি কোটি মানুষ। আমি তাদের কাছে চিরকাল ঈশ্বর বিরোধিতার কথা বললাম। কিন্তু অন্য কোনও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলাম না। যে

বিশ্বাস স্থাপন করতে গেলাম তাও সঠিক নয় বলে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই বয়সে আমার আর নতুন করে ভাবা সম্ভব নয়। আপনারা সবাই ভাবুন এটাই আমি মনে প্রাণে চাই।

পান্নাবাবুর এইসব বক্তব্য তাঁর রচনাসংগ্রহের ভূমিকাতে আছে। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে ভূমিকাটা আমিই লিখেছিলাম এবং তিনি অনুমোদন করেছিলেন। মনে আছে, কম্পাস অফিসে তাঁর নিজস্ব ঘরে ভূমিকাটা তাঁকে আমি পড়ে শুনিয়েছিলাম। তিনি তখন বেশ অসুস্থ। আমার হাতটা তাঁর হাতের মাঝে টেনে নিয়ে সেদিন তিনি বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে আমার দিনের পর দিনের আলোচনা ব্যর্থ হয়নি। আমি যা বলতে চাই আপনি তা সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। একচুলও বিচ্যুত হননি। এই কথা বলে আমার হাতে যে উষ্ণতার চাপ দিয়েছিলেন সে উষ্ণতা আজও অম্লান।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে পান্নাবাবু একটা মজার কথা বলেছিলেন—তখন তাঁর বয়স অল্প, বন্দি হয়ে তিনি জেলে জীবন কাটাচ্ছেন। জেল থেকে রবীন্দ্রনাথকে একখানা চিঠি লিখলেন। লিখলেন, আপনার কবিতায় মানুষের কথা আসে না কেন? আপনার এই মানসিকতা আমার একদম ভাল লাগে না। এই প্রসঙ্গে আমি আপনার বক্তব্য জানতে চাই।

জিজ্ঞেস করলাম, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কোনো জবাব দেননি।

পান্নাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, দিয়েছিলেন। জেলে পাঠানো সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, তুমি ছেলেমানুষ, বয়স হলে নিজের উত্তর নিজেই খুঁজে পাবে। এখন তুমি জেল থেকে তাড়াতাড়ি ছাড়া পাও এটাই কামনা করি।

তারপর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, এই কারণেই তো বারবার বলি রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই।

পান্নাবাবুর আপন খুড়তুতো ভাই ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। পান্নাবাবু ছিলেন প্রমোদদার চেয়ে বয়সে বড়। প্রমোদদা প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি সস্নেহে জবাব দিতেন। বিশেষভাবে বলতেন গ্রামের বাড়ির সেইসব হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা।

পান্নাবাবু শেষ জীবনে অনুভব করতে পারছিলেন তাঁর স্বপ্নের সংগঠন ঠিকমতো চলছে না। কিন্তু তখন তাঁর আর কিছু করার ছিল না। কর্মী সংগ্রহের বয়সও তখন আর ছিল না।

শেষ জীবনে পান্নাবাবু উপলব্ধি করেছিলেন যে, আমাদের দেশের আজ প্রধান শত্রু হল ভোগবাদ। ভোগবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর করা উচিত। ভোগবাদকে দূরীভূত করতে না পারলে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের কিছুই করা সম্ভব নয়। পান্নাবাবু বারবার বলতেন, কি করে ভোগবাদকে দূর করা যাবে। সর্ষের মধ্যেই যে ভূত! যাঁরা দেশ চালাচ্ছেন অথবা বিরোধীপক্ষে বসে আছেন তাঁরা সবাই ভোগবাদে আক্রান্ত। তাঁর

একমাত্র ভরসা ছিল তরুণদের ওপর। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন দেশ থেকে ভোগবাদকে বিতাড়িত করতে তরুণেরা একদিন সক্ষম হবেই।

দিনগুলি বেশ চলছিল। নিয়মিত শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি-আসছি, পান্নাবাবুর সঙ্গে নানা রকম আলোচনায় কেটে যাচ্ছে সময়। কত কিছু শিখছি, জানছি। নিজেকে নিজে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারছি। চোখের সামনে দেখছি কি অসাধারণ অনাড়ম্বর সাদাসিধে জীবন! বারবার মনে হত কেন আমার আগে পান্নাবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল না। তাহলে হয়তো আমার জীবনধারা একেবারে পাল্টে যেত। হয়তো জীবনটা এমন সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে কাটাতে হত না।

ইতিমধ্যে একদিন ভোরবেলা খবর পেলাম পান্নাবাবুকে পি. জি. হাসপাতালে আনা হয়েছে। ডা. পশুপতি চট্টোপাধ্যায় নাকি এই ব্যবস্থা করেছেন। ডা. চট্টোপাধ্যায় পান্নাবাবুদের সংগঠনের তখন সভাপতি। তিনি বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে আমি আমার ছাত্রজীবন থেকে চিনি। একই সঙ্গে আমরা ছাত্র-আন্দোলন করেছি। আমার অনেকটা সিনিয়র। আমি দাদা বলেই ডাকি। কিন্তু পান্নাবাবুকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনোভাবেই কলকাতায় নিয়ে আসা উচিত হয়নি। হাসপাতালে শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হলে সে-ও তার ক্ষোভের কথা জানাল। সারা রাত হাসপাতালে কাটিয়েছে শ্যামলী। পান্নাবাবুকে ইন্টেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে। বিকেলের আগে দেখা করা যাবে না। তাঁর বেশ কিছু ভক্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে হাসপাতালে ঘোরাঘুরি করছে।

বিকেলে পান্নাবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। তখনও তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলছেন। পি. জি-তে নিয়ে আসার জন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, আমাকে কেউ কখনও এভাবে আটকে রাখতে পারেনি। শেষ জীবনে আমার সহকর্মীরা সেই কাজটা করল। শান্তিনিকেতনে আমি শেষ নিঃশ্বাসটুকু ত্যাগ করতে চেয়েছিলাম, সেই সুযোগ বোধহয় এরা আমাকে দেবে না। আমি ভাবতে পারি না আমার নাকের মাঝে নল ঢোকানো থাকবে।

কি জবাব দেব আমি! যত বড় ডাক্তারই হোন না কেন পান্নাবাবুর অভিমতকে মূল্য দেওয়া উচিত ছিল। বোঝা উচিত ছিল রোগী স্বয়ং পান্নালাল দাশগুপ্ত। পান্নাবাবুকে কি পশুপতিদারা সুস্থ করতে পেরেছিলেন? তাঁকে কি কোনও স্বস্তি বা শান্তি দিতে পেরেছিলেন? তবে কেন এই সিদ্ধান্ত? শ্যামলীর অভিমতকেও কেন মূল্য দেওয়া হয়নি? পান্নাবাবুর শেষ জীবনের অস্তিত্ব তো শ্যামলী রক্ষা করছে। শ্যামলীর অসাধারণ সেবা ছাড়া কি পান্নাবাবু ৯৫ বছর বয়স পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারতেন? পান্নাবাবু নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন—না।

কদিনের ব্যর্থ লড়াই। অনেক সুস্থ পান্নাবাবু হাসপাতালে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। তারপর একদিন শেষরাতে ফোন—সব শেষ। ছুটে গেলাম হাসপাতালে। নিষ্পলকভাবে

তাকিয়ে থাকলাম স্পন্দনহীন পান্নাবাবুর শান্ত, সৌম্য দেহটির দিকে। কী অসাধারণ সুন্দর লেগেছিল সেদিন পান্নাবাবুকে। ছেলেবেলা থেকে মনের মাঝে ঋষি সম্পর্কে একটি কল্পনার ছবি আঁকা আছে। পান্নাবাবুকে সেদিন আমার মনে হয়েছিল, তিনি শুধু ঋষি নন বর্তমান ভারতের আত্মা।

পান্নাবাবুর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কম্পাস অফিসে। কত রকমের মানুষ সেদিন শেষ নমস্কার জানাতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী। বিনয়দা দীর্ঘসময় সেদিন পান্নাবাবুর শিয়রে বসে কাটিয়েছিলেন। পান্নাবাবুর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম ভালবাসা। বিনয়দার মুখ থেকে সেদিন পান্নাবাবুর জীবনের আরও অনেক কথা আমি জেনেছিলাম, যেসব কথা পান্নাবাবু নিজেও বলেননি। কি করে বলবেন! নিজের কথা বলবার মানুষ তো পান্নাবাবু ছিলেন না। বিনয়দাকেও আমরা সবাই আদর্শ পুরুষ বলে মানি। দীর্ঘকাল রাজ্যের উল্লেখযোগ্য মন্ত্রী থাকলেও মন্ত্রিত্বের কোনোরকম প্রভাব তাঁর মধ্যে পড়েনি। শেষকালে তো তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে সরেই দাঁড়ালেন। পান্নাবাবুকে বিনয়দা চিনবেন না তো কে চিনবেন! আমাদের মতো স্বার্থপর মানুষদের কি তাঁকে চেনা সম্ভব!

পান্নাবাবুর মরদেহ সামনে রেখে হাঁটতে হাঁটতে আমরা নিমতলা শ্মশানে পৌঁছে যাই। আমার সঙ্গে ছিল শ্যামলী আর চৈতালী। চৈতালী দত্ত সংস্কৃতের লেখিকা। পান্নাবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে গান্ধী গবেষণার সর্বশেষ ভূমিকা চৈতালী লিখেছিল। পান্নাবাবু খুব খুশি হয়েছিলেন। আমরা কেউ কোনও কথা বলছিলাম না। নীরবে পথ হাঁটছিলাম। আমাদের সমস্ত অস্তিত্বের মাঝে মিশে আছেন পান্নাবাবু, তিনিই যেন আমাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

তারপর আমাদের যাত্রা শেষ। আগুনের মাঝে কেটেছে যাঁর সারাটা জীবন তিনি চিরনিদ্রা নিতে এগিয়ে গেলেন সেই আগুনের মাঝেই। আগুন ছাড়া পান্নাবাবুকে ভাবা যায় না। আমি তো ভাবতে পারি না।

প্রমোদ দাশগুপ্ত

আমরা যারা পুরানো দিনের মানুষ, যাদের শিকড় রয়েছে চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকে, তারা বর্তমান রাজনৈতিক জগতকে ঠিক চিনতে পারি না। জানি না এই না-চেনাটা আমাদেরই ত্রুটি অথবা বর্তমান সময়ের সমস্যা। একে একে আমাদের সময়ের নেতৃবৃন্দ সবাই তো চলে গেলেন। তবু মনে হয় এখনও তো জ্যোতি বসু আছেন। সংবাদপত্রে তাঁর মন্তব্য খুব মন দিয়ে পড়ি, বুঝবার এবং ভাববার চেষ্টা করি। তবু সামনাসামনি গিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয় না। খুব ইচ্ছে করে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে একদিন খোলামেলা কথা বলি। কিছুদিন আগে আমি আর আমার কবিবন্ধু সিদ্ধেশ্বর সেন ঠিক করেছিলাম জ্যোতিবাবুর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলব। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর কাছে তো পৌঁছানো যেত না। এখন যায় কিনা জানি না। শেষ পর্যন্ত জ্যোতিবাবুর কাছে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে শৈলেন দাশগুপ্তর সঙ্গে আমার খোলামেলা কথা বলবার সুযোগ হয়েছিল। সি.পি.আই-এর কার্যালয় 'ভূপেশ ভবনে' গোপাল হালদারের মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসে শৈলেনদাই আমাকে কথা বলবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে গিয়ে শৈলেনদার সঙ্গে কয়েকঘণ্টা কাটিয়ে এসেছিলাম। শৈলেনদা তখন সি. পি. এম-এর রাজ্য সম্পাদক এবং বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান। শৈলেনদার সঙ্গে আমার বহুদিন পরে জমাটি আড্ডা। শৈলেনদার সঙ্গে আমার দেখা হল দীর্ঘকাল পরে। সেদিন শৈলেনদার কাছ থেকে কত কথা জেনেছিলাম! সব কথা বলা সম্ভব নয়। তবে বিশাল পার্টিতে শৈলেনদা যে খুব তৃপ্ত বলে আমার মনে হয়নি। শৈলেনদা রাজনীতি সম্পর্কে যে যে ইঙ্গিত করেছিলেন তা অদূর ভবিষ্যতে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল দেখতে পেয়েছি। শৈলেনদাও ছিলেন সেই পুরানো দিনের মানুষ। পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁর স্নেহলাভে কখনও আমি বঞ্চিত হইনি। তাঁর সরল সাদাসিধে জীবন আমাকে চিরকাল আকর্ষণ করত। ধুতি আর হাফসার্ট পরিহিত শৈলেনদার চেহারাটা আজও আমার চোখের সামনে ভাসে।

পরে অনেকবার ভেবেছি শৈলেনদা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সেদিন অমন সব কথা কেন বলেছিলেন! মনে হয় সেই সব কথা ছিল শৈলেনদার উপলব্ধির কথা। কথার মাঝে মাঝে শৈলেনদা বারবার বলছিলেন, 'তোমাগো সেই পার্টি আর নাই'। আমিও একমত হয়েছিলাম। আমাদের সময়কার পার্টি বা বর্তমান আমলের পার্টি কোনটা যে সাচ্চা বলা বড় কঠিন। আমি নিজেও জানি না। শৈলেনদা হয়তো জানতেন। হয়তো সেই কারণে বারবার আমাদের সময়কার পার্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন।

মৃত্যুর আগে ডা. রণেন সেনের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। রণেনদার মনের মাঝেও একই ক্ষোভ ছিল। পার্টি ভাগ হলেও এইসব পুরানো দিনের মানুষেরা কেউ সেই ভাগ মেনে নিতে পারেননি। রণেনদা তো শেষদিন পর্যন্ত দুই পার্টি এক করবার কথা বলে গিয়েছেন। রণেনদার সেই স্বপ্ন হয়তো কোনোদিনও পূরণ হবে না। এই স্বপ্ন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও দেখতেন। আমার মতো অতি নগণ্য মানুষও এমন স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন হয়তো স্বপ্নই থেকে যাবে। এই কথাগুলি জ্যোতিবাবুকে বলবার বড় ইচ্ছা।

এমন একজন যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁর কাছে গিয়ে আমি খোলাখুলি এইসব কথা জিজ্ঞেস করতে পারতাম। এমনই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। অন্যের কাছে তিনি যতই কঠোরব্যক্তিত্ব হোন আমার কাছে তিনি চিরকালই কোমল ছিলেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব হলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত।

প্রমোদ দাশগুপ্তকে আমি পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই চিনি। শুধু চিনি বললে ভুল হবে, তখন থেকেই আমি তাঁর খুব কাছের মানুষ। প্রমোদদার ছোট বোন সরমাদির সঙ্গে আমি একসঙ্গে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে পার্টি করেছি। তার স্বামী যুক্তফ্রন্ট আমলের শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষও ছিলেন আমার খুব ঘনিষ্ঠ। আমরা একই গ্রামের মানুষ। খুলনা জেলার কুমিরা গ্রামে আমাদের উভয়ের বাড়ি। কেষ্টদা সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে গ্রামের গপ্পো করতেন। কেষ্টদা ছিলেন বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়, তবু বন্ধুর মতো মিশতেন। কলকাতা জেলা কমিটির নেতা হিসেবে কেষ্টদা কতবার আমাদের সঙ্গে সভা করেছেন, কত মতান্তর, কত মনান্তর হয়েছে, কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত সম্পর্কে চিড় ধরেনি। ওইসব মানুষেরাই ছিলেন অন্য জাতের।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্য কমিটির সম্পাদক হননি। কিন্তু সম্পাদক না হলেও প্রমোদদা তখন রাজ্যস্তরে উল্লেখযোগ্য নেতা। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রমোদদা থাকতেন রাজ্য কমিটির দপ্তর ৬৪ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে। পরনে থাকত সাদা ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি। সাদা ধপধপে। নিখুঁতভাবে কাচা ও ইস্ত্রি করা। কিন্তু প্রমোদদা এই জামাকাপড় নিজেই কাচতেন, নিজেই ইস্ত্রি করাতেন। পায়ে কালো পাম-স্যু চকচক করত। নিজের জুতো নিজেই পালিশ করতেন। প্রমোদদার ব্যক্তিগত কাজ অন্য কেউ করে দিচ্ছেন এমন দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি। প্রমোদদা চুরুট খেতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর হাতে বা মুখে সবসময় থাকত বার্মার চুরুট। প্রমোদদাকে চুরুট মুখে সত্যিই খুব মানাত।

প্রমোদদা ছিলেন মুদ্রণ শিল্পে খুব পারদর্শী। কাকাবাবুর মতো। স্বাধীনতায় তিনি আমাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন। তাঁর হাতেগড়া আর একজন হলেন সমীর দাশগুপ্ত। গণশক্তি প্রেসের দায়িত্বে ছিলেন। কিছুদিন আগেই সমীরের সঙ্গে গণশক্তি প্রিন্টার্সে আড্ডা মেরে এসেছি। সমীর তখন পার্টি-পত্রিকার ইতিহাস রচনা করছে। প্রথম

খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আমি আর সমীর বোধহয় সমবয়সী। আমাদের দুজনকে প্রমোদদা একসঙ্গে কাজ শেখাতেন। তখন আমরা দুজনেই খুব ছেলেমানুষ।

'স্বাধীনতা' পত্রিকায় তখন আমাকে প্রতিদিন যেতে হচ্ছে। আমি ছোটদের বিভাগ 'কিশোরসভা'র দায়িত্বপ্রাপ্ত। অন্যের তুলনায় বয়সে খুব ছেলেমানুষ। অনেকেই আমাকে কিশোর হিসেবে দেখতেন এবং সেইমতো ব্যবহার করতেন। বার্তা সম্পাদক ছিলেন সুকুমার মিত্র। সরোজ দত্তর কথা তো আমি পৃথকভাবে বলেছি। সুকুমারদা ছিলেন আমার সম্পর্কে আত্মীয়। বার্তা সম্পাদক হিসেবে সুকুমারদার খুবই নাম ছিল। পঞ্চাশের দশকে তিনি যখন 'সত্যযুগ' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক ছিলেন তখন অতি অল্প বয়সে আমার লেখার হাতেখড়ি। আমি আন্তর্জাতিক রাজনীতিক নিবন্ধ লিখতাম। আমি আর মিহির মুখোপাধ্যায়। মিহির গল্প লেখক হিসেবে পরবর্তীকালে খুবই নাম করেছিল। আজ অকপটে স্বীকার করে নেওয়া ভাল আন্তর্জাতিক রাজনীতির আমরা বিশেষ কিছুই বুঝতাম না। তখনকার 'নিউ টাইমস' পত্রিকায় যেসব লেখা প্রকাশিত হত সেগুলোই পড়ে নিয়ে নিজেদের মতো করে আমরা লিখে দিতাম। সুকুমারদার পৃষ্ঠপোষকতায় এমন অনেক লেখা 'সত্যযুগ' পত্রিকায় লিখেছি। এই সত্যযুগের সঙ্গে অবশ্য আজকের সত্যযুগের কোনো সম্পর্ক নেই। সেই সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। মালিক ডালমিয়া। প্রকাশিত হত কনভেন্ট রোড থেকে।

প্রমোদদা প্রতিদিন 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় আসতেন। অনেকটা সময় কাটাতেন। পরনে সেই টিপটপ পোশাক। বেশিরভাগ সময় কাটাতেন নীচের প্রেস বিভাগে। সাংবাদিকতা বিভাগে সময় কাটাতেন খুব কম। সংবাদপত্রের সব বিভাগেই ছিল প্রমোদদার নিখুঁত জ্ঞান। সাংগঠনিক দিক দিয়ে প্রমোদদা ছিলেন খুব কড়া।

'আগামী' পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে প্রমোদদা আমাকে খুব সাহায্য করতেন। স্বাধীনতার যারা পরিবেশক তাদের মাধ্যমেই 'আগামী' পরিবেশিত হত। এই ব্যবস্থা প্রমোদদারই করা। এমন কী স্বাধীনতার বিজ্ঞাপন বিভাগও 'আগামী' পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করত। সে ব্যবস্থাও প্রমোদদা করে দিয়েছিলেন। কাকাবাবু আর প্রমোদদার সক্রিয় সাহায্য না পেলে আমি অতদিন 'আগামী' চালাতে পারতাম না।

প্রমোদদার কাছে আমার খাওয়াটা প্রায় নিয়মিত বরাদ্দ হয়ে গিয়েছিল। পত্রিকা অফিসে ঢুকতে ডানদিকে একটা ক্যান্টিন ছিল। সেখানে প্রমোদদা নিজে ডিমসেদ্ধ, টোস্ট খেতেন, আমাকেও খাওয়াতেন। এখানেই একদিন চা খেতে খেতে প্রমোদদা আমাকে ক্রিকেট খেলা দেখবার লোভ দেখালেন। প্রমোদদা ক্রিকেটের খুব ভক্ত জানতাম। কিন্তু তাঁর পকেটে যে টিকিট আছে একথা বুঝব কি করে! তিনি সত্যি সত্যি আমার হাতে একটি টিকিট গুঁজে দিলেন। সেই আমার প্রথম মাঠে যাওয়া, প্রথম টেস্ট

খেলা দেখা। তখন তো আর ওয়ান ডে ক্রিকেট ছিল না। এম. সি. সি না ওয়েস্ট ইন্ডিজ কে এসেছিল আজ আর মনে নেই। মাঠ থেকে ফিরলে প্রমোদদা আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আমি ভাল জবাব দিতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি ক্রিকেট খেলা তখন আমি মোটেই বুঝতাম না। আজও বুঝি এমন কথা বলছি না। টিভির সামনে খেলা দেখতে বসলে এখনও আমার ছেলে-মেয়ে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। তাদের আমি একটিই কথা বলি, তোরা যা বলিস বল। আমাকে ক্রিকেট খেলা দেখতে শিখিয়েছেন স্বয়ং প্রমোদ দাশগুপ্ত।

পার্টির বুদ্ধিজীবী মহলের সঙ্গে প্রমোদদার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল না। প্রমোদদা ছিলেন তাঁদের চালচলনের প্রতি খুব বিরক্ত। আমি ছিলাম সাহিত্য আন্দোলনের কর্মী। লেখক-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রমোদদা আমার মাধ্যমেই সব খবরাখবর নিতেন। কাকে কি চোখে প্রমোদদা দেখেন তা আমি ভালভাবেই জানতাম। কারও কাছে কখনও প্রকাশ করতাম না। প্রমোদদার অবশ্য বিশেষ দুর্বলতা ছিল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি। তবু সুভাষদার 'ভূতের বেগার' নিয়ে যখন বিতর্ক শুরু হল তখন প্রমোদদা ছিলেন সুভাষদার তীব্র বিরোধী। মনে আছে, আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে 'ভূতের বেগার' নিয়ে একটি আলোচনা সভা হয়েছিল। সেই সভায় সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সভায় অনেকের বক্তব্যে প্রমোদদা খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন।

প্রমোদদা পার্টির রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। বর্ধমান সম্মেলনে। প্রমোদদা যে সম্পাদক নির্বাচিত হবেন এমন কথা অনেকেই ভাবতে পারেননি। কেন আমি ঠিক জানি না। প্রমোদদার সম্পাদক হওয়া পার্টির লেখক-বুদ্ধিজীবী মহলের বেশির ভাগই মানতে পারেননি। প্রমোদদার স্পষ্ট কথা বোধহয় তাঁদের পছন্দ হত না। তাঁরা মনে করতেন প্রমোদদা শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই বোঝেন না। আমি অবশ্য একথা মানি না। এই প্রসঙ্গে প্রমোদদার সঙ্গে আমার অনেকবার কথা হয়েছে। প্রমোদদা ছিলেন খুব স্পষ্ট প্রকৃতির মানুষ। স্পষ্ট কথা স্পষ্টভাবে বলতে তিনি ভালবাসতেন। 'পরিচয়' পত্রিকা গোষ্ঠীকে প্রমোদদা একদম পছন্দ করতেন না। আমি নিজেও তখন ছিলাম 'পরিচয়' বিরোধী। তাই পরিচয়ের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে আমরা যখন 'উত্তরকাল' প্রকাশ করলাম তখন প্রমোদদা আমাকে ডেকে পাঠালেন। 'উত্তরকাল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম আমি আর কবি সতীন্দ্রনাথ মৈত্র। আমাদের গোষ্ঠীতে ছিলেন ধনঞ্জয় দাস ও মিহির সেন। আমি ধনঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে প্রাদেশিক কার্যালয়ে প্রমোদদার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। 'উত্তরকাল' প্রকাশের জন্য প্রমোদদা আমাদের অভিনন্দন জানালেন, সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ। প্রমোদদা সেদিন বুঝিয়েছিলেন: আমাদের 'উত্তরকাল' পত্রিকায় সঠিকভাবে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতিফলিত হচ্ছে। 'পরিচয়' পত্রিকা যেভাবে চলছে তাতে পার্টির অপকার ছাড়া, উপকার কিছুই হচ্ছে না।

প্রমোদদা অবশ্য সেভাবে আমাদের খুব সাহায্য করে উঠতে পারেননি। কিছুদিনের মধ্যেই ঘটে গেল চিন-ভারত বিরোধের ঘটনা। প্রমোদদা জেলে চলে গেলেন। তারপর ১৯৬৪ সালে তো পার্টি দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। প্রমোদদা থেকে গেলেন এক ভাগে, আর আমি রয়ে গেলাম বিপরীত ভাগে। স্বাভাবিকভাবে দূরত্বও বেড়ে গেল।

আমার ওপর প্রমোদদার খুবই ক্ষোভের যথেষ্ট কারণ ছিল কারণ আমি আমার ছাপাখানা থেকে 'সাপ্তাহিক কালান্তর' প্রকাশ করছি। প্রকাশ করছি বললে ভুল বলা হবে। 'সাপ্তাহিক কালান্তর' প্রকাশে ছাপাখানাটিকে আমি ব্যবহার করতে দিয়েছি। ছাপাখানাটির নাম ছিল 'নিউ এজ প্রিন্টার্স'। মালিক ছিলাম আমি আর আমার প্রথম জীবনের বন্ধু ও পার্টি সদস্য যশোদা সাহা। তবে দেখাশোনা সবই আমি করতাম। যশোদা কোনো কথা বলত না। শুধু যে কালান্তর ছাপা হত তাই নয়—ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আমার ওখানে তখন নিয়মিত আসছেন। ছাপাখানার পাশের বাড়িতে আমাদের পৃথক একটি ঘর নেওয়া ছিল। সেই ঘরে অস্থায়ী কালান্তর কার্যালয় হল কিছুদিন। তারপর অবশ্য কালান্তর কার্যালয় উঠে গেল নবীন কুণ্ডু লেনে। প্রমোদদা যে এসব খবর জানতেন না তা আমার মনে হয় না। তখন তো দুই পার্টির মধ্যে প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ। দীর্ঘকালের সহযাত্রীরা কেউ কারোর সাথে কথা বলে না। হঠাৎ দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। দম বন্ধ হওয়া পরিবেশ। সি.পি. আই ও সি.পি. এম দুটি পৃথক পার্টি। পৃথক অস্তিত্ব। পশ্চিমবঙ্গে পার্টি ভাগ হলে বেশির ভাগ ছিলেন সি. পি. এম-এ, সি. পি. আই-তে সংখ্যায় কম। যদিও লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগ অংশ থেকে যান সি.পি. আই-তে।

শুধু সংখ্যার বিচারে নয়, সাংগঠনিক গুণমান বিচার করলে প্রধান ব্যক্তিরাই রয়ে গেলেন সি. পি. এম.-এ। তার মধ্যেও আবার প্রধান ব্যক্তি হলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। আমার দীর্ঘ পার্টি জীবনে প্রমোদদার মতন সংগঠক আমি দেখিনি। পশ্চিমবঙ্গকে তিনি চিনতেন হাতের তালুর মতো। অন্য কোনো নেতা এভাবে যে পশ্চিমবঙ্গকে চিনতেন বা আজও চেনেন তা আমার মনে হয় না। এদিক থেকে প্রমোদদার প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বিমান বসু'র মধ্যে লক্ষ করেছি। জানিনা আমি সঠিক কিনা।

প্রমোদদার সুযোগ্য নেতৃত্ব না থাকলে পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.এম এই বিশাল পার্টি হত কিনা আমার গভীর সন্দেহ আছে। জ্যোতি বসুকে খাটো না করেই বলছি, তিনি কখনোই সংগঠক ছিলেন না। প্রমোদদা পার্টি সম্পাদক হওয়ার পর থেকেই তাঁকে আমি কাছ থেকে দেখেছি। পার্টির সংগঠন যে কীভাবে গড়ে তুলতে হয়—আমি লক্ষ করেছি।

সি. পি. আই-তে শুধু বুদ্ধিজীবীরাই নয়, তাত্ত্বিক নেতাদের বেশিরভাগ থেকে

গিয়েছিলেন। সাংগঠনিক নেতার সংখ্যা ছিল খুব কম। স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতির কথা বাদ দিলেও সাংগঠনিক দিক থেকে সি. পি. আই. খুব বড় পার্টি হয়ে উঠতে পারল না।

চীন-ভারত সংঘর্ষের পর পার্টি যখন বেসরকারিভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, তখন কিছু নেতা ও কর্মী মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে জ্যোতি বসু অন্যতম। এইসব মধ্যপন্থী নেতা ও কর্মীরা বেশিরভাগই পরবর্তীকালে সি. পি. এমে যোগদান করেন। এই প্রসঙ্গে আমার আর এক প্রিয় নেতা হেমন্ত ঘোষালের নাম মনে পড়ছে। হেমন্তদাও ছিলেন মধ্যপন্থী। হেমন্তদা শুধু মধ্যপন্থী ছিলেন তাই নয়, তাঁদের বক্তব্য প্রচারের জন্যে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। হেমন্তদাদের সেই পত্রিকা আমি বেশ কিছুদিন ছাপিয়ে দিয়েছি। তখন হেমন্তদাকে নিদারুণ অর্থসঙ্কট ভোগ করতে আমি দেখেছি। প্রমোদদা সেইসময় হেমন্তদাকে কাছে টেনে নিলেন। হেমন্তদার আর্থিক অবস্থাও ফিরে গেল। পরবর্তীকালে তিনি খাদি বোর্ডের সভাপতি হয়েছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। চেহারাটাই পাল্টে গিয়েছে। সচ্ছলতার ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়। আমি হেমন্তদাকে সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, হেমন্তদা, এ সবই প্রমোদদার দান। হেমন্তদা লজ্জা পেয়ে আর কোনো কথা বলেননি। অবশ্য এর ফলে হেমন্তদার চরিত্র পালটে গিয়েছিল এমন কথা আমি বলছি না। হেমন্তদা সত্যিই ছিলেন একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট।

জ্যোতি বসু যখন সি পি. এমে যোগ দিলেন তখনকার কথা আমার মনে আছে। প্রমোদদার বিচক্ষণতা না থাকলে জ্যোতিবাবু তাঁর মধ্যপন্থা ত্যাগ করতেন কিনা আমি জানি না। তবে তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে জ্যোতিবাবুর সি. পি. এমে যোগদানে কিছুটা হলেও প্রমোদদার অবদান আছে।

শুধু সাংগঠনিক দিক নয়, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি বিচারে তিনি ছিলেন নিখুঁত। এই গুণ অবশ্য আমি জ্যোতিবাবুর মধ্যে লক্ষ করেছি। সেই গুণের প্রকাশ তাই আজও দেখছি। আজও তাই জ্যোতিবাবুর দিকেই তাকিয়ে থাকি।

১৯৭১ সালের নির্বাচনের কথা মনে পড়ছে। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে প্রমোদদাদের সমঝোতা তো হয়েই গিয়েছিল। সেই সমঝোতা যদি হত তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস হত অন্যরকম। প্রমোদদার নেতৃত্বে অসম সাহসের সঙ্গে সি. পি. এম সেই সমঝোতা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা ছাড়া উপায় নেই। একেই তো বলে নেতৃত্ব! পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস পালটে গেল। সুদীর্ঘকাল বামফ্রন্টের শাসন প্রতিষ্ঠিত। যতই ত্রুটি থাকুক, বামফ্রন্টের কোনো বিকল্পের কথা আমি ভাবতে পারি না। ত্রুটির সমালোচনা আমি করি এবং যতদিন বেঁচে থাকব করব। আমি জানি আজকের দিনে অনেকেই আমাকে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব বলে তৃপ্তিলাভ করেন। কিন্তু গঠনমূলক এই সমালোচনার শিক্ষা আমি কাকাবাবু-প্রমোদদা প্রমুখ অনেকের কাছ থেকেই পেয়েছি। সেই শিক্ষা পরিত্যাগ করতে আমি সম্মত নই। যে-যা ভাবেন ভাবুন।

যাক যা বলছিলাম, ইতিমধ্যে ১৯৬৬-তে শুরু হল খাদ্য আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠল। উভয় পার্টি ঝাঁপিয়ে পড়ল এই আন্দোলনে। অগ্নিগর্ভ এই আন্দোলন কংগ্রেস সরকারকে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিল। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস পরাজিত হল। গঠিত হল প্রথম যুক্তফ্রন্ট। সি. পি. এম., সি. পি. আই. একই মন্ত্রীসভায়। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, উপ-মুখমন্ত্রী জ্যোতি বসু। কিছুকালের মধ্যেই ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতন ঘটল। আমরা সবাই আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

তখনই একদিন আকস্মিকভাবে আমার প্রমোদদার সঙ্গে দেখা। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ একটি গাড়ি এসে আমার পাশে থামল। বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে দেখি গাড়িতে প্রমোদদা বসে। অনেকদিন পর দেখলাম পরনে সেই একইরকম সাদা ধপধপে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে চকচক করছে পাম-স্যু, হাতে সেই বার্মা চুরুট। গাড়ির দরজা খুলে আমাকে ভিতরে ডাকলেন প্রমোদদা। আমি প্রথমে খুব স্বচ্ছন্দ হতে পারছিলাম না। খুবই জড়তায় ভুগছিলাম। প্রমোদদাই আবহাওয়া সহজ করে দিলেন। রাজনীতি নিয়ে কোনও আলোচনাতেই গেলেন না। আমি মনে মনে যে ভয় পেয়েছিলাম সেরকম কোনও অভিযোগও করলেন না। কেমন আছি, অন্য কি করছি ইত্যাদি মামুলি প্রশ্ন করলেন। তারপর শেষকালে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তুমি তো এখন এক নম্বরের লায়েক হয়েছ'।

এইবার আমি পুরানো প্রমোদদাকে খুঁজে পেলাম। কেউ বিশ্বাস করবেন কি না জানি না প্রমোদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল শুধু সহজ নয়, ঠাট্টা-ইয়ার্কিরও বটে। প্রমোদদা বয়সে আমার চেয়ে অতটা বড় হওয়া সত্ত্বেও এবং অত বড় মাপের নেতা হলেও আমি প্রমোদদার সঙ্গে খুবই হালকা ঢঙে কথা বলে গিয়েছি। প্রমোদদার প্রশ্রয় না থাকলে এভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলা কি সম্ভব হত! প্রমোদদা সেদিন আমাকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আমি যাইনি। বুঝেছিলাম, ওখানে গেলে হয়তো প্রমোদদার কিছু বকুনি আমার প্রাপ্য হতে পারে। তাই এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

১৯৬৯ সালে অনেক বেশি শক্তি নিয়ে ফিরে এল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অন্তর্দ্বন্দ্বে সেই সরকারও বেশিদিন টিকল না। রাজনীতিগতভাবে সিপিআই-সিপি এম-এ সাগর আসমান তফাত। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে আমার সঙ্গে সি. পি. এমের কারোই কোনও তিক্ত সম্পর্ক ছিল না। নীচু তলায় কছু কিছু থাকলেও উভয় পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল খুব ভাল। বোধহয় কেউই আমাকে গোঁড়া রাজনীতির লোক হিসাবে মনে করতেন না। আজও আমি ঠিক জানি না।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর ১৯৭১ সালে পুনরায় নির্বাচন হয়। সবচেয়ে বড় পার্টি হয় সি. পি. এম। প্রমোদদা সি. পি. এমের রাজ্য সম্পাদক।

প্রমোদদার অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতায় পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম. প্রধান পার্টি হয়ে উঠেছে। সি. পি. আই সেবার পেল মাত্র ১৬টি আসন। কিন্তু মাত্র ১৬টি আসনের সমর্থন পেলে সি. পি. এম সরকার গড়তে পারত। আমার মনে পড়ে, বউবাজার স্ট্রিটে প্রমোদদা, জ্যোতিবাবু এসে সি. পি. আই-এর সমর্থন চেয়েছিলেন। কিন্তু সি. পি. আই. সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। আজ মনে হয় এটিই বোধহয় পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. আইয়ের পতনের সূত্রপাত। এই ঘটনার পর প্রমোদদার সঙ্গে দেখা করার আমার আর মুখ রইল না। আমি আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে আর কখনও যাইনি। দূর থেকে প্রমোদদার খবরাখবর পেয়ে নিজেকে তৃপ্ত রেখেছিলাম। মাঝে মধ্যে শুনতাম প্রমোদদা হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছেন। এও শুনতাম সিগার তিনি ছাড়েননি। খুব ইচ্ছে হত প্রমোদদার কাছে গিয়ে সিগার ছাড়ার জন্য চাপাচাপি করি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হত আমার এই অধিকার আমি নিজেই হারিয়েছি। প্রমোদদা তো সম্পর্ক সহজ করবার জন্য আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন। তবু আমি যোগাযোগ রাখলাম না কেন? এর উত্তর আমি নিজেও জানি না।

১৯৭১ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসবার পর প্রমোদদার কাছে যাওয়াটা আমার কাছে কেমন যেন অসমীচীন বলে মনে হতে লাগল। প্রমোদদা তখন বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর ব্যক্তিত্ব। নানান মানুষের ভিড় তাঁর কাছে। আমি সেই ভিড়ে শামিল হতে চাইনি। আমার অনেক বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করেছে আমি যেন প্রমোদদার কাছে গিয়ে সল্টলেকে একটা জমি চাই। আমি জানি চাইলে প্রমোদদা আমাকে বিমুখ করতেন না। কিন্তু নিজের মনে আমার একটা সান্ত্বনা আছে। একটা গর্বও আছে বলতে পারি। আমার নিজের বা পরিবারের জন্যে আমি কখনও পার্টির কারোর কাছে কিছু চাইনি। আমি প্রমোদদার কাছে চাইনি, শৈলেনদার কাছে চাইনি, কাকাবাবুর কাছে চাইনি। এমন কী নিজের চাহিদায় কখনও জ্যোতিবাবুর কাছেও যাইনি। আমি আমার মামাতো বোনকে সল্টলেকে জমির জন্য জ্যোতিবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে জমি পেয়েছিল। বিশাল বাড়িও করেছিল সল্টলেকে। সে আজ আর এই পৃথিবীতে নেই। আজ যখন আমার পরিচিত সকলকে সল্টলেকে বাস করতে দেখি তখন আমার মনে মনে হাসি পায়।

দীর্ঘকাল প্রমোদদার সঙ্গে আমার দেখা নেই। আমিও প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছি। প্রকাশনায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। অন্যের মুখে শুনতাম প্রমোদদা আমার প্রকাশনার সব খবর রাখেন। অধীর চক্রবর্তী তখন বসুমতীর দায়িত্বপ্রাপ্ত। আগেই বলেছি অধীরদা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। অধীরদা আমার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে আসতেন। আমিও মাঝে মাঝে বসুমতীতে যেতাম। অধীরদার কাছ থেকে প্রমোদদার খবরাখবর পেতাম। অধীরদা আমাকে প্রমোদদার কাছে বারবার যেতে বলতেন। আমার

জড়তা হচ্ছে বুঝতে পেরে একদিন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

তখনও সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতন ঘটেনি। নভেম্বর দিবসের দিনে সোভিয়েত দূতাবাস একটি অনুষ্ঠান করত। আমি সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত থাকতাম। মনে আছে, সেবারের অনুষ্ঠানটি হয়েছিল গ্র্যান্ড হোটেলে। সেই অনুষ্ঠানে আমার প্রমোদদার সঙ্গে দেখা। এর আগে কাগজে দেখেছিলাম হাঁপানির অসুখের জন্য প্রমোদদা কয়েকদিন দীঘা কাটিয়ে এসেছেন। অসুস্থ শরীরে এ-অনুষ্ঠানে প্রমোদদাকে দেখব ভাবতে পারিনি। বাইরে থেকে প্রমোদদার এমন অসুস্থতা বোঝা ছিল কঠিন। যন্ত্রণাকে ভিতরে নিয়ে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল এইসব মানুষদের। শুধু মুখের দিকে ভালভাবে লক্ষ করলে একটা ক্লান্তির ছাপ দেখা যেত।

প্রমোদদা আর বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পাশাপাশি বসেছিলেন। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রমোদদা একটা চেয়ার টেনে এনে পাশে বসতে বললেন। পাশে বসে প্রথমেই প্রমোদদার শরীরের কথা জিজ্ঞেস করলাম। জীবনে এই প্রথম প্রমোদদাকে একটু হতাশ লাগল। প্রমোদদার মুখ থেকে হতাশার সুর এর আগে কখনও শুনিনি। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'শরীরটা ভাল নেই রে'। কিন্তু নিজের কথা না বলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে আমার বন্ধু লেখক সৌরি ঘটক আমার স্ত্রীকে নিয়ে প্রমোদদার সামনে হাজির করল। প্রমোদদা অবাক। জানতেন না আমি সংসার করেছি। তারপর আমাকে তুলে দিয়ে তাঁর পাশে আমার স্ত্রীকে বসালেন। স্ত্রীর মুখ থেকে পরে শুনেছি প্রমোদদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানারকম কথা জেনেছিলেন। আমার একটি কন্যা ও পুত্র আছে শুনে দারুণ খুশি হয়েছিলেন। আরও খুশি হয়েছিলেন আমার স্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী জেনে। তখনও প্রমোদদার ধারণা আমি সেই আগের মতো বাউণ্ডুলে আছি, নিজে বিশেষ রোজগারপত্তর করি না। স্ত্রী রোজগার করে জেনে প্রমোদদা নিশ্চিন্ত হয়েছেন— সংসারটা তা হলে ঠিক মতন চলছে। কেমন ভাবে বিয়ে হল সে কথা প্রমোদদা আমার স্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন। পরে আমি আবার প্রমোদদার কাছে যখন ফিরে এলাম তখনও প্রমোদদা আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্পে মশগুল। আমাকে বললেন, 'তোমার সব কীর্তি জানা হয়েছে, তুমি যাও ওদিকে গিয়ে ফুটানি কর।'

ক্ষণিকের জন্য আমার কাছে আবার সেই পুরানো প্রমোদদা বেরিয়ে এলেন। পাশে বসে বিশ্বনাথদাও সমস্ত কথোপকথন উপভোগ করছিলেন। বিশ্বনাথদা আমাকে পরবর্তীকালে বলেছিলেন, 'প্রমোদবাবু তোমাকে এতটা স্নেহ করেন আগে ঠিক জানতাম না।'

আমার স্ত্রী তো মুগ্ধ। অত বড় মাপের একজন মানুষ তার সঙ্গে এমন আন্তরিকতায়

দীর্ঘক্ষণ এমন কথাবার্তা বলতে পারেন সে স্বপ্নেও ভাবেনি। গর্বভরে বাইরে এসে সকলের কাছে সে এই গল্প করেছে। সত্যিই কি এটা সম্ভব! তখন কি আর আমি জানি এই আমার প্রমোদদার সঙ্গে শেষ দেখা।

কয়েকদিনের মধ্যেই চিকিৎসার জন্য প্রমোদদা চীনে গেলেন। আর ফিরলেন না। ফিরল তাঁর মরদেহ। সংবাদপত্রে সংবাদটি দেখে আমি দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। আমার স্ত্রীও কোনও কথা বলতে পারছিলেন না। তার কাছে তখন জেগে আছে মাত্র কয়েকদিন আগের উজ্জ্বল স্মৃতি। আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল যুক্ত পার্টির সেইসব দিনগুলো। প্রমোদদা যে নেই একথা আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। তাঁর কথা বলতে বসে আজও কি আমি মানতে পারি!

আমি প্রমোদদার শোক মিছিলের ভিতরে ঢুকিনি। পাশে দাঁড়িয়ে বিশাল সেই শোকমিছিল দেখেছিলাম। দেখতে চেয়েছিলাম বলেই ভিতরে ঢুকিনি। তবে আমার খুব খারাপ লেগেছিল যখন দেখতে পেলাম মিছিলের পুরোভাগে তখনকার পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোম সব ব্যবস্থা করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই দৃশ্যের কল্পনা কি প্রমোদদা কখনও করতে পেরেছিলেন! বোধহয় শাসক পার্টির এটাই পরিণতি। জানি না।

সোমনাথ লাহিড়ী

দেশ বিভাগের বছরে খুলনা জেলার গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে পড়তে আসি কলকাতায়। ভর্তি হই সিটি কলেজে। কলেজ জীবন শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই ভারতের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। প্রার্থনাসভা চলার সময় আততায়ী নাথুরাম গডসের গুলিতে নিহত হন জাতির-জনক মহাত্মা গান্ধী। পরের দিন সংবাদপত্রে একটি সম্পাদকীয় সমগ্র বাঙালি জাতিকে আলোড়িত করেছিল। 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় এই সম্পাদকীয়র নাম ছিল 'শোক নয় ক্রোধ'।

আমরা হাজার হাজার মানুষ সেদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হয়ে কলেজ স্ট্রিট কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট হয়ে শ্যামবাজার ঘুরে সেন্ট্রাল এভিনিউ'র পথে মৌনমিছিলে হেঁটেছিলাম। আমার জীবনে কলকাতার মিছিলে অংশগ্রহণ এই প্রথম। মনে পড়ে, সারা পথ পাশের বাড়ির মেয়েরা রাস্তায় বালতি-বালতি জল ঢেলেছিল, যাতে আমাদের পা পুড়ে না যায়। আমরা সবাই খালি পায়ে হাঁটছিলাম। আর সেই সময় লক্ষ করেছিলাম হাতে হাতে ঘুরছে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা। সকলেরই চোখ ওই সম্পাদকীয় নিবন্ধটির দিকে—'শোক নয় ক্রোধ'।

সম্পাদকীয়র লেখকের নাম আমি তখন জানি না। কয়েকদিন পরে জানতে পারলাম। এ-কথাও জানলাম পত্রিকা প্রকাশের পরেই সরকার এই সম্পাদকীয়টির জন্যে সেদিনকার পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করেছে। সম্পাদকীয়টির লেখক ছিলেন 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ী। অনেক বছর পরে আরও একটি নতুন তথ্য জেনেছিলাম। গান্ধী হত্যার পরে সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি তাঁর দায়িত্বও পালন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখা পছন্দ না হওয়ায় সোমনাথ লাহিড়ী নিজেই এই ঐতিহাসিক সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন। হীরেনবাবুর মুখ থেকে শুনেছি সেদিন তিনি খুব ক্ষুব্ধ হলেও পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছিলেন, লাহিড়ী তাঁর লেখাটি না ছেপে ভাল কাজই করেছিলেন। তাঁর লেখাটি ছিল শুধুমাত্র আবেগে ভরা। সেদিন লাহিড়ী যদি তাঁর লেখা বাতিল না করতেন তাহলে এমন অসাধারণ লেখা থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়দের মতন মানুষদের পক্ষেই এমন ধরনের উপলব্ধি ও তার স্বীকারোক্তি করা সম্ভব।

যখনকার কথা আমি বলছি তখনও সোমনাথ লাহিড়ীকে আমি চিনি না। সবে মাত্র কলকাতায় এসেছি, চিনব কী করে! কিন্তু সাতান্ন বছর আগেকার সেই সম্পাদকীয় আজও আমার মনে গাঁথা আছে। আমি কেন, আমার কাছাকাছি বয়সের অনেকেরই।

তখন আমি ছাত্র ফেডারেশনের কাছাকাছি আসতে শুরু করেছি। তখন কলকাতায়

অনুষ্ঠিত হল কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। যে দু'জনের নাম তখন আমরা বারবার শুনতে পেলাম তাঁরা হলেন ভবানী সেন আর সোমনাথ লাহিড়ী। দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হল—'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'। সেই শ্লোগান বুকে বেঁধে আমরা রাস্তায় নেমে পড়লাম। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হল। নেতৃত্বের কিছু অংশ ধরা পড়লেন, অবশ্য বেশিরভাগই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে সক্ষম হলেন। ভবানী সেন সেই সময় 'রবীন্দ্র গুপ্ত' ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, তা এই ভ্রান্ত রাজনীতিরই ফসল। কমিউনিস্টদের আক্রমণ করতে গেলে বিরোধীপক্ষ আজও এই প্রবন্ধটির উল্লেখ করেন। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক' গ্রন্থে প্রবন্ধটি মুদ্রিত আছে।

তখন সোমনাথ লাহিড়ী বা ভবানী সেন কারোর সঙ্গে পরিচিত হবার কোনো সুযোগ আমার ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে দু'জনের সঙ্গেই আমার গভীর সম্পর্ক হয়। দু'জনেই ছিলেন সাহিত্যমনস্ক। ভবানী সেনের সাহিত্য বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ আছে। সে সব আজ আর পাওয়া যায় না। মৃত্যুর পর তাঁর রচনার একটি মাত্র সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। ঘোষণা ছিল সংগ্রহের আরো খণ্ড প্রকাশিত হবে। কিন্তু হয়নি। ওই একটি মাত্র খণ্ডে সবই রাজনীতি বিষয়ক রচনা।

সোমনাথ লাহিড়ী অবশ্য ছিলেন শুধুমাত্র প্রাবন্ধিক নন, ছোটগল্পের কৃতী লেখক। তাঁর ছোটগল্প পড়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন রাজশেখর বসু। 'কলিযুগের গল্প' তাঁর বিখ্যাত গল্পসংগ্রহ। পুনরায় প্রকাশিত হলেও সেই গল্পসংগ্রহ আজ আর পাওয়া যায় না। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো লিখিতভাবে ঘোষণা করে গেছেন যে সোমনাথ লাহিড়ী তাঁকে হাতে ধরে গদ্য লেখা শিখিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় যখন ছদ্মনামে সুভাষদা 'ডাক বাংলার ডায়েরি' লেখা শুরু করেন তখনই প্রাক-কথনে এই ঘোষণা করেছিলেন। সুভাষদাকে দিয়ে সোমনাথ লাহিড়ী নিয়মিত রিপোর্টাজ লেখাতেন। বাংলা সংবাদপত্রে রিপোর্টাজের কোনো প্রচলন আগে ছিল না। এটি সম্পূর্ণ সোমনাথ লাহিড়ীর সৃষ্টি। সুভাষদা একবার আমাকে গল্প করেছিলেন, লাহিড়ী নাকি তাঁকে ঘরে আটকে রেখে লেখা শেষ করাতেন।

সোমনাথ লাহিড়ীকে আমরা সবাই 'লাহিড়ী' বলে ডাকতাম। সুভাষদা ছাড়াও আর একজন স্মরণীয় লেখককে লাহিড়ী রিপোর্টাজ লিখিয়েছিলেন। তিনি হলেন ননী ভৌমিক। ননীবাবু আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। সুদূর মস্কোয় নিদারুণ একাকিত্বে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে।

পার্টি আইনি ঘোষিত হবার পর সোমনাথ লাহিড়ী ও ভবানী সেন একেবারে বিপরীত মেরুতে সরে গেলেন। পার্টির মূল নেতৃত্বে তাঁরা আর থাকলেন না। সেই সময়

তাঁদের দিন অতি অবহেলার মধ্য দিয়ে কেটেছে। আর তখনই এই দুই নেতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার শুরু।

ভবানী সেন কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছেন টেরোরিস্ট আন্দোলন থেকে—লাহিড়ী ও ডা. রণেন সেন-এর অনেক পরে। রণেনদার মুখ থেকে সেদিনকার অনেক কাহিনিই আমি শুনেছি। রণেনদা তাঁর 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির' ইতিবৃত্ত গ্রন্থে এইসব কথা বিবৃত করে গেছেন। রণেনদার এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। যদিও এখনই পার্টির ইতিহাস লেখার খুব পক্ষে ছিলেন না তিনি। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় পার্টির ইতিহাস লেখার সময় এখনো আসেনি। ইতিহাস সৃষ্টি হবার পরেই সত্যকার ইতিহাস লিখিত হতে পারে, যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হতে পারে। আমরা এখনো ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারিনি—তা অকপটে স্বীকার করাই ভাল।'

তবে ইতিহাস সৃষ্টির প্রচেষ্টার কথা লাহিড়ী অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, 'ইতিহাস সৃষ্টির প্রচেষ্টায় আমরা ক্ষান্তি দিইনি।' সেইসব প্রচেষ্টায় যে-সব দলিল রচিত হয়েছিল তাকে সংগ্রহ করবার তিনি পক্ষে ছিলেন। অভিজ্ঞতার কথা লিখবারও পক্ষে ছিলেন লাহিড়ী। যদিও নিজে কিছু লিখে গেলেন না। লাহিড়ী নিজের কথা যদি লিখে যেতেন তাহলে আমরা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক তথ্য জানতে পারতাম। রণেন সেনের বইয়ের ভূমিকা তিনি লিখলেন, অথচ নিজেই কিছু লিখলেন না।

রণেনদার মুখ থেকে শুনেছি লেখালিখি দিয়ে লাহিড়ীর জীবন শুরু। সেই বিশের দশকের শেষ ভাগে রণেনদার সঙ্গে যখন লাহিড়ীর পরিচয় ও বন্ধুত্ব তখন লাহিড়ী নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করছেন। সাহিত্যপ্রেমী কয়েকজন তরুণ বন্ধুর সঙ্গে রণেনদার পরিচয় হয়েছিল। রণেনদা বলেছিলেন, পার্টির ইংরাজি ও বাংলায় বেশিরভাগ দলিল বা প্রচারপত্র লিখতেন লাহিড়ী।

রণেনদা ও লাহিড়ীর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। শুধু বন্ধুত্ব বললে বোধহয় ভুল বলা হবে, রণেনদা ছিলেন লাহিড়ীর একনিষ্ঠ ভক্ত। সোমনাথ লাহিড়ীকে আমি একবার প্রথম যুগের কথা বলবার জন্যে চেপে ধরেছিলাম। লাহিড়ীর স্বভাব ছিল সবকিছুকে নস্যাৎ করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। আমাকে সেদিন লাহিড়ী যেসব কথা বলেছিলেন, রণেনদার বইয়ের ভূমিকাতেও তিনি তার কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। ১৯৩২ সালে লাহিড়ী-রণেনদারা কমিন্টার্ন-এর কাছে যে দলিল পাঠিয়েছিলেন, ১৯৭১ সালে রণেনদা সেই দলিলের জেরক্স কপি হাতে পান। রণেনদার কাছে সেই কপি আমি দেখেছি। লাহিড়ী বলেছিলেন, '১৯৩০—৩১ সাল নাগাদ আমরা কয়েকজন মিলে প্রায় শূন্য থেকে পার্টিকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করি। মীরাট মামলার পর পার্টি তখন প্রায় ভেঙে পড়েছে। মীরাট মামলার অন্যতম অভিযুক্ত মুজফ্ফর আহমেদ প্যারোলে কয়েকদিনের জন্যে

ছাড়া পেয়ে জ্যাকেরিয়া স্টিটে এসে উঠেছিলেন। আমি আর রণেন সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করি এবং থাকাও শুরু করি। তখন আমাদের সেই ছোট্ট পার্টি ছিল একটি পরিবারের মতো। আমাদের পরস্পরের মধ্যে ছিল বন্ধুত্বের বন্ধন। একে অপরের সাহায্যে আসব না একথা আমরা ভাবতেই পারতাম না। আমরা সকলেই সকলের গুণাবলী ও দুর্বলতা সবই জানতাম।'

সেদিনের সেই রেশ কুড়ি বছর পরেও আমি কিছুটা পেয়েছি। আমি যখন পার্টিতে এসেছি তখনও আমার পার্টিকে একটি পরিবারের মতো মনে হয়েছে। বড়দের কাছ থেকে সবসময় স্নেহ লাভ করেছি। পরমস্নেহে তাঁরা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পার্টি নেতৃত্বকে তাই তখন অভিভাবক হিসেবে দেখতে শিখেছিলাম। এসব কথা আজ আর ভাবা যায় না। 'কমরেড' শব্দটি আজ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। 'কমরেড' শব্দের ব্যবহার আজ তো আমার মনে হয় অভ্যাস ছাড়া কিছু নয়।

১৯৩২ সালের যে দলিলটির কথা আমি উল্লেখ করলাম, তার প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। অন্য পাঁচজন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে আব্দুল হালিম ও রণেন সেন আমার পরিচিত।

হালিম সাহেবের সান্নিধ্য আমি খুব অল্প কিছুদিন পেয়েছি। তিনি তখন থাকতেন ইলিয়ট রোডে। আমি তখন 'স্বাধীনতা' পত্রিকার কিশোরসভার দায়িত্বে আছি। তাঁর দুই ছেলে-মেয়ে প্রায়ই কিশোরসভায় আসত। বিপ্লব আর তার দিদি তানিয়া। বিপ্লব পরবর্তীকালে নকশাল আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। সে-কারণে তাকে অশেষ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কারাবাসেও কাটিয়েছে কিছুকাল। পান্নালাল দাশগুপ্তের সাহচর্যে এসে সে একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করে। সমাজসেবী হিসেবে সে এখন বিশেষ পরিচিত।

কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলবার জন্যে যাঁদের অবদান কখনো অস্বীকার করা যাবে না তাঁদের মধ্যে আব্দুল হালিম অন্যতম। আব্দুল হালিমের বাসায় আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি। এমন অসীম স্নেহে তিনি কথাবার্তা বলতেন, যে মনে হত তাঁর কাছেই আমি থেকে যাই। রাজনীতির আলোচনার চেয়ে ব্যক্তিগত কথাবার্তা বেশি বলতেন। আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কিছু কথা জেনে নিতাম। প্রথম জীবনে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, কারাবরণ করেছেন এবং পরে মার্কসীয় মতবাদে আকৃষ্ট হয়েছেন। হালিমের ব্যবহার ছিল যেমন সহজ, জীবনযাপনও ছিল তেমনি সরল।

আব্দুল হালিমের সাহচর্যে ডা. রণেন সেন মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন। রণেনদা বারবার হালিম সাহেবের কথা বলতেন। হালিম সাহেবের প্রভাব রণেনদা উপর থেকে কখনো কাটেনি। সোমনাথ লাহিড়ীর মুখ থেকেও আমি আব্দুল হালিম সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। লাহিড়ীরও ছিল আব্দুল হালিমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।

ডা. রণেন সেনের সান্নিধ্য আমি দীর্ঘকাল লাভ করেছি। রণেনদার ছিলেন খুব লম্বা-চওড়া মানুষ। ভারী কণ্ঠস্বর। পার্টি ছাড়া বোধহয় কিছুই বুঝতেন না! শেষ জীবনে রণেনদার কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পেরেছি, বিশেষভাবে বইটি প্রকাশ করবার সময়।

চীনে যে মেডিকেল মিশন পাঠানো হয়েছিল তার অন্যতম সদস্য ছিলেন ডা. রণেন সেন। কলকাতায় সম্বর্ধনা নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে তিনি চীন যাত্রার জন্যে বোম্বাই পৌঁছেছিলেন। ডা. অটল, ডা. চোলকর, ডা. কোটনিশ, ডা. দেবেশ মুখার্জী ও ডা. রণেন সেন। সুভাষবাবু রণেনদাকে বলেছিলেন, বোম্বাইয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় কে. এম. মুনশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু কে. এম মুনশি চেষ্টা করা সত্ত্বেও রণেনদা পাসপোর্ট পেলেন না। তখন রণেনদা কলকাতায় ফিরে সুভাষ বসুকে সব জানালেন। সুভাষবাবু বাংলা হোম সেক্রেটারিকে ফোন করে জানলেন, ব্রিটিশ সরকার রণেনদাকে ভীষণ কমিউনিস্ট বিপ্লবী বলে জানেন। সুভাযবাবু তখন রণেনদাকে আর একজন ডাক্তারের সন্ধান করে দিতে বলেন, যিনি একদিনের ডাকে রওনা হতে পারবেন। রণেনদা তখন ডা. বিজয় বসুকে ঠিক করে দেন। ডা. বিজয় বসু ও রণেনদা চেতলায় একসঙ্গে ডাক্তারি করতেন। বিজয় বসু চীনে পুরো সময় কাটিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে এখানে আকুপাংচারের সূচনা করেন। বিজয় বসুর কাছে হাতের ব্যথা নিয়ে আমিও একবার আকুপাংচার করাতে গিয়েছিলাম।

রণেনদা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন দীর্ঘকাল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে ছিল তাঁর মূল সম্পর্ক। তিনি দশ বছর বিধায়ক ছিলেন, আর পনেরো বছর ছিলেন সাংসদ।

রণেনদার স্ত্রী ছিলেন লতিকা সেন। ১৯৪৯ সালে পুলিশের গুলিতে যে চারজন নিরস্ত্র মহিলার প্রাণ যায় তার মধ্যে লতিকা সেন অন্যতম। এখনও যখন আমি বৌবাজার ও কলেজ স্ট্রিটের সংযোগস্থলে যাই, তখন নিজের অজান্তে শহিদ স্তম্ভটির দিকে আমার চোখ চলে যায়, যেখানে লতিকা সেনের নাম জ্বলজ্বল করছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন লতিকা সেন ও অন্যেরা নিহত হলেন সেই রাতেই বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটি লতিকা সেনের ছবি ছাপিয়ে তার নীচে লিখেছিল—'লতিকা, তোমার তপ্ত শোণিত ধারায় কলকাতার রাজপথ যারা রঞ্জিত করেছে তাদের আমরা ক্ষমা করব না। তোমার প্রাণের বিনিময়ে যে আহ্বান তুমি রেখে গেছ আমাদের কাছে সেই প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যাব আমরা শেষ সংগ্রামের দিকে।' আমরা গোপনে সেই ছবি দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দিয়েছিলাম। আজ আর লতিকা সেনের কথা কেউ বলে না! এমনকি তার নাম

কেউ জানে না। রণেনদা শেষদিন পর্যন্ত এই প্রসঙ্গে কতবার আমার কাছে দুঃখ করেছেন। বলতেন, কনক ছাড়া কেউ তার নাম করে না। কনক অর্থাৎ কনক মুখোপাধ্যায়।

লাহিড়ী ও রণেনদার মুখ থেকে আর একজন নেতার নাম আমি বারবার শুনতাম, তিনি হলেন মহম্মদ ইসমাইল। ইসমাইল সাহেবের স্নেহলাভেও আমি ধন্য হয়েছি। ইসমাইলকে আমি ট্রাম শ্রমিক আন্দোলনের এক নম্বরের নেতা হিসেবেই জানতাম। কিন্তু সেটি তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। প্রথম যুগে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহম্মদ ইসমাইল অন্যতম। লাহিড়ী একবার আমাকে বলেছিলেন, তাঁরা যখন ৪১ নং জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটে থাকতেন, সেই ১৯৩২ সালে ইসমাইল তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সেই জমাটি আড্ডায় তখন থেকে তিনি নিয়মিত আসতেন। লাহিড়ীর মুখ থেকে এই কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, শুধু ট্রাম-এর নেতা হিসেবে ইসমাইলকে ভাবা আমার একেবারেই ভুল হয়েছে। লাহিড়ীর মুখ থেকে এই কথা শুনবার পর, 'স্বাধীনতা' পত্রিকা অফিসের ক্যান্টিনে ইসমাইল সাহেবকে চেপে ধরে তাঁর মুখ থেকে পুরানো দিনের অনেক কথা শুনেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ইসমাইল সাহেবের কী গভীর অবদান আছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে মহম্মদ ইসমাইলের বিধানসভা নির্বাচনে বৌবাজার কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা মনে পড়ছে। সেই নির্বাচনে সক্রিয় কর্মী হিসেবে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি কেন সারা কলকাতায় পার্টি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মনে আছে, ভোট গণনা হয়েছিল কলকাতার জাদুঘরে। বিধান রায় মহম্মদ ইসমাইলের কাছে প্রায় হেরেই যাচ্ছিলেন। রক্ষা পান পোস্টাল ব্যালটে। আমরা অসংখ্য মানুষ জাদুঘরের সামনে ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। ভিতর থেকে টুকরো টুকরো খবর আসছিল আর ইসমাইলের জয়যাত্রায় আনন্দে ফেটে পড়ছিলাম। কিন্তু ভোটের এমন মহিমা, যে সাধারণ ভোটে জিতেও শেষরক্ষা হল না।

১৯৪৩ সালে কলকাতা কর্পোরেশনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে দুটি শ্রমিক আসন সংরক্ষিত ছিল, সেই দুটি আসনে কমিউনিস্টরা জয়লাভ করে। জয়ী প্রার্থীদের একজন হলেন সোমনাথ লাহিড়ী আর অন্যজন মহম্মদ ইসমাইল। লাহিড়ী ও ইসমাইল উভয়ের মুখ থেকে আমি সেদিনকার কথা জেনেছি। তাঁরা মাত্র দু'জন হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত কর্পোরেশন তাঁদের ভয়ে থরথর করে কাঁপত।

লাহিড়ীর কথা বলতে গেলে পার্টির কতজনের কথা যে মনে পড়ে। ভবানী সেনের কথা তো একটু আগে বলেছি। ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হলে ভবানীবাবুই হন প্রধান ব্যক্তিত্ব। ভবানীবাবুর সঙ্গে আমার আগে সম্পর্ক থাকলেও গভীর সম্পর্ক হয় পার্টি ভাগ হওয়ার

পর। আমি যে সিপিআইতে থেকে গেলাম সেটাও ভবানীবাবুর প্রচেষ্টায়। আমার সম্পর্ক ছিল মুজফ্‌ফর আহমেদ ও প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে। তাঁদের প্রতি ছিল আমার গভীর শ্রদ্ধা আর তাঁদেরও ছিল আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ। তাঁরা কারান্তরালে না থাকলে তাঁদের ছেড়ে হয়তো আমি সি. পি. আইতে থাকতাম না। চোখের সামনে তাঁরা না থাকলেও আমি কিন্তু প্রথমদিকে সি. পি. আইতে থাকতে রাজি হইনি। ভবানীবাবু দিনের পর দিন আমাকে বুঝিয়েছেন। আমাকে তখন ভবানীবাবুর খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ আমার ছাপাখানা থেকে 'কালান্তর' প্রকাশ করতে হবে। পরবর্তীকালে ভবানীবাবুর সঙ্গে আমি গভীরভাবে সম্পর্কিত হই। ভবানীবাবু ছিলেন যশোরের লোক। তাঁর কথার মাঝে যশোরের টান ছিল। আমাদের পরিবারও যশোরে কাটিয়েছে অনেককাল। ভবানীবাবুর প্রধান বন্ধু ছিলেন কৃষ্ণবিনোদ রায়। কেষ্টদা আমার মাসতুতো ভাই। যশোরে কৃষক আন্দোলন ও পার্টি গড়ে তুলেছেন। কেষ্টদার বাড়িতে ভবানীবাবুকে আমি অনেকবার দেখেছি। কেষ্টদা শেষ জীবনে কলকাতার খ্যাতনামা আইনজীবী হয়েছিলেন।

ভবানীবাবুর সঙ্গে আমি এক বাড়িতে বেশ কিছুদিন বাস করেছি। ১৯ নম্বর ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোডে একতলার একটি ঘরে ভবানীবাবু বাস করতেন। আমি থাকতাম সেই ঘরের উপরে তিনতলায়। সামনে থাকতেন চিনুদারা। চিনুদার বাড়িতেই ভবানীবাবু খাওয়া-দাওয়া করতেন। প্রমোদদার মতো ভবানীবাবুও নিজের ধুতি-পাঞ্জাবি নিজেই কাচতেন, ইস্ত্রি করাতেন, নিজের জুতো নিজেই পালিশ করতেন। সবসময় পরনে থাকত তাই ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি। অসাধারণ চেহারার অধিকারী ভবানীবাবুকে সাদা ধুতি পাঞ্জাবিতে সুন্দর মানাত। ভবানীবাবুর ব্যক্তি জীবন ছিল বড় দুঃখের, তাঁর একমাত্র ছেলে পিসির কাছে মানুষ হত। ছেলেটি পরবর্তীকালে ইঞ্জিনিয়ার হয়। আমার সঙ্গে ভবানীবাবুর ছেলের কিছুদিন সম্পর্ক ছিল। চিনুদার বাড়িতে প্রতিদিন সকালে চা খাওয়ার সময় ভবানীবাবু সহ আমাদের জমাটি আড্ডা হত। সুভাষদাও প্রায়ই সে আড্ডায় যোগ দিতেন।

শরৎ ব্যানার্জী রোড থেকে ভবানীবাবু দিল্লি চলে যান। রাজ্য পার্টির দায়িত্ব ছেড়ে তিনি দিল্লি যান কেন্দ্রীয় দায়িত্ব নেওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন দেখাশুনো হত কম। তবু কলকাতায় এলে ভবানীবাবুর সাথে দেখা হয়নি, এমন কথা মনে পড়ে না।

ভবানীবাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মস্কো শহরে। তাঁর মরদেহ কফিনে করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। তাঁর মরদেহ সামনে রেখে সেদিন আমরা পথ হেঁটেছিলাম। মনে পড়ে, অন্য অনেকের মতো সোমনাথ লাহিড়ীও ছিলেন আমাদের সঙ্গে।

ভবানীবাবুর কথা বলতে গিয়ে আমার আর একজনের কথা মনে পড়ে গেল। বলতে বসলাম, সোমনাথ লাহিড়ীর কথা আর বলে যাচ্ছি আমার শ্রদ্ধাভাজন কতজনের কথা।

এঁদের একের জীবন যে অন্যের সাথে জড়ানো, তাঁদের জীবনে জীবন যোগ করেই তো গড়ে উঠেছে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন। তাঁদের যে স্নেহ প্রীতি ভালবাসা আমি লাভ করেছি সে-কথা ভুলি কী করে!

যাঁর কথা এখন বলছি তিনি হলেন বিশ্বনাথ মুখার্জী। বিশ্বনাথদা ছিলেন মেদিনীপুরের তমলুকের ছেলে। তাঁদের পরিবারে ছিল স্বদেশি আন্দোলনের আবহাওয়া। তাঁর বড় ভাই অজয় মুখার্জী-দু'-দু'বার যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। আজীবন কংগ্রেসসেবী। অজয় মুখার্জী ছিলেন ১৯৪৪ সালের স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকারের স্রষ্টা ও অধিনায়ক। এই অজয় মুখার্জীর সঙ্গে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে কনিষ্ঠভ্রাতা বিশ্বনাথদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে—কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে।

প্রথম জীবনে বিশ্বনাথদা ছিলেন ছাত্রনেতা। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে বিশ্বনাথদা সেই সময় সামনের সারিতে মিছিলে হাঁটছেন, সেই ছবি আমি বিশ্বনাথদার বাড়িতে দেখেছি। অনেকে বিশ্বনাথদাকে ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলনের স্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিশ্বনাথদা ছিলেন প্রথম যুগের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। দীর্ঘদিন তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। সি. পি. আই রাজ্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘকাল। বিশ্বনাথদা ছিলেন অসাধারণ স্নেহপ্রবণ মানুষ। কতবার তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক মত-পার্থক্য হয়েছে! কিন্তু কখনো দূরে ঠেলে দেননি। মনে আছে, পার্টি ছেড়ে দেওয়ার কিছুকাল পরে একটি সভায় বিশ্বনাথদার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সভায় ঢুকবার সময় আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। তখন বিশ্বনাথদা বেশ অসুস্থ। আমি তাঁকে দেখতে যাইনি বলে তিনি অভিযোগ করলেন। আমি দারুণ লজ্জিত হয়ে উঠলাম। এ যে আমার গভীর অন্যায় সে বিষয়ে মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। বিশ্বনাথদা তারপর বললেন, পার্টির বাইরে থেকো না। ভিতরে চলে এসো। তুমি আমার কাছে এসো, তোমার সব অভিযোগ আমি মন দিয়ে শুনব। পার্টির বাইরে থেকে গেলে তোমারই মনে মনে কষ্ট হবে। তাছাড়া পার্টি তোমাদের মতো পুরানো কর্মীদের থেকে বঞ্চিত হবে কেন?'

আমি বিশ্বনাথদার বো স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়েছিলাম। মন্ত্রী থাকবার সময় বিশ্বনাথদা ছোট্ট সরকারি এই আবাসটি পেয়েছিলেন। অনেকদিন পরে আমার গীতাদির সঙ্গেও দেখা। গীতাদি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, অর্থাৎ গীতা মুখোপাধ্যায়। গীতাদি প্রথম জীবনে ছিলেন 'রায়চৌধুরী'। যশোরে প্রায় আমাদের পাশাপাশি বাড়ির মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই গীতাদির বাড়িতে আমার যাতায়াত। গীতাদি ছিলেন খুব সুন্দরী ও ডাকসাইটে। গীতাদিকে আমি ছেলেবেলা থেকেই নিজের দিদির চোখে দেখতাম—শেষ দিন পর্যন্ত। প্রথম জীবনে ছাত্র আন্দোলন, পরে মহিলা আন্দোলন—সবসময় গীতাদি প্রথম সারির নেত্রী ছিলেন। পার্টি ছাড়বার জন্যে গীতাদিও আমাকে খুব বকাবকি করলেন। বিশ্বনাথদা

বাধা না দিলে আরও বকুনি খেতে হত। শেষদিন পর্যন্ত গীতাদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। গীতাদি খুব ভাল বাংলা লিখতেন। অসংখ্য বই তিনি অনুবাদ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত অনুবাদ—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—'নেকেড অ্যামং দ্য উলভস'-এর অনুবাদ। এককালে খুব বিক্রি হয়েছিল। এখন আর পাওয়া যায় না। গীতাদি খুব দ্রুত অনুবাদ করতে পারতেন। মার্কসবাদের অনেক মূল গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছেন। গীতাদি দীর্ঘকালের সাংসদ ছিলেন এবং সাংসদ হিসাবে খুবই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

সেদিন বিশ্বনাথদা দীর্ঘসময় আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। অসুস্থ শরীরেও আমার কথা শুনে আমাকে বুঝিয়েছিলেন। তারপরেই আমি সদস্যপদ আবার নবীকরণ করাই। আজ বিশ্বনাথদা নেই। সেই নবীকরণের মূল্য আজ তাঁর আমি বুঝি না। সেদিনের সেই পার্টি কোথায় যেন হারিয়ে গেল। কারোর সঙ্গে কারোর হৃদয়ের টান আছে বলে তো আমার মনে হয় না। লাহিড়ী সেই কবে বলেছিলেন, আমাদের নিজেদের মাঝে ছিল গভীর সম্পর্ক, আমরা একে অপরকে চিনতাম জানতাম, একের সুখ-দুঃখ সবাই মিলে ভাগ করে নিতাম। লাহিড়ীর সেসব কথা আজ আর কেউ ভাবে না। পরে যারা পার্টিতে এসেছে, তাদের বেশির ভাগই শুধু সুযোগ নিতেই শিখেছে। ছেলেবেলায় মাও-সে-তুঙ-এর একটি কথা আমরা বারবার বলতাম—'জল থেকে তুললে মাছ আর বাঁচে না। মাছকে রাখতে হয় জলে, ঠিক তেমনি জনগণ থেকে সরে গেলে কমিউনিস্ট আর বাঁচে না, সে আর কমিউনিস্ট থাকে না।' এসব কথা আজ আর কারোর মুখে শুনি না। আমাদের ছেলেবেলায় মার্কসবাদের ক্লাস করা হত। সে ক্লাসে কতজনকে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছি। সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন, বিশ্বনাথ মুখার্জী, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরহরি কবিরাজ আরও কতজন। মার্কসবাদের মূল গ্রন্থগুলি আমরা পড়বার চেষ্টা করতাম। না বুঝলে বুঝে নিতাম। সোমনাথ লাহিড়ী মার্কসবাদের অসংখ্য মূলগ্রন্থ বাংলায় তর্জমা করেছেন। এখন সেসব বই পাওয়া যায় না। রেবতী বর্মনের বইয়ের কথা কি কেউ মনে রাখে? কেউ কি রেবতী বর্মনের নাম জানে? মনে তো হয় না।

যাক এসব নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। সেইসব কমিউনিস্টদের বলা হত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। বলতেন সাধারণ মানুষ। মতবাদ মানুন আর নাই মানুন, কমিউনিস্টদের সাধারণ মানুষ খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। মন থেকে তাঁদের ভালবাসতেন। সে ভালবাসা আমিও পেয়েছি। কত কংগ্রেসী পরিবার কমিউনিস্টদের আত্মগোপনে সাহায্য করেছে!

এইসব কথা বলতে গিয়ে আর একজনের কথা আমার মনে পড়ছে। তাঁর নাম বঙ্কিম মুখার্জী। এককালে সাধারণ মানুষ কমিউনিস্ট পার্টিকে 'বঙ্কিম মুখার্জীর পার্টি' বলেই

ডাকত। একথা অবশ্য আমার রণেনদার মুখ থেকেই শোনা। বঙ্কিমবাবুর অবশ্য ভাগ্য ভাল, পার্টি ভাগ হওয়ার আগেই তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যু হয় ১৯৬১ সালে। আমার মনে আছে, যুগান্তর পত্রিকায় খ্যাতনামা সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 'বঙ্কিম মুখার্জী' নামে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। সেই সম্পাদকীয়তে বঙ্কিমবাবুর বিরাট ব্যক্তিত্ব, দেশপ্রেম, বাগ্মিতা এবং বামপন্থী আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল। বঙ্কিমবাবুর ভারী গলায় নাটকীয় সেই বক্তৃতাব কথা আজও আমার মনে আছে। বঙ্কিমবাবুর ছিল রাশভারী চেহারা। অন্য অনেকের কাছে সহজভাবে গেলেও বঙ্কিমবাবুর কাছে আমার যেতে কেমন ভয় ভয় করত। একথা আমি অন্য দু'একজনকে বলেছিলাম। বঙ্কিমবাবু সে-কথা জানতে পেরে দরাজ গলায় হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন, তুমি আমাকে ভয় পাও কেন? আমি আমতা আমতা করে বঙ্কিমবাবুর কাছ থেকে সরে গিয়েছিলাম। তারপর, একদিন বঙ্কিমবাবু তার ধর্মতলায় বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন থেকে আমি অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছি। অন্য সকলকে 'দাদা' বললেও আমি যে কেন 'বঙ্কিমবাবু' বলতাম তা আজও জানি না। সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন এবং জ্যোতি বসুকে আমি কখনো 'দাদা' বলে ডাকিনি। অন্য কেউ ডেকেছেন এমনও দেখিনি।

বঙ্কিমবাবু এককালে কংগ্রেসে ছিলেন। লাহিড়ীর মুখে শুনেছি, কংগ্রেসে বঙ্কিমবাবুর বেশ প্রভাব ছিল। বঙ্কিমবাবু চিরকাল শ্রমিক আন্দোলন করেছেন। লাহিড়ী ও রণেনদা দুজনেই বলতেন—শ্রমিক আন্দোলনে আমরা ছিলাম বঙ্কিমবাবুর শিষ্য। বঙ্কিমবাবুর কাছ থেকে আমরা ট্রেড ইউনিয়নের শিক্ষা পেয়েছি। তাঁর কাছ থেকেই শ্রমিকদের কাছে কীভাবে বক্তৃতা দিতে হয় শিখেছি। ধর্মঘট পরিচালনাও বঙ্কিমবাবু আমাদের শিখিয়েছেন।

চেহারা ও কণ্ঠস্বরে বঙ্কিমবাবু খুব ভারী হলে কী হবে, খুব রসিক ও মজাদার মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছে অনেকটা সহজ হওয়ার পর অনেক মজাদার গল্প তাঁর মুখ থেকে আমি শুনেছি। বঙ্কিমবাবুর বক্তৃতা শোনা ছিল সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়। বাগ্মী হিসেবে তাঁর নাম বোধহয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যাক, এবার সোমনাথ লাহিড়ীর কথায় আসি। সোমনাথ লাহিড়ী ছিলেন গণপরিষদে একমাত্র কমিউনিস্ট সদস্য। সেখানে তাঁর বক্তৃতা শত্রু-মিত্র সকলেই তারিফ করেছে। লাহিড়ীর ইংরাজি বক্তৃতার খুবই প্রশংসা করতেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। হীরেনবাবুর ইংরেজি তো কিংবদন্তির মতো। আমি এই প্রসঙ্গ একবার লাহিড়ীর কাছে তুলতে, লাহিড়ী তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'ওসব হীরেনবাবুর কথার কথা। আমি ইংরেজি জানব কী করে! ইংরেজি জানবার কথা তো বিলেত ফেরত

কমিউনিস্টদের।' লাহিড়ীর এই কথার মাঝে একটু শ্লেষ ছিল। বিলেত ফেরত কমিউনিস্টদের নিয়ে লাহিড়ী সুযোগ পেলেই ঠাট্টা করতেন। জ্যোতি বসুকে নিয়ে ঠাট্টা তাঁর মুখ থেকে অনেকবার শুনেছি। তার মানে যে জ্যোতিবাবুকে তিনি ছোট করতেন এমন নয়।

১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় সোমনাথ লাহিড়ী যখন তথ্যমন্ত্রী, তখন আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। মন্ত্রী হলেও তাঁর চিরাচরিত পোশাকের পরিবর্তন হয়নি। সেই সস্তা ধুতি আর সস্তা হাফসার্ট। প্রথম তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হওয়ার পর সোমনাথ লাহিড়ীকে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। সেখানে আমার পাশে বসা লেডি রানু মুখার্জী লাহিড়ীর বক্তৃতা শুনে বলে উঠেছিলেন, এমন বুদ্ধিদীপ্ত বক্তৃতা আমি জীবনে শুনিনি। সভা শেষে লক্ষ করলাম লেডি রানু লাহিড়ীর কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছেন আর লাহিড়ী খুব কুশলভাবে তা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

পরের দিন আমি লাহিড়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, কাল আপনি লেডি রানুকে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন কেন? আপনি জানেন আপনার বক্তৃতা শুনে লেডি রানু একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন।

লাহিড়ী চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিলেন, রাখুন তো ওসব লেডি-টেডির কথা। আমি মন্ত্রী না হলে কী তিনি মুগ্ধ হতেন! বিশেষভাবে আমি তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী। একাডেমির জন্যে হয়তো কিছু প্রাপ্তির আশায় আছেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কী যে বলেন!

লাহিড়ী বললেন, আপনার চেয়ে আমি বয়সে বড়, অভিজ্ঞতাও বেশি। এসব সুন্দরী লেডিদের হাত থেকে হাজার হাত দূরে থাকবেন। ওঁর স্বামীর কারখানায় বক্তৃতা দিতে গেলে কতবার গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে সে-কথা আপনি জানেন? সেই জন্যে যে আমি ওঁকে এড়িয়ে গেছি সে-কথা আমি বলছি না। স্বামীর পাপে যে স্ত্রীর পাপ তাও বলছি না। তবে, এরা জল উঁচু না নীচু তা খুব ভাল মাপতে জানে। সেটুকু না বুঝতে পারলে আমার এ-চেয়ারে বসা উচিত নয়।

এই হল সোমনাথ লাহিড়ীর তীক্ষ্ণতা, বিচার ক্ষমতা ও ভাবাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা। অথচ সোমনাথ লাহিড়ী ছিলেন খুব গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ। চেকোশ্লোভাকিয়ায় যেবার গণ আন্দোলনকে সোভিয়েত ফৌজ গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তখন লাহিড়ী ছিলেন প্রাগে। চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ফিরে লাহিড়ী সোভিয়েতের এই কার্য-কলাপের তীব্র বিরোধিতা করে আমাদের অনেকের কাছে বক্তব্য রেখেছিলেন। পার্টির বুদ্ধিজীবী মহল বেশিরভাগই ছিল লাহিড়ীর পক্ষে। পরবর্তীকালে তো প্রমাণিত হয়েছে সেদিন সোভিয়েতের সেই

কার্যকলাপ ছিল অন্যায়ে ভরা। একইরকম হাঙ্গেরির উপর সোভিয়েত আক্রমণের প্রতিবাদ আমেরিকার হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর মতো লেখক কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন। এমনকি কমিউনিস্টদের তীব্র আক্রমণ করে তিনি একটি লেখাও লিখেছিলেন। তাই বলে কী হাওয়ার্ড ফাস্টকে আমরা কেউ ভুলতে পারি? তাঁর স্পার্টাকাস, ফ্রীডম রোড, সাইলাস টিম্বারম্যান, পিসকিল ইউ. এস. এ. কী আমরা ভুলতে পারি? হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর ছোটদের দুটি উপন্যাস আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি। সেখানেও স্বাধীনতার কথা—জাতিসত্তার কথা। পৃথিবীর কোথাও সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ হলে লেখক শিল্পীর মনের তন্ত্রীতে আঘাত লাগে। সোমনাথ লাহিড়ী যতই কমিউনিস্ট নেতা হোন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্রথম সারির নেতা হোন, বিধায়ক বা মন্ত্রী হোন মূলত তিনি লেখক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সোমনাথ লাহিড়ী ঠিকমতো যদি তাঁর কলমের ব্যবহার করতেন তাহলে বাংলা সাহিত্য অনেক সমৃদ্ধ হত। সাংবাদিকতায় যে কলম তিনি ব্যবহার করেছিলেন তাও যদি রক্ষিত হত, তাহলে সাংবাদিকতা অনেক পূর্ণ হতে পারত। আমার বারবার মনে হয় পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকা যখন পুনরায় প্রকাশিত হল, তখন যদি সোমনাথ লাহিড়ীকে আগের মতো সম্পাদকের পদে বসানো হত তাহলে স্বাধীনতা পত্রিকা অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কিন্তু পার্টিতে এসব হয় না। চিরকালই দেখলাম দলে উপদলে বিভক্ত পার্টি। এখনও সেই ধারা চলছে। এই ধারা থেকে মুক্তি না পেলে সাচ্চা পার্টি হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সেই ঘটনা জানবার পর থেকেই আমি সোমনাথ লাহিড়ীর চরিত্র অনেকটা বুঝতে পেরেছি। সবটা বুঝেছি এমন দাবি আমি কখনো করব না। তাঁর মতো মহান চরিত্র বোঝা বড় কঠিন। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী-ছাত্র। রসায়ন ছিল তাঁর শিক্ষার বিষয়। সেই কারণে লক্ষ করেছি, যে কোনো বিষয়কে তিনি চুলচেরাভাবে বিশ্লেষণ করতেন। আবেগে ভেসে যাওয়ার মানুষ লাহিড়ী ছিলেন না। যাক যে ঘটনার কথা বলছিলাম।

একদিন একটি দাবি নিয়ে সোমনাথ লাহিড়ী ও জ্যোতি বসু তখনকার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তো বিধান রায়ের আগে থাকতেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু লাহিড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না। বিধানবাবুর একটি স্বভাব ছিল সবাইকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করা আর তার পারিবারিক পরিচয় জেনে নেওয়া। বিধানবাবু লাহিড়ীকে চিনতে না পেরে বললেন, তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না। তোমার বাবার নাম কি?

লাহিড়ী জবাব দিলেন, আপনার আলোচনা আমার সঙ্গে, আমার বাবার সঙ্গে নয়। বাবার নাম জানবার আপনার বোধহয় কোনো প্রয়োজন নেই।

বিধানবাবু হতবাক! এমন জবাব তিনি জীবনে কখনো শোনেননি। তবু আমতা আমতা করে বললেন, পরিবারের কথা জানতে তো একটু ইচ্ছে করে!

লাহিড়ী জবাব দিলেন, আমার কোনো পাবিবারিক পরিচয় নেই। আমার নাম সোমনাথ লাহিড়ী, আর তাছাড়া আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন। অপরিচিতকে 'তুমি' বলা আমি পছন্দ করি না।

এরপরে আলোচনা আর বেশি দূর এগোয়নি। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে বিধান রায়ের ছিল সুসম্পর্ক। জ্যোতিবাবুও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কিছু করার ছিল না।

আমি জানি না এই ঘটনার পরে, লাহিড়ীর সঙ্গে বিধানবাবুর ভবিষ্যতে কোনো একান্ত আলোচনা হয়েছে কিনা। লাহিড়ী সেদিন তাঁর পারিবারিক পরিচয়কে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। অথচ তিনি কিন্তু ছিলেন পারিবারিক পরিচয় দেয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি। সোমনাথ লাহিড়ী ছিলেন রামতনু লাহিড়ীর বংশধর।

অনেক বছর পরে লাহিড়ীকে খোশমেজাজে পেয়ে আমি এই ঘটনাটির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

লাহিড়ী জবাব দিয়েছিলেন, ধুর, যত সব বানানো গপ্পো, তবে বিধানবাবু তো ছিলেন আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের জ্যাঠামশাই।

আমি হেসে উঠেছিলাম। আর বুঝতে পেরেছিলাম, লাহিড়ী তাঁর চিরাচরিত স্বভাবে উড়িয়ে দিলেও ঘটনার সত্যতার সম্ভাবনাই বেশি। কথাটা জ্যোতিবাবুকে আমি অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি। লাহিড়ীর কাছে আমি যতটা সহজ ছিলাম, জ্যোতিবাবুর কাছে ততটা নয়।

আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ভগতরাম তলোয়ারের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হল। ভগতরাম তলোয়ার আমাদের সকলের কাছে পরিচিত। নেতাজির অন্তর্ধানে তিনি ছিলেন প্রধান সঙ্গী। সে সব কথা বাঙালিরা প্রায় সবাই জানেন। ভগতরামের সঙ্গে আমার দিল্লিতে পরিচয় হয়। তখনই তাঁর বইটি প্রকাশ হওয়ার মুখে। নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য সেখানে বিবৃত আছে। বইটি বাংলায় অনুবাদের জন্যে ভগতরাম আমাকে দেন। বইটি আমি প্রকাশ করি। বেশ কয়েকটি মুদ্রণ শেষ হয়ে গেছে। বইটি দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন ড. গঙ্গাধর অধিকারী। ড. অধিকারী জার্মানিতে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন। সেই সময় আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক হয়েছিল। জার্মানিতে ছাত্রাবস্থাতে তিনি কমিউনিস্ট মতবাদে আকৃষ্ট হন। ১৯২৮ সালে দেশে ফিরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। পার্টির সাধারণ সম্পাদকও তিনি ছিলেন কিছুকাল। ১৯৩৪ সালে তিনি গ্রেপ্তার হলে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব যে-তিনজন পালন করেছিলেন তার মধ্যে সোমনাথ

লাহিড়ী অন্যতম। আমি যখন ড. অধিকারীকে দেখি তখন তিনি পার্টির ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত। এই কাজে তাঁকে যাঁরা সাহায্য করছেন, তাঁদের মধ্যে চিন্মোহন সেহানবীশ অন্যতম।

ভগতরাম আমাকে বলেছিলেন যে তিনি নেতাজির অন্তর্ধানে যে দায়িত্ব পালন করে ছিলেন তা ড. অধিকারীর নির্দেশে। তখন তিনি কমিউনিস্টই ছিলেন। ভগতরাম ছিলেন বিপ্লবী পরিবারের সন্তান। তাঁর বইটি পড়লে দেশপ্রেমিক, ত্যাগী সেই পরিবারের পরিচয় পাওয়া যাবে। ভগতরামের কথা শুনে আমি বেশ অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তো অভিযোগ যে নেতাজিকে তারা বিশ্বাসঘাতক বলেছে। অথচ তাঁকে গোপনে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এবং ব্রিটিশের চোখ এড়িয়ে পৌঁছে দিলেন একজন কমিউনিস্ট! ভগতরাম আমাকে যখন একথা বলছেন, তখন তো দেখলাম তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। আমি বিস্মিত হয়ে ড. অধিকারীকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। ড. অধিকারীও ভগতরামের কথার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন। আমি যখনকার কথা বলছি, সেটি সত্তর দশকের মাঝামাঝি বলা যেতে পারে। যে অনুষ্ঠানে ভগতরামের বইটি প্রকাশিত হয়েছিল, সে অনুষ্ঠানেও আমি উপস্থিত ছিলাম।

আমি তখন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক উপসমিতির সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সদস্য ছিলেন তিনজন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য আর আমি। প্রায়ই তখন দিল্লি যেতে হয়। দিল্লি গিয়ে থাকি সি. পি. আই-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়—অজয় ভবনে। ড. অধিকারীও অজয় ভবনে থাকতেন। ড. অধিকারীর সঙ্গে সেখানেই আমার ঘনিষ্ঠতা। ভগতরাম তলোয়ারকে দেখতাম প্রতিদিনই ড. অধিকারীর কাছে আসতেন। তিনি ছিলেন ড. অধিকারীর একনিষ্ঠ ভক্ত। ভগতরাম আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় হলেও তাঁর সঙ্গে আমার গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে।

কিছুদিন পরে আমি সোমনাথ লাহিড়ীকে ভগতরামের কথা জিজ্ঞেস করি। আমি বলি, ভগতরাম যখন সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে আফগানিস্তান পালিয়ে গেলেন, তখন তো আপনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য! ভগতরাম আমার কাছে বলেছেন, তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন এবং ড. অধিকারীও সেকথা স্বীকার করেছেন! তাহলে সবকিছুই তো আপনার জানবার কথা।

লাহিড়ী জবাব দিলেন, না, এমন কথা আমার জানা নেই। তবে সব কথা সবাই যে জানতেন তা নয়। ড. অধিকারী যখন সত্যতা স্বীকার করছেন, তাহলে ঘটনাটা নিশ্চয়ই সত্য।

আমি বললাম, সুভাষবাবু সম্পর্কে আমাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয় তাহলে তার সবকিছু তো আর ধোপে টিকবে না। ইতিহাসটা তো অন্যরকম হয়ে যাবে।

লাহিড়ী একটু চুপ করে থেকে বললেন, হয়তো! আমি জানি না ইতিহাসবিদরা কী বলেন। তরুণ গবেষকরা তো এখন অনেক তথ্য আবিষ্কার করছেন। ভগতরামের এই বক্তব্য নিয়ে যদি একটু অনুসন্ধান হয় তাহলে আমি খুবই খুশি হব।

সোমনাথ লাহিড়ী বিধায়ক হয়েছেন চারবার। বিধানসভাতেও তাঁর বক্তৃতা শত্রু-মিত্র সকলের দ্বারাই প্রশংসিত হয়েছে। তখনকার পত্র-পত্রিকায় খুঁজলে তাঁর বক্তৃতার সপ্রশংস মন্তব্য পাওয়া যাবে। মনে আছে, একবার সোমনাথ লাহিড়ীকে ঢাকুরিয়া কেন্দ্রে পরাজিত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। প্রমোদদা দাবি করেছিলেন লাহিড়ীর জামানত জব্দ করে দেবেন। কিন্তু প্রমোদ-দা পারেননি। লাহিড়ী বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। প্রমোদদার খুব ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও সেদিন আমি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। তখন অবশ্য সি. পি. এম—সি. পি. আই. ছিল মুখ দেখাদেখি বন্ধ, পরস্পর পরস্পরকে এক নম্বর শত্রু হিসাবেই ভাবত।

লাহিড়ী বারবার কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। পার্টির সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছেন, পলিটব্যুরোর সদস্য থেকেছেন অনেকদিন, সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন একবার। কিন্তু কখনো আমি লাহিড়ীর মধ্যে নেতৃত্বের সেই আচরণ দেখিনি। তিনি যে সময় কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছেন তখন অনেকেই এইসব পদে থাকবার কথা কল্পনায় আনতে পারতেন না। এমন বর্ণময় জীবনের অধিকারী সোমনাথ লাহিড়ীকে সবসময় সাধারণ মানুষের মতনই মনে হত। আমার মতো সাধারণ কর্মী তাই তাঁর অত কাছে আসতে পেরেছিলাম।

লাহিড়ীর মনের মাঝে একটা সাহিত্যিক মন লুকিয়ে ছিল। আমার সঙ্গে দেখা হলে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাহিত্য জগতের খবরাখবব নিতেন। লাহিড়ী তো সাহিত্য ছাড়া তত্ত্বগত মতাদর্শগত ও রাজনীতিগত লেখা কম লেখেননি। 'স্বাধীনতা', 'নিউএজ', 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট', 'আগে চলো' পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর লেখাগুলিকে একত্রিত করবার কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করা হল না। আমি সুভাষদার সঙ্গে আলোচনা করে একবার উদ্যোগ গ্রহণ করেও ব্যর্থ হয়েছি।

লাহিড়ীর স্ত্রী বেলা লাহিড়ীকেও আমি চিনতাম। শুধু চিনতাম বললে ঠিক বলা হবে না, বেলাদি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন মহিলা আন্দোলনের নেত্রী। লাহিড়ীর মৃত্যুর আগেই বেলাদি অবশ্য পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। লাহিড়ীর দেহাবসান ঘটে ১৯৮৪ সালে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

লাহিড়ীর একমাত্র কন্যা সোনালি। সেও ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের নেত্রী। সোনালি আমার খুব স্নেহের পাত্রী। লাহিড়ীর নামে সে প্রতি বছর একটি বক্তৃতার আয়োজন করত। একান্তভাবে তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে। পার্টি কিছুই করেনি—আজও করে না। ইদানীং সেই বক্তৃতার আয়োজন আর দেখছি না। এককভাবে সোনালির পক্ষে হয়তো আর সম্ভব হচ্ছে না। জানি না।

লাহিড়ীর স্মরণসভায় সাহিত্যিক নারায়ণ চৌধুরী বলেছিলেন, 'এমন একটা লোক আজ আর দেখা যায় না—চারবার বিধায়ক, দু'বার মন্ত্রী, যখন মারা গেলেন সি. আই. টির একটা ছোট ফ্ল্যাটে থাকতেন, মৃত্যুর পর দেখা গেল, তার না আছে বাড়ি, না আছে গাড়ি, না আছে কোনো ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স।'